মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা

মার্কস থেকে মাও ৎসে তুং

দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

শোভনলাল দত্তগুপ্ত
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

MARXIYA RASTRACHINTA
[Political thoughts of Marx]
Sobhanlal Dattagupta

প্রকাশকাল :
দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী, ১৩৭১

মুদ্রক :
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানোদয় প্রেস
৫৫বি কবি সুকান্ত সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর এক বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বইটির যে সব পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, গ্রন্থকার হিসেবে সেগুলো পড়ে আমি বিশেষ লাভবান হয়েছি। গ্রন্থ সমালোচকরা এবং পাঠকদের মধ্যে অনেকে খুব সঙ্গত কারণেই বইটির কয়েকটি ত্রুটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বইটির ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং প্রথম সংস্করণের এই অসম্পূর্ণতার কথা মনে রেখে আমি দ্বিতীয় সংস্করণে মূল কাঠামোর কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে কয়েকটি অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু বিষয়ের আলোচনাকে সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন অনুভব করেছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব (তৃতীয় অধ্যায়), রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব ও সাম্প্রতিক কালের বিতর্ক (ষষ্ঠ অধ্যায়), মাও ৎসে তুং-এর রাষ্ট্রচিন্তা (দশম অধ্যায়) এবং আরও কয়েকটি অংশ। প্রয়োজনবোধে কিছু কিছু নতুন বইকেও গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সংযোজনগুলির ফলে বইটির পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণটি যদি পাঠকদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়, তাহলেই আমার এই প্রয়াসকে সার্থক মনে করব।

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

সূচীপত্র

মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা

মার্কস থেকে মাও ৎসে তুং

প্রথম অধ্যায়

শ্রমিকশ্রেণীর উন্মেষ

সমাজবিজ্ঞানের অভিধানে "সমাজতন্ত্র" আজ আর কোন নতুন শব্দ নয়। সর্বজনস্বীকৃত এই রাজনৈতিক মতাদর্শ ইতিহাসের পাতায় যে স্থান করে নিয়েছে, তাব উদ্ভব ও বিকাশের ধারাটি কিন্তু খুব সহজ পথে এগোয়নি। ১৮১৯ সালে ইংল্যাণ্ডের 'পিটারলু'তে ব্রিটিশ শ্রমিকদের নির্বিচারে হত্যা, ১৮৪৮ সালে প্যারিসের রাজপথে ফরাসী শ্রমিকদের রক্তাক্ত প্রতিরোধ, ১৮৭১ সালের ঐতিহাসিক প্যারিস কমিউন, ১৯০৫ সালে রুশ শ্রমিকদের রক্তে রঞ্জিত সেণ্ট পিটার্সবুর্গের ব্যর্থ অভ্যুত্থান এবং এমন আরও অজস্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেব মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে সমাজতন্ত্রের বৈপ্লবিক আদর্শ। তাই সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইতিহাসেব মূল কথা হল সমাজের সর্বাধিক নিপীড়িত শ্রেণীব পুরনো পৃথিবীকে বদলে দিয়ে নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য গণসংগ্রাম, গণপ্রতিবোধের ইতিহাস। এই শক্তি হল শ্রমিক-শ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট হয়েছে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ।

॥ ১ ॥

শিল্পবিপ্লব

শ্রমিকশ্রেণীর উন্মেষকে অষ্টাদশ শতকেব দু'টি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে যাকে 'দ্বৈত বিপ্লব' (Dual Revolution) আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার একটি হল ১৭৬০ সালের শিল্পবিপ্লব ও অপরটি হল ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব।

শিল্পবিপ্লব ইউরোপের সমাজ ও অর্থনীতির মূল ভিতকে টলিয়ে দিয়ে একাধারে ধনতন্ত্রের অগ্রগতির পক্ষে বিপুল সম্ভাবনার ও অপরদিকে শিল্প-শ্রমিকদের পক্ষে চূড়ান্ত হতাশার সৃষ্টি করেছিল। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতিসাধনে শিল্পবিপ্লব কতখানি সহায়ক হয়েছিল, প্রযুক্তিবিস্তার

ক্ষেত্রে এ যুগের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের দিকে দৃষ্টি দিলে সেটি উপলব্ধি করা যায়। যন্ত্রচালিত তাঁতের উদ্ভাবন এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম নির্দিষ্ট পদক্ষেপ। ১৭৩৩ সালে কে (Kay), ১৭৬৮ সালে হারগ্রীভ (Hargreave), ১৭৬৯ সালে আরকরাইট (Arkwright) ও ১৭৭৯ সালে ক্রম্পটন (Crompton) বিভিন্ন মডেলের মেশিনচালিত যে তাঁতযন্ত্রগুলি প্রস্তুত করেন, তার প্রভাবে বস্ত্রশিল্পের উৎপাদনের ক্ষেত্রে কার্যতঃ এক মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। প্রাক্ শিল্পবিপ্লব যুগে হস্তচালিত মিলগুলিতে যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদিত হত, তার তুলনায় ১৭৬০ থেকে ১৮২৭ সালের মধ্যে ব্রিটেনে বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন চমকপ্রদভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার অন্যতম কারণ হল, ১৭৬০ সালের পরে যন্ত্রচালিত তাঁতের উদ্ভাবনের ফলস্বরূপ ব্রিটেনে কার্পাসশিল্পে উৎপাদন অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল এবং এর ফলে অচিরেই ব্রিটেন তুলোর বাজারে স্বকীয়তা অর্জন করতে সফল হয়েছিল।

শিল্পবিপ্লবের দ্বিতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। পরিবহনের ক্ষেত্রে ১৭৬০ সালের পরবর্তী পর্যায়ে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছিল, সেটি ছিল লৌহ ও খনিশিল্পে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কয়লাখনিগুলি থেকে জল নিষ্কাশনের প্রয়োজনে বাষ্প-চালিত পাম্পের প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে নিউকমেনের (Newcomen) আবিষ্কৃত পাম্প জেমস্ ওয়াটের (James Watt) প্রচেষ্টায় নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে ও অল্প সময়ের মধ্যে প্রযুক্তিবিদ্যার জগতে বাষ্প-শক্তির ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপরূপে স্বীকৃতি পায়। একই সঙ্গে স্মরণ করতে হয় লোহা ঢালাই ও ব্লাস্টিং-এর ক্ষেত্রে ডারবি (Darby), স্মিটন (Smeaton) ও হেনরি কোর্টের (Henry Cort) অবদানকে; এঁদের উদ্ভাবিত উন্নতমানের কলাকৌশল প্রয়োগ করে ব্রিটেনে লৌহ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য-ভাবে গুণে ও পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই সময়ের পরিসংখ্যানের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ১৭৪০ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে আ-ঢালাই লৌহের (Pig Iron) উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার যেখানে ছিল শতকরা মাত্র ২ ভাগ, ১৭৮০ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছিল শতকরা ৬ ভাগে। শিল্পবিপ্লব সম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা হল যে, কার্পাসশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি শিল্পের অগ্রগতিকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিল, যদিও

সাম্প্রতিককালের এক গবেষক, স্যামুয়েল লিলি (Samuel Liley), একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে লৌহশিল্পের অগ্রগতি শিল্পবিপ্লবের পক্ষে আরও বেশী সহায়ক হয়েছিল।

বাষ্পশক্তির ব্যবহার ও সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে লৌহ উৎপাদন,—এই দুটি ঘটনা পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। ১৮০৭ সালে রবার্ট ফুলটন (Robert Fulton) বাষ্পচালিত পোতের ধারণার বাস্তব রূপ দেন; ১৮১৪ সালে জর্জ স্টিফেনসন (George Stephenson) বাষ্পীয় রেলইঞ্জিনের পরীক্ষায় সফলকাম হন। পাঁচ বছর পরে তাঁরই প্রচেষ্টায় পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম রেললাইন পাতার কাজ শুরু হয়। ১৮১৯ সালে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় বাষ্পচালিত প্রথম জাহাজ ছাব্বিশ দিনে পাড়ি দেয়। ব্রিটেনে ১৮২৫ সালে রেললাইন পাতার কাজ শুরু হবার পর ১৮৩০ সালে তার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৭ মাইল; ১৮৪০ ও ১৮৫০ সালে ব্রিটেনে রেললাইনের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮৪৩ ও ৬,৬৩০ মাইলে। শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে সড়ক ও জলপথে পরিবহন ব্যবস্থারও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। যন্ত্রের মাধ্যমে খালগুলিকে গভীর করে সেগুলিকে জলপথের উপযুক্ত করে তোলার কাজ এই সময়তেই শুরু হয়েছিল। পিচ্ ঢালা রাস্তা তৈরীর কাজ শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ ম্যাকাডামের (John McAdam) প্রচেষ্টায়। রেলওয়ে, সড়ক ও জলপথে যোগাযোগব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের অবাধ বাণিজ্যভিত্তিক ধনতন্ত্রের প্রসারে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল।

শিল্পবিপ্লবের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য অবদান সূচিত হয়েছিল কৃষির ক্ষেত্রে। কৃষিতে যন্ত্রের প্রয়োগ ও রবার্ট বেক্ওয়েলের (Robert Bakewell) সার্থক প্রচেষ্টার ফলে কৃষিব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উন্নতমানের গবাদি পশুর প্রজননের সম্ভাবনা জমিতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত ত্রিফসলী ব্যবস্থায় কোন একটি জমি বছরে এক সময়ে অব্যবহার্য অবস্থায় থাকত। নতুন ব্যবস্থায় জমি শূন্য পড়ে থাকার সম্ভাবনা বন্ধ হয়ে কৃষিতে ফলনের সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেল। কৃষিতে অধিক ফলনের জন্য উন্নত ধরনের খাদ্যোৎপাদন ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে নতুন ধরনের ওষুধপত্রের ব্যবহারের ফলে শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপে

মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে জনসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৭০০ সালের আগে ব্রিটেনে প্রতি একশ' বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১,০০০,০০০; ১৭০০ সাল থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে বৃদ্ধির পরিমাণ ৩,০০০,০০০-এ দাঁড়ায়।

শিল্পবিপ্লব নিঃসন্দেহে ধনতন্ত্রের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে বিপুল পরিমাণে সহায়ক হয়েছিল। ব্রিটেন, হল্যাণ্ড ও পরবর্তীকালে ফ্রান্সে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত বাণিজ্যপুঁজিনির্ভর যে উৎপাদনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, শিল্পবিপ্লবের জোয়ারে অচিরেই তার অবলুপ্তি ঘটে ও শিল্পপুঁজিভিত্তিক ফ্যাক্টরীকেন্দ্রিক ধনতন্ত্রের বনিয়াদ এই দেশগুলিতে গড়ে উঠতে শুরু করে। ফ্যাক্টরীব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি করে বৃহৎ পুঁজিপতিরা যেমন আকাশচুম্বী মুনাফা অর্জনের সুযোগ অর্জন করেছিলেন, তেমনি কারখানাগুলিতে যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদনের প্রয়োজনে চাহিদা দেখা দিল দক্ষ শ্রমিকের। ইতিমধ্যে যন্ত্রসভ্যতার প্রভাবে গ্রাম ভেঙ্গে গড়ে উঠছিল শহর, কৃষিতে ঘটছিল পুঁজির অনুপ্রবেশ ও তার ফলে গ্রামীণ কৃষিশ্রমিকরা ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে শহরে আসতে শুরু করেছিল কাজের আশায়। শহরে তাদের শ্রমকে ন্যূনতম মজুরির বিনিময়ে ক্রয় করার অপেক্ষায় ছিল ফ্যাক্টরীর মালিক পুঁজিপতিরা। শিল্পবিপ্লবের অব্যবহিত পরে ফ্যাক্টরীকেন্দ্রিক, শিল্পপুঁজিভিত্তিক আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর জন্মের ইতিহাসটা ছিল মোটামুটি এই ধরনের। কিন্তু যে শিল্পবিপ্লব পুঁজি-পতিদের কাছে হয়ে দাঁড়াল এক বিরাট সৌভাগ্যের সোপান, ফ্যাক্টরীতে কর্মরত শিল্পশ্রমিকদের জীবনে তা নিয়ে এল চূড়ান্ত অভিশাপ ও বঞ্চনা। প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির পক্ষে শিল্পবিপ্লবের ইতিবাচক দিকটি ছিল যেমন তাৎপর্যমণ্ডিত, তেমনি শ্রমিকশ্রেণীর উন্মেষের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইতিহাসের আলোচনায় এর নেতিবাচক দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

একেবারে গোড়া থেকেই শ্রমিকরা কিভাবে পুঁজিপতিদের স্বার্থে নিয়োজিত হয়েছিল, সে যুগে ফ্যাক্টরীমালিক ও শ্রমিকদের পারস্পরিক সম্পর্কের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি দিলে সেটি উপলব্ধি করা যায়। প্রথমতঃ, উৎপাদনপদ্ধতিতে যন্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কারখানার মালিকরা মজুরি সংকোচনকে অন্যতম নীতি হিসেবে ঘোষণা করে। জীবন-

ধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে মজুরির হার নির্ধারণের ফলে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় এই সময় তাই ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ১৮৩২ সালে একটি ফরাসী শ্রমিক পরিবারের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম আয় গড়ে ৮৬০ ফ্রঁ। হলেও প্রকৃত আয়ের পরিমাণ ছিল ৭২০ ফ্রাঁ। দ্বিতীয়তঃ, অধিক পরিমাণে মুনাফা অর্জনের জন্য পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় বৃদ্ধি করে ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থাকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। এই সময়ের অধিকাংশ শিল্পসংস্থার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বেশীর ভাগ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিকদের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজের সময় ছিল ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা; এমন কি ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত শ্রমিকদের খাটানও কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। ব্লাস্ট ফারনেস জাতীয় নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন সংস্থায় যে শ্রমিকরা লিপ্ত থাকত, তাদের ক্ষেত্রে দৈনিক শ্রমের সময় ১৮ থেকে ১৯ ঘণ্টা পর্যন্তও ব্যাপৃত হত। যন্ত্রসভ্যতার দৌলতে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের নৈশকালীন উৎপাদনে নিয়োগ করারও এক অভূতপূর্ব সুযোগ পেয়েছিল। এর ফলে কারখানার মালিকদের কাছে শ্রমসময় বৃদ্ধি করে দৈনিক উৎপাদন ও সেই সঙ্গে মুনাফার পরিমাণ বাড়াবার এক সম্পূর্ণ নতুন সম্ভাবনা দেখা দিল। তাই দেখা যায়, ১৭৯২ সালে উইলিয়াম মারডক্ (William Murdoch) যে গ্যাস বাতির উদ্ভাবন করলেন, তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রয়োগ করল ইংরেজ শিল্পপতিরা রাত্রিকালীন উৎপাদনকে চালু রাখার স্বার্থে। তৃতীয়তঃ, প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের ফলে পুঁজিপতিরা যত বেশী পরিমাণে মুনাফা সচেতন হয়ে উঠতে লাগল, সেই উদ্দেশ্যে শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করার তীব্রতাও ক্রমে ক্রমে এক চরম আকার ধারণ করতে শুরু করল। সাম্প্রতিককালের গবেষণার আলোকে তৎকালীন শ্রমব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে শ্রমিক শোষণের তীব্রতার মর্মন্তুদ চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮৪৪-৪৫এ রচিত এঙ্গেলসের The Condition of the Working Class in England এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত প্রথম প্রামাণ্য গবেষণাগ্রন্থ। পরবর্তীকালে লিও হুবারম্যান (Leo Huberman), এরিখ্ হবসবাম্ (E. J. Hobsbawm), ই. পি. টমপসন (E. P. Thompson) প্রমুখের আলোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গী আরও বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট রূপ পেয়েছে।

একদিকে সীমাহীন দারিদ্র্য, অপরদিকে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা,—সে যুগের

ইউরোপীয় শিল্প শ্রমিকদের এটাই ছিল প্রকৃত চেহারা। শিল্পপতিরা মুনাফার স্বার্থে নারী ও শিশুদেরও কায়িক শ্রমের কাজে নিয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করত না। কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রশ্নটি ছিল বিবেচনার বহির্ভূত; শ্রমিকদের কাজের ও বাসস্থানের পরিবেশ ছিল বীভৎস রকমের অস্বাস্থ্যকর। এর ফলে অবসাদ, ক্লান্তি ও দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যু হত বহু শ্রমিকের। এই জাতীয় দুর্ঘটনার একটি বড় ক্ষেত্র ছিল খনি অঞ্চলগুলি। ১৮০১-৩৬ সালের মধ্যে ব্রিটেনের একটি প্রসিদ্ধ খনি অঞ্চলে অন্ততঃ ১৮৫ জন শ্রমিককে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাতে হয়েছিল। নারী ও শিশু শ্রমিকদের অবস্থা ছিল আরও করুণ। নারী শ্রমিকরা পুরুষদের তুলনায় শুধু যে কম মজুরি পেত তা নয়, সন্তানসম্ভবা হলেও তাদের কাজ থেকে কোন অব্যাহতি ছিল না ও সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার অল্পদিনের মধ্যেই তাদের কাজে যোগ দিতে বাধ্য করা হত। শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের ওপরে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। ৫-৭ বছরের শিশুদেরও প্রায়শই ১৪-১৫ এমন কি ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত একটানা কাজ করতে বাধ্য করা হত। শিশু শ্রমিকদের কল্যাণার্থে ১৮০২ ও ১৮৩৯ সালে ব্রিটেনে, ১৮৩৯ সালে প্রাশিয়াতে, ১৮৩১ সালে ফ্রান্সে ও ১৮৪৫ সালে রাশিয়াতে কয়েকটি আইন প্রবর্তিত হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু তার ফলে বাস্তব অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হল না। সর্বোপরি শিল্পপতিরা খেয়াল খুশীমত তাদের মুনাফার স্বার্থে যে কোন শ্রমিককে ছাঁটাই করার ব্যাপারে ছিল সর্বেসর্বা। এর ফলস্বরূপ ফ্যাক্টরীব্যবস্থার দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের পরমায়ুও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। ব্রিটেনে অবস্থাটা ছিল মোটামুটি এই ধরনের: শেফিল্ডের ধাতুশ্রমিকদের গড় আয়ু ছিল ২৮-৩২ বছর; খনিশ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা ছিল ২৪ বছর।

শিল্পবিপ্লব যে নগরকেন্দ্রিক যন্ত্রসভ্যতার জন্ম দিয়েছিল, তার নিষ্ঠুর, অমানবিক রূপটি তৎকালীন অনেক চিন্তাবিদের মনেই গভীর হতাশা ও তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। ইংরেজ সাহিত্যিকদের মধ্যে কারলাইল (Carlyle) যন্ত্রের ওপরে মানুষের নির্ভরতাকে সার্থক, সুন্দর জীবনবোধের পরিপন্থী বলে আখ্যা দিয়েছিলেন; তাঁর চোখে ফ্যাক্টরীব্যবস্থা ছিল এক ভয়াল বিস্ময়ের প্রতীক। অনন্য সাহিত্যস্রষ্টা ডিকেন্স (Dickens) তাঁর Hard Times, Dombey and Son রচনাগুলিতে যন্ত্রকেন্দ্রিক নগরসভ্যতার দৈনন্দিন জীবনের বেদনা ও হতাশার বিরুদ্ধে সমালোচকের ভূমিকায়

আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাস্‌কিন (Ruskin) তাঁর একাধিক প্রবন্ধে যন্ত্রকে শিল্প ও সৌন্দর্যবিরোধী আখ্যা দিয়ে যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। সাহিত্যিকদের মত একাধিক চিত্রকর তাঁদের শিল্পকলার মাধ্যমে এই যন্ত্রণাবোধ ও বিচ্ছিন্নতাকে মূর্ত করে রেখে গেছেন। ১৭৮৯ সালে অঙ্কিত যোসেফ্‌ রাইটের 'Arkwright's Cotton Mill at Cromford' পেন্টিংটি যান্ত্রিক জীবনের বিরুদ্ধে শিল্পীর একটি সূক্ষ্ম প্রতিবাদ; প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নগরকেন্দ্রিক কৃত্রিম শিল্পের চেয়ে যে অনেকগুণে বড়, সেই ভাবটি এই ছবিতে অত্যন্ত স্পষ্ট। টার্নারের (Turner) বহুল পরিচিত 'Rain, Steam and Speed' পেন্টিংটিও এমনই এক সৃষ্টি, যেখানে একটি রেল ইঞ্জিন থেকে তীব্রবেগে নিঃসারিত কালো ধোঁয়ার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টির একাকার হয়ে যাওয়ার অসাধারণ দৃশ্যটির তাৎপর্য এখানেই যে, যন্ত্রসভ্যতা সৃষ্ট বাষ্প-শক্তির চরিত্র ঝড, বৃষ্টি, বিদ্যুতের মতই ভয়ঙ্কর।

॥ ২ ॥

ফরাসী বিপ্লব

শিল্পবিপ্লবের অব্যবহিত পরেই যে রাজনৈতিক ঘটনাটি আধুনিক কালের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে সেটি হল ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব। একেবারে গোড়া থেকেই ফরাসী বিপ্লবের প্রক্রিয়ার মধ্যে দু'টি পরস্পর-বিরোধী ধারা পরিলক্ষিত হয়েছিল; তার একটি ছিল জ্যাকোবিন (Jacobin) পন্থীদের বিপ্লবী গণতন্ত্রের আদর্শে প্রভাবিত; অপর ধারাটি ছিল রক্ষণশীল গিরোন্দিনদের (Girondin) দ্বারা পরিচালিত। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই বাস্তিলের পতনের মধ্য দিয়ে ফরাসী বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল ও তার পরে অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে বিপ্লবের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটেছিল ১৭৯২ সালের ১০ই আগস্ট, যেদিন এক বিশাল গণঅভ্যুত্থানের পরিণতিতে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়ে রক্ষণশীল গিরোন্দিনদের ক্ষমতায় আসা সম্পূর্ণ হল। অনতিকালের মধ্যেই জ্যাকোবিন ও গিরোন্দিনদের সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠে। ব্রিসো (Brissot), রোলাঁ (Roland), ভ্যারনিয় (Vergniaud) প্রমুখের নেতৃত্বে গিরোন্দিনরা প্রথম থেকেই ছিলেন বাণিজ্য ও শিল্প পুঁজির এবং বৃহৎ ভূস্বামীদের স্বার্থের প্রতিনিধি। তাই ফ্রান্সে রাজতন্ত্র সমর্থিত যে

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তার বিরুদ্ধে এঁদের প্রতিবাদ ছিল অত্যন্ত সীমিত ; প্রথম থেকেই এই রক্ষণশীল রাজনীতিকদের উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবের নেতৃত্বকে শ্রমজীবী জনতার হাতে অর্পণ না করে ফরাসী বিপ্লবের প্রক্রিয়াকে একটি ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রেখে দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে তোলা। অপরদিকে রোবসপিয়ের (Robespierre), ম্যারাট (Marat) এবং অন্যান্য জ্যাকোবিনরা ছিলেন কৃষক ও শহুরে নিম্নমধ্যবিত্তদের প্রতিনিধি, যাঁরা রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে একটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট ছিলেন। বিপ্লবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই বিরোধিতা স্বাভাবিকভাবেই গিরোন্দিন ও জ্যাকোবিনদের দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তুলল। দেশের অর্থনীতির দ্রুত অবনতি, খাদ্যাভাব ও অনিশ্চয়তা জনজীবনে যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল, তার ফলশ্রুতিরূপে ১৭৯৩ সালের ৩১ মে-২রা জুন পর্বে জ্যাকোবিনদের নেতৃত্বে একটি সরকারবিরোধী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এক বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হল ও সেই সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হল। বিপ্লবের তৃতীয় স্তরটি একেবারে শুরু থেকেই ছিল প্রতিবিপ্লব ও বিপ্লবের সংঘাতে বিদীর্ণ। জ্যাকোবিন প্রশাসনে বৃহৎ ভূস্বামীদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ ও গ্রামের কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনের নীতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ১৭৯৩ সালে রচিত হয়েছিল ফ্রান্সের ইতিহাসের প্রথম প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান। কিন্তু সাময়িক-ভাবে পরাজিত গিরোন্দিনদের প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা ও জ্যাকোবিনদের মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের প্রথম বিপ্লবী, প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পতনকে অনিবার্য করে তুলল ও তারই পরিণতিতে ১৭৯৪ সালের ২৭শে জুলাই রোবসপিয়েরবিরোধী একটি জ্যাকোবিনগোষ্ঠী অন্যান্য প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তির সহযোগিতায় এক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রোবস-পিয়ের ও তাঁর সহযোগীদের বিনা বিচারে হত্যা করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হল। এইভাবেই পরিসমাপ্তি হল ফরাসী বিপ্লবের তৃতীয় পর্যায়ের।

ফ্রান্সে জ্যাকোবিন পরিচালিত বিপ্লবী প্রজাতান্ত্রিক সরকার ক্ষণস্থায়ী হলেও তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। নেপোলিয়নের পতনের পর জুলাই ১৮৩০ সালে ফ্রান্সে রাজা দশম চার্লসের (Charles X) স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নতুন করে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল, তার পিছনে জ্যাকোবিন ভাবধারা গভীর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এই বিপ্লবের প্রতি

দেশের মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থন ছিল সামান্যই; তাই প্রবল গণ-বিক্ষোভের চাপে সমাজের বিত্তশালী শ্রেণীগুলি সাময়িকভাবে চার্লসের পরাজয়কে মেনে নিলেও অচিরেই তাব। তাদের সুযোগ্য প্রতিনিধি, একান্ত বিশ্বাসভাজন, লুই ফিলিপকে (Louis Philippe) ক্ষমতায় বসাল। তাঁর আমলে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও ১৭৮৯ সালের পরে ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রের বিলোপসাধন হয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে ফিলিপ কার্যতঃ ফরাসী পুঁজিপতিদের সর্বাধিক প্রভাবশালী অংশের প্রতিনিধিরূপে রাষ্ট্র-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। মূলতঃ এঁরা ছিলেন অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যাংকার ও লগ্নী পুঁজির প্রতিনিধি বৃহৎ ব্যবসায়ী। এর পরিণতিতে লুই ফিলিপের আমলে বস্তুতঃ একটি ব্যাংকার-রাজ প্রতিষ্ঠিত হল, যার পিছনে সক্রিয় সমর্থন ছিল রাজা ও তাঁর পারিষদবর্গের। এর ফলে অনতিকালের মধ্যে ফ্রান্সে দুর্নীতি, কদর্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় ভরা এক ঘৃণ্য শোষণব্যবস্থা কায়েম হল; এই ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মাশুল গুনতে হয়েছিল দেশের শ্রমজীবী অসংখ্য মানুষকে, যাদের এই ব্যাংকপুঁজিকেন্দ্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নীতিনির্ধারণে কোন ভূমিকাই ছিল না। এই ব্যবস্থার ফলশ্রুতিরূপে সমাজের এক অংশ যেমন লোভ, লালসা ও ব্যভিচারের বন্যায় নিজেদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছিল, তেমনি নীচের তলায় খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল দারিদ্র্যের সীমাহীন অন্ধকার। এই সময়ের ফ্রান্সের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, শোষণের নির্মম পেষণে দেশের শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। একদিকে তাদের কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের উপরে বর্ষিত হত মালিকদের নৃশংস অত্যাচার ও অপরদিকে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ছিল নিরাপত্তার একান্ত অভাব। ১৮৩৫ সালে ডঃ গুয়েপ্যাঁ (Dr. Guepin) নান্তে (Nantes)-র শ্রমিকদের দুর্দশা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে, তাদের কাছে বেঁচে থাকার অর্থ ছিল মৃত্যুমুখে পতিত না হয়ে কোনক্রমে টিঁকে থাকা মাত্র। সমকালীন শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা অগুস্ত্ ব্লাঁকি (Auguste Blanqui) লিয়ঁ (Lyous)-র ক্রোয়া-রুস্ (Croix-Rousse) শহরতলি অঞ্চলটি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন যে, সেখানে সুতোর কলগুলিতে নারী শ্রমিকদের বাৎসরিক আয় ছিল মাত্র ৩০০ ফ্রাঁ ও তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হত দৈনিক ১৪ ঘণ্টা করে। দারিদ্র্য, দুরারোগ্য ব্যাধি, উচ্ছৃংখলতা ছিল শ্রমিক

পরিবারগুলির নিত্যসঙ্গী। এর ফলে ভিক্ষা, পতিতাবৃত্তি ও বিভিন্ন কদর্য হিংসাত্মক অপরাধের সংখ্যা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলে সমাজের ওপরতলার মানুষদের কাছে শ্রমিকরা হয়ে দাঁড়িয়েছিল "বিপজ্জনক একটি শ্রেণী" (dangerous class)

ফ্রান্সের সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রটি সে যুগের অনেক লেখককেই গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। ভিকতর উগো (Victor Hugo), জর্জ সাঁ (George Sand), বালজাক (Balzac) তাঁদের একাধিক উপন্যাসে সমকালীন ফ্রান্সের সামাজিক জীবনের গভীর, তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সে সময়ের দু'টি ঐতিহাসিক রচনা, সামাজিক ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব অপরিসীম। তার একটি হল ভিদো (Vido)-র জবানবন্দী ও অপরটি হল ইউজিন স্যু (Eugene Sue)-এর Mysteres de Paris, যেটি সমকালীন ফ্রান্সের নিম্নবর্গের মানুষদের সামাজিক অবস্থা সংক্রান্ত একটি প্রামাণ্য দলিলরূপে আজও স্বীকৃত।

এই অসহনীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোষ ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করতে শুরু করেছিল ও অবশেষে ২২-২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে নতুন করে এক অভ্যুত্থান সংঘটিত হল ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই লুই ফিলিপ প্যারিস ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই অভ্যুত্থানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এতে শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। ফরাসী বিপ্লবের জ্যাকোবিন ভাবধারা, যা ছিল রাজতন্ত্রবিরোধী ও একটি বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে, ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে শ্রমিকদের প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল। কিন্তু নানা কৌশলে বড় বড় শিল্পপতিরা তাঁদের সংকীর্ণ স্বার্থে শ্রমিক আন্দোলনেরই একজন প্রভাবশালী কিন্তু কল্পনাবিলাসী নেতা লুই ব্লাঁ (Louis Blanc)-কে ব্যবহার করে প্রথমে একটি অস্থায়ী সরকার ও পরে সেটিকে একটি নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে স্থায়ী সরকারে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এই নীতি অনুসরণ করার অন্যতম আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজের অন্যান্য শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এর পরিণতিতে ২২শে জুন, ১৮৪৮ সালে প্যারিসের রাজপথে ফরাসী শ্রমিকদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ এক ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করল। এই অসম দ্বন্দ্বে পরিশেষে শ্রমিকদের পিছু হঠতে হয়েছিল ও

শ্রমিকশ্রেণীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবের এক মর্মন্তুদ, রক্তাক্ত পরিসমাপ্তি ঘোষিত হল।

একই সময়ে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয় ও সব ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি প্রতিবিপ্লবের কাছে পরাভূত হয়েছিল। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৮৪৮ সালে জার্মানী ও হাঙ্গেরীতে বিপ্লবী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবীদের জয়লাভ। এই কালপর্বের ঐতিহাসিক তাৎপর্যটি এখানেই যে, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী গণতন্ত্রের যে জ্যাকোবিন আদর্শটি মূর্ত হয়ে উঠেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য দশকের গণতান্ত্রিক, বিপ্লবী আন্দোলনগুলির পিছনে সেটি ছিল অন্যতম প্রেরণার উৎস।

॥ ৩ ॥

দ্বৈত বিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণী

শিল্পবিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের যুগপৎ প্রভাবে ইউরোপে ধীরে ধীরে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। শিল্পবিপ্লবের পরিণতিতে ইউরোপে ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার যে মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন মূলতঃ অর্থনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রতিরোধ সংগ্রামকে প্রধানতঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়: (ক) মেশিনভাঙ্গার আন্দোলন বা লাডডাইট্ (Luddite) আন্দোলন; (খ) অর্থনৈতিক কারণে ধর্মঘট।

মেশিনভাঙ্গা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশকে, যার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৮৩০ সালে। এই আন্দোলনের অন্যতম কারণ ছিল একাধিক হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রবর্তন। ব্রিটেনে এই প্রভাব সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়েছিল সূতীবস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে। শিল্পবিপ্লবের পূর্ববর্তী পর্যায়ে এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের কাছে উৎপাদনের ক্ষেত্রে মেশিনের ব্যবহার ছিল অজানা। ফলে মেশিন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের কর্মচ্যুতির ঘটনা প্রবল হয়ে উঠল। হস্তচালিত যন্ত্রের সঙ্গে মেশিনের এই অসম দ্বন্দ্বে কুটিরশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা ক্রমশঃ অনিশ্চয়তা, ছাঁটাই, দারিদ্র্য ও

বেকারত্বের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে বাধ্য হল ও তারই পরিণতিতে শ্রমিকদের সমস্ত আক্রোশ কেন্দ্রীভূত হল মেশিনের উপরে। মেশিন প্রবর্তনই ছিল শ্রমিকদের জীবনের অভিশাপ ও অশান্তির মূল কারণ,—এই ধারণা থেকেই জন্ম নিয়েছিল মেশিনভাঙ্গার আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে যা লাড্ডাইট আন্দোলন নামে খ্যাত হয়ে আছে। কারখানা ও মালের গুদাম-গুলিতে অগ্নিসংযোগ, যন্ত্রপাতি লুণ্ঠন ও ধ্বংস, প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন ক্রমে তীব্র আকার ধারণ করে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, ১৭৯০ সাল নাগাদ জেনারেল নেড লাড (Ned Ludd) নামে ব্রিটেনে লাই-সেস্টারশায়ারের এক জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা প্রথম এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন; তার ফলেই এই আন্দোলন "লাড্ডাইট্" নামে বিশেষিত হয়। লাড্ডাইট্ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও ব্যাপকতার দিকে তাকালে দেখা যায় যে মেশিনভাঙ্গার ঘটনা সবচেয়ে হিংসাত্মক রূপ ধারণ করেছিল ব্রিটেনে। ১৭৯০ সালে ল্যাংকাশায়ারে, ১৮০২ সালে উইল্ট্শায়ারে, ১৮১১-১২ সালে নটিং-হামশায়ারে, ১৮২৬ সালে আবার ল্যাংকাশায়ারে এবং ১৮৩০ সালে বাকিং-হামশায়ারে এই আন্দোলন অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করেছিল। লাড্ডাইট-দের এই আন্দোলন ব্রিটেনের শাসকশ্রেণীকে কতখানি আতংকগ্রস্ত করে তুলেছিল, দু'টি ঘটনা থেকে তা প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ, আন্দোলনকারীদের প্রতিহত করতে ব্যাপক পুলিশী সন্ত্রাসের আয়োজন করা হয়েছিল; উদাহরণ-স্বরূপ, ১৮১১-১২ সালে ১২,০০০ পুলিশ ও অফিসারের যে বিরাট বাহিনীকে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা হয়েছিল, তার সম্মিলিত শক্তি ১৮০৮ সালে পর্তুগালে প্রেরিত ওয়েলিংটনের নেতৃত্বাধীন ফৌজীবাহিনীর থেকেও বেশী ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ১৮১২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আন্দোলন-কারীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থার নামে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী করে, যার বিরুদ্ধে ব্রিটেনের লর্ড সভায় বায়রণের সোচ্চার প্রতিবাদ স্মরণীয় হয়ে আছে।

ফ্রান্সে এই আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৮১৭-২৩ সালে ভিয়েন্ (Vienne), লিঁয় (Lyons) প্রভৃতি স্থানগুলিতে, যদিও ব্রিটেনের তুলনায় ফ্রান্সে লাড্ডাইট্ আন্দোলনের তীব্রতা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। এই সময়ে বেলজিয়মের ব্রুসেল্স, লীজ (Liege), আইপেন (Eipen)-এ ১৮২১-৩০ সালে, জার্মানীর আখেন্ (Aachen), ড্যুসেলডর্ফে ১৮৩০-৩৪ সালে ও

পোল্যাণ্ডের লদস (Lodz)-এ ১৮২৪, ১৮৩৮, ১৮৬১ সালে মেশিনভাঙ্গার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল।

সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে দেখা যায় যে, অসংখ্য ঘটনাবহুল এই লাড্ডাইট্ আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসে ছিল গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্দোলন সম্পর্কে প্রচলিত রক্ষণশীল ধারণাটি হল, মেশিনভাঙ্গার মধ্য দিয়ে আন্দোলনকারীরা সভ্যতা ও প্রগতির বিরোধিতা করেছিল ও সেই অর্থে লাড্ডাইট্ আন্দোলন ছিল সভ্যতার অগ্রগতির পরিপন্থী। লেও উহ্‌হেন (Leo Uhen), জাঁ ব্রঁ (Jean Bron) প্রমুখ ঐতিহাসিকরা এই মতের পক্ষে রায় দিয়েছেন। অপরদিকে বামপন্থী ঐতিহাসিকরা এই আন্দোলনকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চোখে বিশ্লেষণ করেছেন। এঙ্গেলস তাঁর The Condition of the Working Class in England-এ মেশিনভাঙ্গার আন্দোলনের একটি সার্থক বিশ্লেষণ করে দেখান যে, পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছিল বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত থেকে, যদিও তারা পরবর্তীকালে বুঝতে শিখেছিল যে, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে সার্থক করে তুলতে হলে সংগঠিত গণ-আন্দোলনকে আরও ব্যাপক ও তীব্র করা প্রয়োজন। মেশিনভাঙ্গা আন্দোলনকে এঙ্গেলস এই পরিপ্রেক্ষিতে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন[1] ই. পি. টমপসন, এরিখ হবসব্যম্ প্রমুখ ঐতিহাসিকদের সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে এই বিশ্লেষণটিই পুনঃপ্রমাণিত হয়েছে এই আলোচনাগুলি থেকে আমরা কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।

প্রথমতঃ, মেশিনভাঙ্গার আন্দোলন মেশিনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সেদিনের শ্রমিকরা মেশিনকে স্বাভাবিক কারণেই ধনতান্ত্রিক শোষণের হাতিয়ার রূপে মনে করেছিল ও তাই ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মেশিনভাঙ্গার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল। অর্থাৎ, শ্রমিকরা এই আন্দোলনের মাধ্যমে যন্ত্রসভ্যতা বা প্রগতির

1. Frederick Engels, 'The Condition of the Working Class in England', Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 4, পৃঃ ৫০২-৫০৩।

বিরোধিতা করেনি ; এই বিরোধিতা ছিল ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি অপরিণত, অস্পষ্ট রূপ। ইতিহাসের তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শ্রমিকরা সেই ধরনের কারখানা ও শিল্প সংস্থাকেই আক্রমণ করেছিল যেগুলি কুটিরশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তা ও বেকারীর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পবিপ্লবের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়নি এমন সব পেশায় নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষও সেদিন মেশিনভাঙ্গা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কসাই, মুচি, দর্জি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের মানুষ। যেহেতু এঁদের সবার চোখেই যন্ত্রভিত্তিক ফ্যাক্টরীব্যবস্থা ছিল সামাজিক শোষণ ও অত্যাচারের মূর্ত প্রতীক, সেহেতু লাড্ডাইট্ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংহতি ও সৌহার্দ ; তাই এই আন্দোলন ছিল কালের পরীক্ষায় শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অন্যতম সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ। তৃতীয়তঃ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রণোদিত হলেও লাড্ডাইট্-রাই প্রথম সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। অপরিণত হলেও তাদের সাংগঠনিক কার্যকলাপ ছিল তাৎপর্যমূলক। ব্রিটেনে এই সময়তে লাড্ডাইট্দের পরিচালনায় বেশ কয়েকটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়েছিল ; ১৮১২ সালে ল্যাংকাশায়ারে ও ইয়র্কশায়ারে আন্দোলনকারীরা সুস্পষ্ট, সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে, এমন কি পার্লামেণ্টে দাবি সনদ পেশ করেও তাদের বক্তব্যকে রাজনৈতিক রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিল। নিঃসন্দেহে লাড্ডাইট্ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া পূরণ, যেমন, কাজের নিরাপত্তা, ছাঁটাই রোধ, মজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদি ; এ কথাও ঠিক যে এই আন্দোলনের ফলে পুঁজিপতিদের ও সরকারের ওপরে যে প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়েছিল, তারই ফলে পরবর্তীকালে আন্দোলনকারীদের কিছু কিছু অর্থনৈতিক দাবি কর্তৃপক্ষ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এই তথ্যের ভিত্তিতে যখন ফ্রাঁসোয়া ক্রুজে (Francois Crouzet)-র মত কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, লাড্ডাইট্ আন্দোলন ছিল নিছক একটি অর্থ-নৈতিক আন্দোলন মাত্র, তখন সে বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানান যায় না ; কারণ, অপরিণত ও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হলেও এই আন্দোলন ছিল শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক প্রতিবাদ। সেই

প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছিল ব্যাপক গণআন্দোলনের রূপ ধরে, পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

মেশিনভাঙ্গা আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রমিকরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁদের অর্থনৈতিক চাহিদাগুলিকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের দ্বিতীয় একটি পন্থা অবলম্বন করেছিল; সেটি ছিল ধর্মঘটের পথ। লাড্ডাইট্ আন্দোলনের মত ধর্মঘটেরও পীঠস্থান ছিল ব্রিটেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৮০৪-৫ ও ১৮১২ সালে স্কট্ল্যাণ্ডে তাঁতীদের এবং ১৮০৮ ও ১৮১০ সালে ল্যাংকাশায়ারের সুতোশ্রমিকদের ধর্মঘট। ধর্মঘটের জোয়ারে ব্রিটেনের পাশাপাশি ইউরোপের অনেকগুলি দেশই উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ফ্রান্সে ১৮০৬ সালে প্যারিসের ইমারতশ্রমিকরা তাদের কাজের শর্তাবলীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ধর্মঘট করেছিল; উলম (Ulm)-এর ৮০০ সুতোকল শ্রমিক ১৮১৪ সালে মজুরি বৃদ্ধির ও অন্যান্য দাবিদাওয়ার জন্য ধর্মঘট করেছিল, যেটিকে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে নির্মমভাবে প্রতিহত করা হয়। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৭ সালের মধ্যে ফ্রান্সে ৩৮২টি ধর্মঘটের হিসেব পাওয়া যায়; ৭১টি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকরা দেশের ১২১টি অঞ্চলে এই ধর্মঘটগুলি সংগঠিত করে। তার পরে ১৮৪০ সালের ফেব্রুয়ারী ও ১৮৪৪ সালের এপ্রিল-মে মাসে কয়লাখনি শ্রমিকদের সংগঠিত ও ব্যাপক ধর্মঘট হয়েছিল রিভ্-দ্য-গিয়ে (Rive-de-Gier) অঞ্চলে। ফ্রান্সের তুলনায় জার্মানী ও ইতালিতে ধর্মঘট আন্দোলনের ব্যাপকতা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। রাশিয়াতে সেই তুলনায় ধর্মঘট হয়েছিল অপেক্ষাকৃত বেশী। ১৮৪৪ সালে সেণ্টপিটার্সবুর্গ-মস্কো রেলপথ নির্মাণের সময়ে রেলশ্রমিকরা অন্ততঃ চারবার ধর্মঘট করেছিল; ১৮৬১ থেকে ১৮৬৯ সালের মধ্যেও রাশিয়াতে বিভিন্ন ধরনের একাধিক ধর্মঘটের খবর পাওয়া যায়।

শিল্পবিপ্লবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম মূলতঃ লাড্ডাইট্ আন্দোলন ও অর্থনৈতিক ধর্মঘটের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু কালের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল যে, দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার জন্য সংগ্রামই যথেষ্ট নয়, তার জন্য প্রয়োজন আন্দোলনকে একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দান করা। এই পরিপ্রেক্ষিত গড়ে ওঠার পিছনে ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেখা যায় যে ১৮৩০ সালের পর লাড্ডাইট্ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে

আসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশঃ সংগঠিত হতে শুরু করেছিল। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী, জ্যাকোবিনদের বিপ্লবী গণতন্ত্রের আদর্শ, ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ প্রভৃতি ঘটনা ক্রমশই শ্রমিকশ্রেণীকে তার রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব, মতাদর্শ বা সংগঠন গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া যে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিতে শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করেছিল, সেগুলির নেতৃত্ব ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে। কখনও বুর্জোয়াদের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ (যেমন, ফরাসী বিপ্লব, ১৭৮৯), আবার কখনও বা তাদের প্রতিপক্ষ ছিল বুর্জোয়াদেরই একটি গোষ্ঠী (যেমন, ফরাসী বিপ্লব, ১৮৩০)। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লবে নেতৃত্বকারী বুর্জোয়াদের লক্ষ্য ছিল শ্রমিকশ্রেণীর সহায়তায় নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। তাই স্বাভাবিকভাবেই গোড়া থেকেই বুর্জোয়া আন্দোলনের সীমিত লক্ষ্যের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। এই রাজনীতির মূল কথাটি ছিল স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম। ফরাসী বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আদর্শে প্রভাবিত শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তায় পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী তাই তখনও ছিল অনুপস্থিত। পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিরোধের মূল কথাটি ছিল শ্রমিকদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার,—এক কথায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম। বুর্জোয়া শ্রেণীর গণতন্ত্রীকরণের আন্দোলন ছিল সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়াদের স্বার্থ প্রণোদিত; সেই গণতন্ত্রকে তাঁরা আবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট ছিলেন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমানার মধ্যে, যাতে তার সুফল শ্রমিকরা নয়, এককভাবে তাঁরাই ভোগ করতে পারেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনের দু'টি রূপ মূলতঃ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, শ্রমিকরা, বিশেষত ব্রিটিশ শ্রমিকরা, তাদের রাজনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য পার্লামেণ্টে দাবি সনদ পেশ করে সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করেছিল,—এই আশায় যে তাদের দাবিগুলি স্বীকৃত হবে। এই দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ভোটদানের অধিকার, পার্লামেণ্টে

শ্রমিক প্রতিনিধি প্রেরণ প্রভৃতি। এই উদ্দেশ্যে ব্রিটেনে গঠিত হয়েছিল একাধিক পত্রালাপ সমিতি (Corresponding Society), যেগুলি শ্রমিকদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জুতো সেলাই-এর কাজে নিযুক্ত টমাস্ হার্ডির (Thomas Hardy) [১৭৫২-১৮১২] নেতৃত্বে ১৭৯২ সালে প্রথম এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লণ্ডনে। তিনি ছাড়া ফ্রান্সিস প্লেস্ (Francis Place), টমাস্ হলক্রফ্‌ট (Thomas Holcroft) প্রভৃতি শ্রমিকনেতারাও এই আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই সমিতিগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের মধ্যে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করা, অন্যান্য বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা ও শ্রমিকদের রাজনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য একটি সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলা। তাই দেখা যায় যে, ১৭৯২ সালে ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়ে যখন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল, তখন লণ্ডন সমিতি ব্রিটেনে নিযুক্ত তৎকালীন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে গোপনে ফরাসী জনগণের প্রতি ইংরেজ শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বিপ্লবী অভিনন্দনবাণী পাঠিয়েছিল। এই সংগঠনের পাশাপাশি লণ্ডনে Hamden Club, National Union of Working Class প্রভৃতি বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছিল পার্লামেণ্টের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সংস্কারের চেষ্টাকে ফলপ্রসূ করার জন্য। রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের সংহত হবার এই চেষ্টাকে স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন শাসকশ্রেণী স্বাগত জানায়নি। শ্রমিকদের এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকেও ক্ষমতায় আসীন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের স্থায়িত্বের পক্ষে এক ঘোর বিপদ বলে মনে করেছিলেন ও তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে শ্রমিকদের যে কোন ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য নিষ্ঠুর দমননীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতিরূপে শুধুমাত্র পত্রালাপ সমিতিগুলির কার্যকলাপকে নয়, ১৭৯৯ সালে পার্লামেণ্টে গৃহীত একটি আইনের বলে ব্রিটেনে শ্রমিকদের যে কোন ধরনের সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টাকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৭৯৯ থেকে ১৮২৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শ্রমিকদের কার্যতঃ স্বাধীনভাবে কোনও ধরনের সভা, মিছিল বা সংগঠন করার আইনগত অধিকার ছিল না। এই দমনপীড়ন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল ১৮১৯ সালে "পিটারলুর যুদ্ধে"; ঐ বছরে ১৬ই আগস্ট

ম্যাঞ্চেষ্টার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত শ্রমিকদের একটি মিছিলকে পিটারস্‌ফেল্ড স্কোয়ারে নেপোলিয়নের সঙ্গে ১৮১৫ সালে ওয়াটারলুর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অশ্বারোহীবাহিনীকে নিয়োগ করে নির্মমভাবে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছিল; সেই কারণেই শ্রমিকদের চোখে এটি "পিটারলুর যুদ্ধ" নামে পরিচিত। এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বীভৎসতা ও ব্যাপকতা (হতাহতের সংখ্যা ছিল ৫০০-র বেশী) প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ই পি. টম্‌পসন যথার্থই বলেছেন যে এটি ছিল এক কথায় দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ছ'টি দমনমূলক আইন পাশ করে কার্যতঃ শ্রমিকদের যে কোন ভাবে সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টাকেই বেআইনী ঘোষণা করেছিল।

১৮৩০ সালের বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে বুরবঁ (Bourbon) শাসনতন্ত্রের অবসান হলে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নতুন জোয়ার আসে। কিন্তু ১৮৩২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত রিফর্ম বিলে (Reform Bill) শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে উৎসাহজনক কোন কিছুই থাকল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে ও'ব্রায়েন (O'Brien), জি. জে. হারনী (G. J. Harney), আর্নেষ্ট্‌ জোন্‌স (Ernest Jones) প্রমুখ শ্রমিক নেতাদের উদ্যোগে ব্রিটেনে চার্টিস্ট্‌ আন্দোলন (Chartist Movement) শুরু হয়। এই আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল গণমিছিলের মাধ্যমে শ্রমিকদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বলিত দাবিপত্র পার্লামেণ্টে পেশ করা। প্রথম চার্টারটি পেশ করা হয় ১৮৩৯ সালে; এতে ছিল ১০ লক্ষ স্বাক্ষর। দ্বিতীয় চার্টারটি ছিল ৩৩ লক্ষ স্বাক্ষর সম্বলিত, যেটি পেশ করা হয়েছিল ১৮৪২ সালে; তৃতীয় চার্টারটিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন ৫ লক্ষের বেশী মানুষ ও সেটিকে পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করা হয়েছিল ১৮৪৮ সালে। প্রতিটি দাবিপত্রে অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকারের তালিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ভোটাধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তার দাবি। এই আন্দোলনের ফলে ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণীকে সংহত করা গিয়েছিল ঠিকই; ১৮৪০ সালে চার্টিস্টদের পরিচালিত একটি রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঠিক রাজনৈতিক মতাদর্শের অভাবে ও সংস্কারপন্থী মনোভাবের ফলে চার্টিস্ট্‌ আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যায়।

পার্লামেণ্টের দুয়ারে দাবি সনদ পেশ করে রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃতির

চেষ্টা ছাড়াও দ্বিতীয় একটি পথে শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক দাবি আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। এটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত রাজনৈতিক ধর্মঘটের পথ। এপ্রিল, ১৮২০ সালে স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগোতে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের নেতৃত্বে ধর্মঘটের মাধ্যমে সরকার উচ্ছেদের প্রথম এই চেষ্টাটি ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শ্রমিক আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ধর্মঘটে ৬০,০০০-এরও বেশী বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিযুক্ত শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছিল। ফ্রান্সে ১৮৩১ ও ১৮৩৪ সালে লিঁয়তে রেশমশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ধর্মঘটের ওপরে জ্যাকোবিনদের বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রের আদর্শ গভীর প্রভাব ফেলেছিল। লিঁয়র এই ঐতিহাসিক ধর্মঘট ফরাসী শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনাকে নতুন স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। তার ফলশ্রুতিরূপে ১৮৪০ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর প্যারিসে সাধারণ ধর্মঘটের দিন শ্রমিকরা পুলিশের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে উপনীত হয়েছিল। তাদের শ্লোগান ছিল, "অস্ত্র ধর। স্বৈরাচারী ও তাদের বশংবদরা ধ্বংস হোক্।" তিরিশ ও চল্লিশের দশকে ফ্রান্স ছিল উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। এখানেই গড়ে উঠেছিল জার্মান শ্রমিকদের বেআইনী বিপ্লবী সংগঠন। ১৮৩৬ সালে এ. মেউরার্ (A. Maeurer), হাইনরিখ্ আহ্রেণ্ড্স (Heinrich Ahrends) ও পরে ভিল্হেল্ম ভাইট্লিং (Wilhelm Weitling) ও হাইনরিখ্ বাউয়ের (Heinrich Bauer)-এর প্রচেষ্টায় জার্মানীতে বিপ্লবী তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় League of the Just। পরবর্তীকালে এতে যোগ দিয়েছিলেন কার্ল শাপ্পার (Karl Schapper) ও যোশেফ্ মল (Joseph Moll)। ফরাসী শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও জার্মান শ্রমিকদের এই সংগঠনটির মূল কাজ ছিল শ্রমিকদের মধ্যে তাত্ত্বিক ধারণার প্রচার করা। ১৮৪৮ সালে সাইলেশিয়ার তাঁতীদের ধর্মঘট ছিল জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম ব্যাপক রাজনৈতিক গণআন্দোলন। বিদ্রোহী তাঁতীশ্রমিকরা শেষ পর্যন্ত কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই বিদ্রোহকে শুধুমাত্র রুটির লড়াই আখ্যা দেওয়া ভুল হবে। এই বিদ্রোহ, যার সংগ্রামী চরিত্রকে ভাষা দিয়েছিলেন হাইন্রিখ্ হাইনে তাঁর অবিস্মরণীয় কবিতা The Silesian Weavers' Song-এ, কার্যতঃ পরিচালিত হয়েছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

॥ ৪ ॥

শ্রমিক আন্দোলনে দুই পথের দ্বন্দ্ব

ইউরোপে শ্রমিকশ্রেণীর উন্মেষের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মূলতঃ ব্রিটেন ও ফ্রান্স ছিল শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে এই দুই দেশের আন্দোলনের চরিত্র ক্রমশঃ ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করে ও বলা যেতে পারে যে, পরবর্তীকালে সার্বিকভাবেই শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই দুটি ধারা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

ব্রিটেনে প্রথমে লাড্ডাইট্ ও পরে চার্টিস্ট্ আন্দোলনের গতি স্তব্ধ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবনাদর্শটি শ্রমিক আন্দোলনকে সর্বাধিক প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল সেটি ছিল সংস্কারপন্থী মতাদর্শ। এর পিছনে মূলতঃ তিনটি কারণকে চিহ্নিত করা যায়। প্রথমতঃ, ব্রিটেনের বামপন্থী চিন্তাবিদ্‌রাও ছিলেন গভীরভাবে সে দেশের সংসদীয় ব্যবস্থাপ্রসূত মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত; দ্বিতীয়তঃ, টম্পসনের মতে, ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলন ছিল দেশের সংগঠিত ও অত্যন্ত শক্তিশালী মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাবাদর্শের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত; তৃতীয়তঃ, ফরাসী জ্যাকোবিন আদর্শকে ভিত্তি করে ব্রিটেনে যে কয়েকটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল, সেগুলি ছিল সমাজের বৃহত্তর শ্রমিকশ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন। সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ফরাসী বিপ্লবের ঘটনাটিকে ব্রিটেনের শাসকশ্রেণী স্বাগত জানাতে পারেনি। ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে তাঁরা দেখেছিলেন তাঁদের ধ্বংসের ভবিষ্যৎ বীজকে। তাই ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে ধ্বংস করার যে কোন প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টায় ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠী ছিলেন অত্যন্ত সচেষ্ট; এমন কি ব্রিটেনের বুর্জোয়া চিন্তাবিদ্দের একটি প্রভাবশালী অংশও ফরাসী বিপ্লবের বিরোধিতা করাকে সমীচীন মনে করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে এড্‌মাণ্ড বার্কের ও জীবনের একটি পর্বে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী স্মরণীয়।

ফ্রান্সে শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমাবধি ফরাসী বিপ্লবে সাধারণ দরিদ্র মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ বিপ্লবকে একটি গণচরিত্র দিয়েছিল। জর্জ রুদে (George Rude) তাঁর The Crowd in the

French Revolution শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে প্যারিসের সাঁ-কুলোৎ (Sans-Culotte)-দের, অর্থাৎ চরমপন্থী রিপাব্লিকানদের, অংশ-গ্রহণ বিপ্লবে কি ধরনের ব্যাপকতা এনে দিয়েছিল। তার ফলে পরবর্তীকালে জ্যাকোবিনদের প্রতিষ্ঠিত ভাবাদর্শ কোনদিনই সাধারণ মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। উপরন্তু ফ্রান্সে ব্রিটেনের মত কোন সংসদীয় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের শুরুতেই বুর্জোয়া গিরোনদিনদের আদর্শ ও জ্যাকোবিনদের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক মতবাদের সংঘাত আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাই পরবর্তীকালে একের পর এক রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণী। এই ধারাটি তার সার্থক পরিণতি লাভ করেছিল ১৮৭১ সালে প্যারিস কমিউনে, ফরাসী শ্রমিকদের প্রথম সফল গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে। তাই ফ্রান্সের শ্রমিক আন্দোলনে একদিকে যেমন লুই ব্লাঁ (Louis Blanc)-এর মত সংস্কারপন্থী শ্রমিকনেতার সন্ধান পাওয়া যায়, অপরদিকে আবার পাওয়া যায় ওগুস্ত্ ব্লাঁকি (Auguste Blanqui)-র মত অকুতোভয় ব্যক্তিকে, যিনি ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামেই তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এক কথায়, শ্রমিক আন্দোলনের দু'টি ধারা, অর্থাৎ বিপ্লবী সংগ্রামের পথ ও সংস্কারের পথ, ফ্রান্সে ও ব্রিটেনে দু'টি ভিন্ন পরিমণ্ডলে বিকশিত হয়। এই দুই পথের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে ভবিষ্যতের শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইতিহাসের দ্বন্দ্বতত্ত্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের চিন্তা

॥ ১ ॥

কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের সূচনা

ইউরোপে ধনতন্ত্রের সূচনা থেকেই ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অসাম্য ও শোষণের রূপটি সে যুগের বেশ কয়েকজন চিন্তাবিদকে ভাবিয়ে তুলেছিল। শ্রমিক আন্দোলনের উত্থান ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজের মূল সামাজিক চরিত্রটি যত বেশী প্রকট হয়ে উঠল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনাধর্মী চিন্তাও তত বেশী ভিন্ন ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করল এই চিন্তাভাবনার মধ্যে অস্পষ্টতা, অসংগতি, রোমান্টিক কল্পনা ইত্যাদির এক বিচিত্র মিশ্রণ ঘটেছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্বে টমাস্ মোরের (Thomas More) সময়কাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রবার্ট ওয়েনের (Robert Owen) যুগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত এই কালপর্ব ইউটোপীয় (Utopian) বা কাল্পনিক চিন্তার যুগ নামে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে।

পৃথিবীতে সব অত্যাচার, অনাচার, শোষণের অবসান হয়ে এক স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, নতুন পৃথিবী গড়ার এমন ধরনের স্বপ্ন ও কল্পনাবিলাসী ভাবনা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। রোমান কবি ভার্জিল (Virgil) ও প্রথম যুগের খ্রীষ্টমতাবলম্বীদের অনেকেই অসাম্য ও দারিদ্র্যমুক্ত এমন এক আসন্ন "স্বর্ণযুগের" কথা তাঁদের রচনায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মধ্যযুগেও এই ধরনের ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে উত্তর ইতালিতে কৃষক অভ্যুত্থানের এক নেতা ফ্রা দলোচিনো (Fra Dolocino) সমাজের বিত্তবান ও ধর্মযাজকদের প্রতি তাঁর অনাস্থা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানাবর্জিত এক সহজ, অনাড়ম্বর, পবিত্র জীবনযাপনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

কল্পনাধর্মী সমাজচিন্তার প্রথম সার্থক আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ষোড়শ

শতাব্দীতে, মধ্যযুগের শেষে ও ধনতন্ত্রের সূচনাপর্বে। এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্ টমাস্ মোর (১৪৭৮-১৫৩৫) পুঁজিবাদী সম্পর্কের মূল উৎসটিকে তাঁর Utopia গ্রন্থে চিহ্নিত করে গেছেন। আইনজীবী হিসেবে মোর তাঁর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করেছিলেন যে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাই হল সমাজে দারিদ্র্য ও অসাম্যের মূল কারণ। তাই তিনি তাঁর রচনায় ধনসম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অবলুপ্তির ওপরে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তায় অসঙ্গতি ও অস্পষ্টতাও অবশ্যই ছিল। তিনি যে বিকল্প এক সমাজব্যবস্থার কথা কল্পনা করেছিলেন, তা ছিল শোষণহীন সমাজের এক আদর্শ ও অবাস্তব প্রতিরূপ মাত্র; উপরন্তু মোর ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক। ফলে তাঁর কল্পরাজ্যটি ছিল খ্রীষ্টীয় নীতিবোধের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। মোরের "ইউটোপিয়া" তাই কল্পনাই রয়ে গেল, যদিও তিনিই প্রথম সাম্যের প্রশ্নটিকে সামাজিক পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিলেন।

প্রায় একই সময়ে ইতালিতে টমমাজো কাম্পানেল্লা (Tommazo Campanella) [১৫৬৮-১৬৩৯] তাঁর City of the Sun গ্রন্থে এই জাতীয় একটি কল্পরাজ্য বর্ণনা করেছিলেন। ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাপর্বে বিজ্ঞানের জগতে একাধিক সম্ভাবনাময় আবিষ্কার বস্তুজগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের যে বিকাশ ঘটিয়েছিল, তারই ভিত্তিতে তিনি এমন এক আদর্শ গণরাজ্যের কল্পনা করেছিলেন যেখানে শ্রমজীবী জনগণের হাতে থাকবে সে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা, যেখানে বিজ্ঞানী ও কারিগরেরা হবেন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী, যে রাজ্যে তথাকথিত পরভোজীদের, যারা অপরের পরিশ্রমের বিনিময়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন করে, কোন স্থান থাকবে না। কাম্পানেল্লার চিন্তার ওপরে প্রথম যুগের খ্রীষ্টদর্শনের ও প্লেটোর কাল্পনিক চিন্তার প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি শ্রমভিত্তিক, বিশেষতঃ সমস্ত রকম শোষণবিরোধী যে গণরাজ্যের চিন্তা করেছিলেন, উদীয়মান ধনতন্ত্রের সমালোচনাধর্মী দর্শনরূপে তার মূল্য কম নয়।

ইউটোপীয় চিন্তার বিবর্তনের দিকে দৃষ্টি দিলে এর পরেই উল্লেখ করতে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রিটেনে 'লেভেলার' (Leveller) ও 'ডিগার' (Digger) আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, গেরার্ড উইন্স্ট্যান্লির (Gerrard Winstanley)। তাঁর Law of Freedom (১৬৫০) রচনায় উইন্স্ট্যান্লি

তৎকালীন ব্রিটেনের সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লবের পটভূমিকায় সমস্ত রকমের শোষণমুক্ত এক রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা কল্পনা করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল, সামন্ততন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে ব্রিটেনের জনগণ রাজতন্ত্র ও ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবে। তাঁর কল্পনা ছিল, অচিরেই বিভিন্ন ধরনের আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে এই নতুন ব্যবস্থার সূচনা হয়ে ব্রিটেনের শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত মুক্তির পথ প্রস্তুত হবে। উইনস্ট্যান্লির এই চিন্তার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। ১৬৮৮ সালে রক্তপাত-হীন বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটেনে সামন্ততন্ত্রের অবসান হয়ে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তিত হল, ঐতিহাসিক কারণেই তার নিয়ন্ত্রণভার ন্যস্ত হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর হাতে। এই শতাব্দীতেই জার্মানীর কৃষক বিদ্রোহের নেতা টমাস্ ম্যুনৎসার (Thomas Muenzer) পৃথিবীতে সব অত্যাচার, শোষণ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটিয়ে ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকে অন্যতম বিপ্লবী আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

উইনস্ট্যান্লি ও ম্যুনৎসারের কল্পনাধর্মী চিন্তা পরবর্তী যুগে, অর্থাৎ অষ্টা-দশ শতাব্দীতে, প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সের ইউটোপীয় চিন্তাবিদ্দের ওপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সের তিন প্রধান ইউটোপীয় দার্শনিকের নাম উল্লেখযোগ্য। রুশোর মত মোরলি (Morelly)-র চোখেও ব্যক্তিগত সম্পত্তিই ছিল সামাজিক অসাম্য ও শোষণের মূল কারণ এবং সে কারণেই তাঁর The Code of Nature (১৭৫৫)-এ তিনি যে আদর্শ সাম্য-বাদী সমাজের কল্পনা করেছিলেন, সেখানে শ্রমশক্তির প্রয়োগকে তিনি নাগরিকের অন্যতম কর্তব্যরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই পর্বের অপর এক ইউটোপীয় চিন্তাবিদ্, জঁ মেলিয়ের (Jean Mesliere) [১৬৬৪-১৭২৯], ব্যক্তিগত সম্পত্তির ঘোর বিরোধিতা করে এক সমাজব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন যেখানে গোষ্ঠীবদ্ধ কমিউনধর্মী জীবনই হবে মূল সামাজিক আদর্শ। তিনি ছিলেন অত্যাচারিত, শোষিত কৃষকদের প্রতিনিধি ও অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও তিনি কৃষকদের সংঘবদ্ধ-ভাবে অত্যাচার ও অপশাসনের মোকাবিলা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই যুগের আরও এক চিন্তাবিদ্, মাবলি (Mably), ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সমাজজীবনে সমস্ত রকম অভিশাপের মূল কারণরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর কল্পনা ছিল, সাম্যবাদী বণ্টনব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি আদর্শ সমাজ গড়ে

উঠবে, এমন কি, প্রয়োজন হলে স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

প্রাক্-শিল্পবিপ্লব পর্বে ইউটোপীয় চিন্তার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, কল্পনায় কোন এক আদর্শ "স্বর্গরাজ্যে"র কথা চিন্তা করলেও বাস্তবে তার চেহারা কি হবে, তার প্রতিষ্ঠাই বা হবে কোন পথে, সে ব্যাপারে কোন চিন্তাবিদেরই স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সমাজের অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও অসাম্যের বিরুদ্ধে এই জাতীয় ভাবনাচিন্তা ছিল অস্পষ্ট, কল্পনাধর্মী প্রতিবাদ মাত্র। তাই ইতিহাসের বিচারে এই ধরনের মতবাদ নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল হওয়া সত্ত্বেও এর রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত তাৎপর্য অপেক্ষাকৃতভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ।

॥ ২ ॥

কল্পনাধর্মী কমিউনিস্ট চিন্তা

শিল্পবিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের যৌথ প্রভাবে শ্রমিকশ্রেণীর উন্মেষের ফলে ইউটোপীয় চিন্তার ইতিহাসে এক নতুন পর্বের সূচনা হয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে প্রসারিত হতে শুরু করে ও তার পরিণতিতে কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিকশ্রেণী। ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার বন্ধনকে ছিন্ন করে অত্যাচার ও শোষণমুক্ত এক সমাজগঠনের আদর্শের ভিত্তিতে এই যুগের ইউটোপীয় সমাজচিন্তা গড়ে উঠেছিল। ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বিবর্তনের দিকে দৃষ্টি দিলে এর দু'টি ধারা পরিলক্ষিত হয়। একটি ধারা ছিল জ্যাকোবিন ভাবাদর্শে প্রভাবিত ইউটোপীয় কমিউনিস্ট চিন্তার বাহক; অপর ধারাটি ছিল সংস্কারধর্মী কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের চিন্তাভাবনার ফসল।

ইউটোপীয় কমিউনিজমের মন্ত্রগুরু ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের জ্যাকোবিন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ গ্রাকুস্ বাবফ্ (Gracchus Babeuf) [১৭৬০-১৭৯৭]। রুশোর কল্পিত আদর্শ গণতন্ত্রের ভাবনার জগৎকে অতিক্রম করে ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে তিনি এক মৌলিক সমাজ বিপ্লবের কথা চিন্তা করেছিলেন; তাঁর চিন্তার স্বকীয়তা ও বৈপ্লবিক তাৎপর্য এখানেই। বাবফ্ ও ফিলিপ্ পো-

বুয়োনারুরোত্তির (Philippo Buonarroti) মত তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা যে কর্মসূচীর পরিকল্পনা করেছিলেন, ইতিহাসে যা Conspiracy of Equals নামে খ্যাত হয়ে আছে, ঘনিষ্ঠভাবে সেটি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে বাবফ্ ও তাঁর সহযোগীরা ফরাসী বিপ্লবকে শুধুমাত্র সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লব ভাবেননি। তাঁদের চোখে এই বিপ্লব ছিল মানবমুক্তির অগ্রদূত। বাবফের কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে ফ্রান্সে একটি গণতান্ত্রিক, বিপ্লবী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা ; এর মুখ্য কার্যাবলীকে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাকে সামাজিক মালিকানায় রূপান্তরিত করা, প্রতিবিপ্লবীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য ন্যূনতম আয়ের ব্যবস্থা করা,—এক কথায় ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে একটি সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রসঙ্গে জর্জ লিষ্ট্হাইম্ (George Lichtheim) সঠিক মন্তব্যই করেছেন যে, বাবফ্ তাঁর বিপ্লবী কর্মসূচীর মাধ্যমে তাঁর পূর্বসূরীদের (যেমন, রুশো) গণতান্ত্রিক আদর্শের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সাম্যবাদী চিন্তার স্তরে পৌঁছতে পেরেছিলেন এবং পরবর্তীকালের বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে এখানেই তাঁর তাৎপর্য।[1] বলা বাহুল্য, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবে সামাজিক ঐতিহাসিক কারণে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে একটি সংগঠিত শক্তিরূপে আবির্ভূত হওয়া সম্ভবপর ছিল না এবং সে কারণে বাবফের সাম্যবাদী চিন্তায় শ্রমিকশ্রেণীর গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু যে আদর্শ সাম্যবাদের চিন্তা তাঁর কল্পনায় ছিল, পরবর্তীকালের শ্রমিক আন্দোলন তাকে যথোচিত মর্যাদা দিয়েছে।

ফ্রান্সে জ্যাকোবিন প্রশাসন ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। তাই অনেক বিপ্লবীর মত বাবফকেও প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের সংঘাতে শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্লব জয়লাভ করলেও বাবফ্ সাম্যবাদী সমাজের যে বৈপ্লবিক পরিকল্পনা করেছিলেন, তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর একাধিক ফরাসী ইউটোপীয় কমিউনিস্টের চিন্তার মধ্যে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এতিয়েন্ কাবে,

1. **George Lichtheim**, ***The Origins of Socialism***, পৃঃ ২১।

(Etienne Cabet) যাঁর [১৭৮৮-১৮৫৬] "অহিংস সাম্যবাদের" আদর্শ চল্লিশের দশকে ফ্রান্সের শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৮৪০ সালে প্রকাশিত Voyage to Icarie-তে কাবে ভবিষ্যতের এক আদর্শ সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার কথা কল্পনা করেছিলেন। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সের ব্যর্থ বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি Icaria নামে একটি স্বপ্নরাজ্যের চিন্তা করেছিলেন, যার রূপরেখাটি অবাস্তব হলেও তাৎপর্যমণ্ডিত। কাবের কল্পনায় এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় Icarius নামধারী এক ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এবং এই রাজ্যে সমাজব্যবস্থা পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয় Icarius-এ প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী একনায়কত্বের ওপরে। অচিরেই সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি যথার্থ প্রজাতন্ত্র এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে একটি কমিউনিস্ট ব্যবস্থা সেখানে কায়েম হয়, কারণ তাঁর মতে সাম্যবাদ ছাড়া প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণের প্রশ্নে কাবে শ্রমিক আন্দোলন বা শ্রেণীসংগ্রামের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না এবং সেই অর্থে তিনি ছিলেন একজন যথার্থ ইউটোপীয়ান। কিন্তু কল্পনাশ্রয়ী এই "অহিংস" সাম্যবাদের দর্শনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কাবে সমকালীন ইউরোপের লিবারেল বুর্জোয়া চিন্তার সীমানা অতিক্রম করে সাম্যবাদের ভিত্তিতে যে আদর্শ গণরাজ্যের কল্পনা করেছিলেন, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না।

এই যুগের ইউটোপীয় কমিউনিজমের অপর এক প্রবক্তা ছিলেন তেওদোর দেজামি (Theodore Dezamy) [১৮০৩-১৮৫০]। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের বস্তুবাদী দর্শনে প্রভাবিত হয়ে দেজামি যে সমাজব্যবস্থা কল্পনা করেছিলেন তার মূল কথাটি ছিল এই যে, বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থার জন্ম হবে ও সমাজে উৎপাদিত সবকিছুকে বণ্টন করা হবে প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী। তিনি এও বলেছিলেন যে অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাই ১৭৯৩ সালে জ্যাকোবিনদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার ঘটনাকে দেজামি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং ফরাসী বিপ্লবের এই নতুন স্তরের মধ্যে ভবিষ্যৎ মানবমুক্তির সন্ধান করেছিলেন। সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে কাবের মত তিনিও ছিলেন মূলতঃ কল্পনাশ্রয়ী। তাঁর প্রস্তাবিত আদর্শ

গণতন্ত্র কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত হবে এবং সমাজের কোন শ্রেণীই বা হবে সেই বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি, এ সম্পর্কে অন্যান্য ইউটোপীয় কমিউনিস্টদের মত দেজামিও কোন সঠিক পথের নির্দেশ দিতে পারেননি।

ফ্রান্সের মত জার্মানীতেও বাবফের বৈপ্লবিক আদর্শ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এই প্রসঙ্গে যাঁর নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তিনি ছিলেন জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ভিল্‌হেল্‌ম ভাইট্‌লিং (Wilhelm Weitling) [১৮০৯-১৮৭০]। তাঁর আদর্শ ছিল সমাজের সমস্ত শোষণ ও অত্যাচারকে ধ্বংস করে সরাসরি একটি সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেখানে অবহেলিত, নিষ্পেষিত মানুষই হবে সমাজের নিয়ন্ত্রণকর্তা। উত্তর দিতে ব্যর্থ হলেও ভাইট্‌লিং বারেবারেই অসাম্য ও শোষণের সামাজিক কারণটি খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। বিত্তবানদের উচ্ছেদ করে শোষিত, শ্রমজীবী মানুষের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সেটি ছিল ফরাসী জ্যাকোবিনদের ভাবাদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত। জার্মানীর শ্রমিক আন্দোলনের জন্মলগ্নে ভাইট্‌লিং-এর কাল্পনিক সাম্যবাদের চিন্তা তাই আজও স্মরণীয়।

॥ ৩ ॥

সংস্কারধর্মী কাল্পনিক সমাজতন্ত্র

জ্যাকোবিন ভাবাদর্শে প্রভাবিত বাবফপন্থীদের পাশাপাশি কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সংস্কারধর্মী ধারাটির বিকাশ ঘটেছিল এবং এই মতবাদেরও পীঠস্থান ছিল ফ্রান্স। যাঁদের অবদানকে কেন্দ্র করে এই মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল, তাঁদের মধ্যে প্রথমে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্ সাঁ সিমোঁর (Saint Simon) [১৭৬০-১৮২৫] নাম উল্লেখ করতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সের দার্শনিক চিন্তার তিনি ছিলেন অন্যতম উত্তরসূরী। দ্যালেমবের (d'Alembert), মঁতেস্কু (Montesquieu), কঁদরসে (Condorcet) প্রমুখের প্রভাব ছিল তাঁর ওপরে সুদূরপ্রসারী। অন্যান্য কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীর মত সাঁ সিমোঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও নানা ধরনের অসঙ্গতি ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি Letters of a Resident of Geneva (১৮০২), New Christianity (১৮২৫) প্রভৃতি একাধিক রচনায় তাঁর

কল্পনাধর্মী চিন্তাব যে উজ্জ্বল স্বাক্ষব বেখে গেছেন, তাব মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্যণীয়।

প্রথমতঃ, প্রকৃতি ও মানবসমাজের পাবস্পবিক সম্পর্কের ওপবে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে আপন ক্ষমতা প্রয়োগ কবে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার মাধ্যমেই মানুস তাব নিজেব ইতিহাস সৃষ্টি করে। এক কথায, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের শ্রমেব সম্পর্ক স্থাপনেব ফলে যে উৎপাদন প্রক্রিয়াব সৃষ্টি হয়, সেটিই হয়ে দাঁডায সামাজিক অগ্রগতিব ও সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি। কিন্তু এব ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়াই যে ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়, সাঁ সিমোঁব পক্ষে তা অনুধাবন কবা সম্ভবপর ছিল না। তাঁব কল্পনায় মানুষের অভীপ্সা ও যুক্তিজ্ঞানই সমাজ ও ব্যক্তিব পাবস্পবিক সম্পর্ককে, অর্থাৎ উৎপাদনপ্রক্রিয়াকে, নিয়ন্ত্রণ কবে।

দ্বিতীযতঃ, সাঁ সিমোঁব মতে সমাজব্যবস্থাব সুষ্ঠু বিন্যাসের জন্য প্রকৃতিকে করায়ত্ত কবে তাকে সমাজেব প্রযোজনে নিযোগ কবা প্রয়োজন। তিনি এই মত পোষণ কবতেন যে, সেই সমাজব্যবস্থাই প্রকৃত অর্থে সার্থক যা মানুষকে দেয় তাব বিকাশসাধনেব জন্য প্রয়োজনীয় প্রকৃত স্বাধীনতা, কাবণ স্বাধীনতাব সার্থক রূপায়ণ হলে তবেই সৃষ্টিশীল মানুষেব পক্ষে প্রকৃতিব ওপবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কবা সম্ভব। এই বক্তব্যের সূত্র ধবে সা সিমোঁ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যাব মর্মার্থ হল যে, মানুষের ওপবে মানুষেব প্রভুত্ব বিস্তাবের যে কোন প্রচেষ্টাই স্বাধীনতাব পবিপন্থী, কারণ তার ফলে সমাজের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

তাঁর চিন্তাব তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল, সমাজের সব মানুষেব সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাব ফলেই প্রকৃতিব ওপবে মানুষেব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই বক্তব্যেব ওপবে ভিত্তি করেই সাঁ সিমোঁ বলেছিলেন যে, সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সম্মিলিত শ্রম উদ্যোগেব ফলে প্রকৃতিকে সমাজের কবায়ত্ত করা সম্ভব।

সাঁ সিমোঁর চিন্তার মধ্যে বৈপবীত্য ও অসংগতি তাঁর ভাবাদর্শেব বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিচার করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে তিনি মানুষেব ওপরে মানুষের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টার বিরোধী, অপরদিকে তিনি পুঁজিপতি ও শ্রমিকের, অর্থাৎ শোষক ও শোষিতের যৌথ শ্রমের সমন্বয় ঘটাতে আগ্রহী।

আর তারই ফলে তিনি যে কাল্পনিক সমাজব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছেন সেখানে উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেও সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা যে সুষ্ঠু উৎপাদনব্যবস্থার পরিপন্থী, এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হতে পারেননি। সে কারণেই সাঁ সিমোঁর চিন্তায়, বিশেষতঃ তাঁর শেষ পর্বের রচনায়, শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা গুরুত্ব সহকারে স্বীকৃত হলেও শ্রমিক ও পুঁজিপতির স্বার্থের সমন্বয় ঘটাবার তত্ত্ব বারেবারেই উপস্থিত হয়েছে। এই সমন্বয়তত্ত্বের পিছনে খ্রীষ্টীয় নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর অগাধ বিশ্বাসও ছিল অনেক পরিমাণে দায়ী। পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে যে নীতিশাস্ত্র, যেখানে সংঘাত ও দ্বন্দ্ব প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বর্জনীয়, তার প্রভাব সাঁ সিমোঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তার ফলে শেষ জীবনে তিনি মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের অবসান ঘটাতে খ্রীষ্টীয় নীতিশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেই সমন্বয়সাধনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছিলেন। সমাজজীবনের অসাম্য সম্পর্কে সচেতন হয়েও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে সাঁ সিমোঁর কল্পিত সমাজতন্ত্র তাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

সাঁ সিমোঁকে অনুসরণ করে ফ্রান্সে তাঁর অনুগামীরা যে ধারাটি গড়ে তোলেন, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে সেটি সাঁ সিমোঁবাদ (Saint Simonism) নামে পরিচিত। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন বাজার (Bazard) [১৭৯১-১৮৩১], আঁফাতাঁ (Enfantin) [১৭৯৬-১৮৬৪] ও রোদ্‌রিগ্‌ (Rodrigues) (১৭৯৪-১৮৫১)। এঁরাও সাঁ সিমোঁর মত কাল্পনিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন ও এঁদের চিন্তাতেও গুরুতর অসঙ্গতি ছিল। তবে সাঁ সিমোঁবাদীরা এক শোষণমুক্ত, কল্পনাশ্রয়ী সমাজব্যবস্থার কথা চিন্তা করেও সাঁ সিমোঁর চিন্তার জগৎকে পিছনে ফেলে একটি ধাপ এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। রোদ্‌রিগ্‌ সম্পাদিত Le producteur পত্রিকায় ও সাঁ সিমোঁর অনুগামীদের উদ্যোগে প্রকাশিত The Doctrine of Saint Simon : Exposition গ্রন্থে তাঁরা সমাজে শোষণ ও অসাম্যের মূল কারণ হিসেবে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাকে চিহ্নিত করেছিলেন। Doctrine-এ শ্রমিক ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপরে লেখা স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে তাঁরা বলেছিলেন যে, আধুনিককালে শ্রমিকরা হল দাস ও ভূমিদাসদের (Serf) উত্তরসূরী এবং তারাই সমাজে চূড়ান্ত বঞ্চনা, শোষণ ও অসাম্যের

শিকার হয়ে দাঁড়ায়। আইনতঃ একজন শ্রমিক স্বাধীন হলেও কার্যতঃ সে উৎপাদনব্যবস্থা যারা নিয়ন্ত্রণ করে তাদেরই আজ্ঞাবহ। তাই অসাম্য ও শোষণের মূলোচ্ছেদ করতে সাঁ সিমোঁর অনুগামীরা সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রীয় মালিকানা গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন, যদিও কোন্ পথে ও কাদের নেতৃত্বে তাঁদের ভাষায় একটি আদর্শ শ্রমিকসংস্থা (an association of workers) গড়ে উঠবে, তার কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এঁদের চিন্তায় ছিল না।

সাঁ সিমোঁ এবং তাঁর অনুগামীরা কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইতিহাসে যে ধারাটির সূচনা করেছিলেন, তার সূত্র ধরে এই ভাবাদর্শকে একটি নতুন স্তরে উন্নীত করেছিলেন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরাসী সমাজতন্ত্রী শার্ল ফুরিয়ে (Charles Fourier) [১৭৭২-১৮৮৭]। সাঁ সিমোঁর তুলনায় ফুরিয়ের চিন্তা ছিল আরও অসংগঠিত, যদিও ইউটোপীয় দর্শনের ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ফুরিয়ে তাঁর The Theory of Four Movements and the Future in General (১৮০৮), The Traits of Domestic and Agricultural Association (১৮২২) এবং The New Industrial Society and Partnership (১৮২৯) রচনাগুলিতে ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থার এক আদর্শ রূপরেখা উপস্থাপিত করেছিলেন। এই গ্রন্থগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ফুরিয়ের কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

প্রথমতঃ, নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সে প্রথমে রাজা দশম চার্লস ও পরে লুই ফিলিপের আমলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চূড়ান্ত দুর্নীতি, শোষণ ও ব্যভিচারের মাধ্যমে যেভাবে নিজের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছিল, ফুরিয়ের কাছে সে অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তীব্র যন্ত্রণাময় এবং সে কারণে ইতিহাসকে তিনি কোন আশাবাদী দর্শনের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করতে পারেননি। সাঁ সিমোঁ ইতিহাসকে সভ্যতার অগ্রগতির মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করেছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সে ধনতন্ত্রের বিকাশের পথের ভয়াবহ কদর্যতা ফুরিয়ের ইতিহাস চেতনাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর চোখে শিল্পের প্রগতি ছিল সমাজের পক্ষে এক অভিশাপস্বরূপ। যেহেতু শিল্পবিপ্লবের পরিণতিতে ফ্রান্সে পুঁজিবাদের শোষণভিত্তিক চরিত্রটি অত্যন্ত নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেহেতু যন্ত্রসভ্যতার বিকাশের মধ্যে তিনি কোন নতুন ইতিহাস রচিত হবার সম্ভাবনা দেখেননি। উপরন্তু তাঁর কাছে এটি ছিল

সভ্যতা ও প্রগতির পরিপন্থী। তাই তাঁর রচনার মূল সুরটি হল পুঁজিবাদের সমালোচনাধর্মী; তীব্র শ্লেষ, বিদ্রূপ ও কটাক্ষের ইঙ্গিতে তাঁর রচনাগুলি পূর্ণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই পুঁজিবাদের ছাপ মারা যন্ত্রসভ্যতা ফুরিয়ের চোখে ছিল প্রগতিবিরোধী। ফুরিয়ের এই বিশ্লেষণের মধ্যে তাঁর চিন্তার সাফল্য ও ব্যর্থতা দুইই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদের সমালোচকের ভূমিকায় তাঁর অবদান যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি সমাজে দুর্নীতি, শোষণ ও অসাম্যের মূল উৎসটি অনুসন্ধান না করে যন্ত্রসভ্যতাকে সব অন্যায়ের কারণরূপে চিহ্নিত করে ও সভ্যতার এবং সামাজিক প্রগতির পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে তিনি কার্যতঃ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সের অপর এক কল্পনাধর্মী চিন্তাবিদ্, মাব্লির মত ফুরিয়ে এই ধারণার বশবর্তী হয়েছিলেন যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা (passion) সার্থকভাবে চরিতার্থ হলে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে। এই তত্ত্বের ওপরে ভিত্তি করে ফুরিয়ে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমবিভাজন পদ্ধতি (division of labour) যেহেতু মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে তৃপ্ত করতে পারে না, সেহেতু ভবিষ্যতে এমন এক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন যার ফলে বাধ্যতামূলক শ্রমের যন্ত্রণা থেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে। ফুরিয়ের মতে একমাত্র এই নতুন সমাজেই মানুষের আকাঙ্ক্ষাসমূহ সার্থক বিকাশ ও চরিতার্থতা লাভ করবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তিনি সমবায়ের নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত এক কাল্পনিক সমাজব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে রবার্ট ওয়েনকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। সাঁ সিমোঁর মত ফুরিয়েও সমবায়ের মাধ্যমে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের দ্বন্দ্বের নিরসন করে দুই-এর স্বার্থের এক আদর্শ সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন, কারণ উভয়ের চিন্তার জগতে শ্রমিক ও পুঁজিপতি ভিন্ন ধাঁচের মানুষ হিসেবে উপস্থিত মাত্র, পরস্পরবিরোধী সামাজিক শ্রেণীর সদস্যরূপে এঁদের আন্তঃ-সম্পর্ক ছিল তাঁদের কাছে অজ্ঞাত। ফুরিয়ে সমবায় নীতির ওপরে ভিত্তি করে যে সমাজব্যবস্থার কল্পনা করেছিলেন, তার মূল ভিত্তিটি হল phalange, অর্থাৎ ১৬০০ সদস্যের এক একটি গোষ্ঠী। প্রতিটি phalange গঠিত হবে সদস্যদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এবং এগুলি হবে স্বনির্ভর, অর্থাৎ কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি বিভিন্ন জীবিকার মাধ্যমে এরা গোষ্ঠীর সব রকম প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। phalange-র সদস্যদের পৃথক বা স্বতন্ত্র বাসগৃহ থাকবে না,

তারা বাস করবে phalanstere-এতে, অর্থাৎ এক একটি বৃহৎ বসতবাড়ীতে, যেগুলি phalange-র নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে। ফুরিয়ের এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি ব্যক্তিকে শ্রমের মাধ্যমে গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গোষ্ঠীগুলিকে স্বনির্ভর করে তোলা। তাঁর মত ছিল, এই ব্যবস্থার ফলেই প্রতিটি মানুষ তার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলির সার্থক বিকাশলাভের প্রকৃত সুযোগ পাবে। এর ফলে ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা থেকেই শ্রমের সৃষ্টি হবে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত রকম শোষণ ও বঞ্চনারও অবসান ঘটবে। বলা বাহুল্য, ফুরিয়ের এই চিন্তার কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। সমাজব্যবস্থার দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত শোষক ও শোষিতের স্বার্থের সমন্বয় ঘটিয়ে কিভাবে সাম্য ও সহযোগিতাভিত্তিক এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, ফুরিয়ে সে সম্পর্কে কোন বাস্তবসম্মত নির্দেশ দিতে পারেননি। তাই শার্ল ফুরিয়ে শেষ পযন্ত কল্পনাশ্রয়ী, সংস্কারধর্মী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাব অন্যতম কর্ণধাররূপেই ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছেন।

ফুরিয়ের মৃত্যুর পরে তাঁব চিন্তাব দুর্বলতম দিকগুলি তাঁর অনুগামীদেব প্রভাবিত করেছিল। এর ফলস্বরূপ, ফুরিয়েব ভাবাদর্শকে কেন্দ্র করে যে চিন্তাধারা গড়ে ওঠে, শ্রমিক আন্দোলনেব ক্ষেত্রে সেটির তাৎপর্য বিশেষ ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। সহযোগিতা, সমন্বয় ইত্যাদি ধারণাগুলির ওপবে ভিত্তি করে ফুরিয়ের অনুগামীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, কোন বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ হবে শ্রমিক স্বার্থেরই পরিপন্থী, কারণ সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে একমাত্র সহযোগিতার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির পথ সুগম হবে। এক কথায়, ফুরিয়েব কল্পনাধর্মী চিন্তার এক চূড়ান্ত সংস্কারবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাঁর অনুগামীরা। ফুরিয়েপন্থীদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ভিক্তর কঁসিদেরাঁ (Victor Considerant) ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত Principles of Socialism গ্রন্থে ও La de´mocratic pacifique পত্রিকায় লিখিত Political and Social Manifesto of Peaceful Democracy প্রবন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গীব ভিত্তিতে সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, শ্রমিকশ্রেণী হল সমাজের তীব্রতম শোষণ ও বঞ্চনার ভাবে জর্জরিত; এই অবস্থায় বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিপ্লবের

সম্ভাবনাকে বাতিল করতে হলে প্রয়োজন পুঁজি, শ্রম ও মেধার সমন্বয় এবং এমন ধরনের সংস্কারসাধন যার ফলে শ্রমিকদের কাজের অধিকারকে সুনিশ্চিত করা যায়। কঁসিদের্ঁার মত ফুরিয়েপন্থীদের সঙ্গে ফুরিয়ের নিজস্ব সংস্কারপন্থী চিন্তার পার্থক্য এই প্রসঙ্গে তাৎপর্যবহ; ফুরিয়ে সংস্কারবাদী হয়েও তাঁর কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাব মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার এক ধরনের পরিবর্তনের কথা চিন্ত করেছিলেন। কিন্তু ফুরিয়েপন্থীদের উদ্দেশ্য ছিল গোটা ব্যবস্থাটিকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবাব পথ থেকে নিবৃত্ত করা।

ফ্রান্সে যেমন ফরাসী বিপ্লবের যুগান্তকারী প্রভাবে ইউটোপীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বিভিন্ন ধাবায় আত্মপ্রকাশ করেছিল, তেমনি শিল্পবিপ্লবেব পরিণতিতে ব্রিটেনেও কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবেব প্রসারের সময় থেকেই ব্রিটেনে পুঁজিবাদের সমালোচনাধর্মী চিন্তার বিকাশ ঘটতে শুরু করেছিল। চার্লস হল (Charles Hall) [১৭৪৫-১৮২৫] তাঁর বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সভ্যতার অগ্রগতি ও সামাজিক সম্পদের প্রাচুর্য বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে "ধনিক শ্রেণী" ও "দরিদ্র শ্রেণীর" মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়ে যায়। দেশের আইন ও সম্পত্তি থাকে ধনীদের (অর্থাৎ পুঁজিপতি ও ভূস্বামী) পক্ষে; অপরদিকে দরিদ্রদেব (অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী) পক্ষে শ্রম বিক্রয় করা ছাড়া বেঁচে থাকার অন্য কোন পথ খোলা থাকে না। এই সময়ের অপর একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্রিটিশ চিন্তাবিদ্ উইলিয়াম্ গড্-উইন [William Godwin] [১৭৫৬-১৮৩৬] ভবিষ্যৎ সমাজের একটি কাল্পনিক, আদর্শবাদী ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছিলেন। যদিও রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে গড্উইন মূলতঃ নৈরাজ্যবাদী চিন্তাব অন্যতম পূর্বসূরী বলে পরিচিত, ইউটোপীয় চিন্তার বিকাশে তাঁর The Inquiry Concerning Political Justice (১৭৯৩)-এর তাৎপর্য উপেক্ষণীয় নয়। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর চিন্তায় সাম্যবাদী ধ্যানধারণার ইঙ্গিত না পাওয়া গেলেও তাঁর নৈরাজ্যবাদী দর্শনের মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি গভীর অর্থবহ। গড্উইনের মতে, একজন ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়বোধ ও অন্যান্য গুণ ও মূল্যবোধের যে সমন্বয় ঘটে, ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় তার সার্থক বিকাশ ঘটতে পারে না। এই বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা যেহেতু

ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষাকর্তা, সেহেতু রাষ্ট্র হল একটি বর্জনীয় প্রতিষ্ঠান। তাই শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে গড্‌উইন একটি নৈরাজ্যবাদী জগতের কল্পনা করেছেন। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যক্তিমানসের বিকাশের পরিপন্থী এবং সমাজে অসাম্যের জন্যও দায়ী মূলতঃ এই ব্যবস্থা,—গড্‌উইনের এই বিশ্লেষণ কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইতিহাসে তাঁর স্থানকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটেনে ইউটোপীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ ছিলেন রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) [১৭৭১-১৮৫৮]। ব্রিটেনে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পথিকৃৎ ওয়েনের নাম ইউটোপীয় চিন্তার ইতিহাসে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ, সেটি তাঁর চিন্তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। প্রথমতঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের যুক্তিবাদী দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যার মর্মার্থ হল, সামাজিক পরিবেশের প্রভাবেই মানুষের চরিত্রের বিকাশ ঘটে এবং প্রতিবেশকে অস্বীকার করে ব্যক্তিমানসের সার্থক বিকাশ ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় সম্ভবপর হয় না। এই ধারণার ভিত্তিতে শিল্পবিপ্লবোত্তর ব্রিটেনের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তীব্র সমালোচকরূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। পুঁজিবাদ ব্রিটেনে যে মুনাফাকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল, তার প্রভাবে একদিকে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার ক্রমাবনতির ও অপরদিকে শ্রমিকের ব্যক্তিসত্তার ধ্বংসের প্রক্রিয়ার নিষ্করুণ চিত্রটি তিনি জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। ওয়েন শিল্পবিপ্লবের গুরুত্বকে স্বীকার করেও শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এটি ছিল যে এক অভিশাপস্বরূপ সেটি অনুধাবন করতে ভুল করেননি। আবার সেই সঙ্গে তিনি এও মনে করতেন যে শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে মুক্তি অর্জন করার চেষ্টা নিরর্থক। তাঁর কাছে শ্রেণীসংঘর্ষ ছিল প্রতিহিংসার সমার্থক এবং মূলতঃ একজন মানবদরদীরূপে রবার্ট ওয়েন শ্রমিক অভ্যুত্থান, শ্রেণীসংগ্রামে শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া প্রভৃতি প্রশ্নগুলির আলোচনা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন।

পরিবেশ ও ব্যক্তিমানসের পারস্পরিক সম্পর্কের তত্ত্বের ওপরে ভিত্তি করে ওয়েনের চিন্তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয়। ফুরিয়ের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সংগঠিত করে সামাজিক

শোষণ থেকে মুক্ত করা সম্ভব। যেহেতু পরিবেশই হল মানসিকতার নিয়ন্ত্রণকর্তা, সেহেতু ওয়েনের ধারণা ছিল যে, গোষ্ঠীবদ্ধ, কমিউন জীবনের পরিবেশ গড়ে তুলতে পারলে মানুষে মানুষে রেষারেষি, শোষণ ও অসাম্য পৃথিবী থেকে লুপ্ত হবে। এই আশায় ভর করে তিনি যে কেবলমাত্র তাঁর বিভিন্ন রচনায় (যেমন, The Book of the New Moral World, ১৮৪৪) ভবিষ্যৎ সমাজের এই আদর্শ চিত্রায়িত করেছিলেন তা নয়, বাস্তব জীবনে তাব রূপদান করারও চেষ্টা করেছিলেন। এখানেই ছিল ওয়েনের সঙ্গে অন্যান্য কল্পনাধর্মী চিন্তাবিদ্‌দের তফাৎ।

ওয়েনের দৃষ্টিতে সমবায়ভিত্তিক গোষ্ঠীজীবনের আদর্শটি ছিল মোটামুটি এই বকম : সবার জন্য একই ধরনেব আইন, একই ধরনের প্রশাসন, অধিকার ও কর্তব্যের সমত্ব, যৌথ শ্রম ও যৌথ সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা। এই আদর্শের ভিত্তিতে তিনি ১৮০০-১৮২৯ পর্বে স্কটল্যাণ্ডের নিউ লানার্ক (New Lanark)-এ এই ধবনের একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার পবীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার পরিণতিতে নিউ লানার্কে যে কলোনি গড়ে উঠেছিল, তার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য। সেখানে মামলা-মোকদ্দমা, পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটেব ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়েছিল। একই সময়তে যেখানে ব্রিটেনের অন্যান্য অঞ্চলে শ্রমিকদের ১৩ থেকে ১৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হত, এখানে তাঁদের শ্রমের সময় নির্ধারিত হয়েছিল ১০ ঘণ্টা। কার্পাসশিল্পে সংকটের জন্য একবার যখন চাব মাসের জন্য কারখানা বন্ধ রাখা হয়েছিল, নিউ লানার্কের মিলে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিককে পুরো চার মাসের বেতন দেওয়া হযেছিল। পববর্তীকালে ফ্রান্স, জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করে রবার্ট ওয়েন বারে বারেই তাঁর চিন্তার যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই আদর্শকে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ যেহেতু পুঁজিবাদীদের শ্রমিকস্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করা, সেহেতু তাঁর এই চিন্তা তাঁর নিজের দেশে এবং অন্যান্য কোথাও সাড়া জাগাতে পারেনি। স্বভাবতই এই জাতীয় পরীক্ষা নিউ লানার্কের মত ক্ষুদ্র পরিসরে সাফল্যমণ্ডিত হলেও পুঁজিনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় এই আদর্শ যে গ্রহণযোগ্য হবে না, তা বলা বাহুল্য মাত্র। তাই এই আদর্শ ব্যবস্থার রূপায়নের প্রশ্নে ওয়েনকে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তিনটি প্রশ্নে ওয়েন বিপুল বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রথমতঃ, ওয়েনের

ভাবনাচিন্তার বাস্তব রূপায়নের অর্থ ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক সম্পত্তিকে খর্ব করা ; তাই পুঁজিপতিরা সর্বতোভাবে ওয়েনের বিরোধিতা করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ওয়েন ছিলেন চার্চবিরোধী, কারণ ধর্মীয় আচার আচরণের মাধ্যমে মানুষের মুক্তির পথ প্রশস্ত হতে পারে, এই মতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। যেহেতু ওয়েনের বক্তব্য ছিল যে পরিবেশের সংস্কারই মানুষকে প্রকৃত অর্থে তার ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সচেতন করতে পারে, সেহেতু চার্চের ধর্মীয় শিক্ষা তাঁর চোখে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ও মানবতাবিরোধী। এর ফলে চার্চের ধর্মযাজকরা ওয়েনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তৃতীয়তঃ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে বিবাহপ্রথা স্বীকৃত, ওয়েন তার বিরোধী ছিলেন, কারণ পুরুষশাসিত এই ব্যবস্থায় প্রকৃত নারীমুক্তি সম্ভব নয়। ওয়েন তাঁর আদর্শ কলোনিতে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের ভিত্তিতে তাঁদের ব্যক্তিমানসের স্বাধীন বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাই ব্রিটেনের রক্ষণশীল গোষ্ঠীগুলি ওয়েনের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল।

স্বাভাবিক কারণেই রবার্ট ওয়েনকে পুঁজিবাদী সমাজের আক্রোশের শিকার হতে হয়েছিল। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই তিনি ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ক্রমশঃ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার বিভিন্ন চেষ্টার পর প্রায় রিক্ত অবস্থায় তিনি ব্রিটেনে প্রত্যাবর্তন করেন ও শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। ব্রিটেনে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাতও হয়েছিল মোটামুটি এই সময়তেই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের স্বার্থের সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের স্বার্থকে অভিন্ন করে দেখেছিলেন। যদিও অন্যান্য কল্পনাধর্মী তাত্ত্বিকদের মত ওয়েনের আদর্শও শেষ পর্যন্ত বাস্তবতার কঠিন আঘাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল, তবুও তাঁর চিন্তায় প্রভাবিত হয়েছিলেন সমকালীন ব্রিটেনের বেশ কয়েকজন সমাজতন্ত্রী, যেমন উইলিয়াম্ টম্‌পসন্ (William Thompson), টমাস্ হজ্‌স্কিন্ (Thomas Hodgskin), জন্ গ্রে (John Gray), এবং শ্রমিকদের একটি গোষ্ঠী যাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হেন্‌রি হেদারিংটন (Henry Hetherington) ও তাঁর সহকর্মীরা।

॥ ৪ ॥

কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

এ কথা আজ সর্বজনবিদিত যে বাবফের অনুগামী কাবে, দেজামি প্রমুখের কাল্পনিক সাম্যবাদী চিন্তা বা সাঁ সিমোঁ, ফুরিয়ে ও রবার্ট ওয়েনের সংস্কারধর্মী মতাদর্শ শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। দুটি ধারার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয় চিন্তাই অবশেষে কল্পনার স্বপ্নলোকে পর্যবসিত হয়েছিল। তবে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে, ইউটোপীয় চিন্তার যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শ্রমিক আন্দোলনের উত্থানপর্বে এই তাত্ত্বিকদের পুঁজিবাদ বিরোধিতা, ধনতন্ত্রের বিকল্প এক সমাজব্যবস্থা কল্পনা করার চেষ্টা ও সর্বোপরি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে খর্ব করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার চিন্তা কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মার্কসবাদের উন্মেষের পূর্ববর্তী পর্যায়ে এঁরাই ছিলেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মুখ্য সমালোচক। এই কারণে মার্কস-এঙ্গেলস্ ও পরবর্তীকালে লেনিন ইউটোপীয় চিন্তাবিদ্‌দের অবদানকে, তাঁদের ভাবাদর্শের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে মার্কসবাদের অন্যতম উৎস রূপে বর্ণনা করেছেন।

ইউটোপীয় চিন্তাবিদ্‌রা গভীর মানবদরদী ও পুঁজিবাদের সমালোচক হয়েও শেষ পর্যন্ত কেন কল্পনার রাজ্যেই রয়ে গেলেন, কেনই বা তাঁদের পরিকল্পিত মহান্ আদর্শগুলি বাস্তবে রূপায়িত হল না, সেটিকে অনুধাবন করতে হলে তাঁদের চিন্তার দার্শনিক ভিত্তিটিকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে এঁদের চিন্তার পিছনে প্রেরণা যুগিয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের বস্তুবাদী দর্শনের চিন্তাধারা। ফরাসী বস্তুবাদীরা ছিলেন যান্ত্রিক বস্তুবাদের প্রবক্তা, অর্থাৎ এঁদের মতে বস্তুজগতের পরিবেশ এককভাবে ভাবজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই চিন্তার সূত্র ধরে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদেরও এই ধারণা হয়েছিল যে প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলি অন্তর্নিহিত মানবিক গুণের আধার, যেগুলি উপযুক্ত পরিবেশে বিকাশ লাভ করে। সমাজ বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের ফলে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যেও এই গুণাবলী বর্তমান এবং যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বের নিরসন হয়ে এক আদর্শ সমন্বয়ধর্মী সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে। সেই কারণেই সম্পত্তির

ব্যক্তিগত মালিকানাকে সামাজিক অসাম্যের কারণরূপে চিহ্নিত করলেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সামাজিক উৎসের মধ্যেই যে নিহিত আছে বৈষম্যের মূল কারণ, সেটি তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। তারই ফলে এই চিন্তাবিদ্‌রা সমবায়প্রথা, সম্পত্তির সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নীতি অনুসরণ করে সামাজিক অসাম্য দূর করার কথা বিবেচনা করেছেন।

তাঁদের চিন্তার এই পদ্ধতিগত ত্রুটির পরিপ্রেক্ষিতে কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তার দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, যার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, প্রগাঢ় মানবতাবাদী হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের ভাবাদর্শ বাস্তবে কেন রূপায়িত হল না। প্রথমতঃ, শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ, ব্যথা-বেদনা সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন হয়েও তাঁদের চোখে শ্রমিকশ্রেণী ছিল সমাজের সর্বাধিক অবহেলিত, উৎপীড়িত, শোষিত একটি গোষ্ঠী, অর্থাৎ শ্রমিক ছিল তাঁদেব দৃষ্টিতে একজন শোষিত ব্যক্তি মাত্র। কিন্তু শোষণব্যবস্থাকে চূর্ণ করার চাবিকাঠিও যে শ্রমিকশ্রেণীর হাতেই ন্যস্ত, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শ্রমিকশ্রেণীকে যে পরিবেশের শিকার করে তোলে, তাকে পবিবর্তন কবাব ও সেই উদ্দেশ্যে ইতিহাসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব যে শ্রমিক শ্রেণীরই, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী যে একটি বাজনৈতিক শক্তি ও শ্রমিক যে রাজনৈতিক ক্ষমতাব উৎস, এই দৃষ্টিভঙ্গী মানবতাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের ছিল না। তার ফলে তাঁদের চিন্তা ঐতিহাসিক কারণেই বাস্তববিমুখ হতে বাধ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ, মানবতাবাদের আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় ও শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক শক্তিরূপে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে তাঁরা তাঁদের নিজেদের স্বপ্নকে এক কল্পনার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার শোষণভিত্তিক রূপটি সম্পর্কে তাঁদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা ছিল তাঁদের ইপ্সিত মানবতাবাদী আদর্শের পরিপন্থী। ফলে পুঁজিবাদী সমাজের বিচ্ছিন্নতা জন্ম দিয়েছিল এই কল্পনার, যে কারণে তাঁদের বর্ণিত কল্পরাজ্যের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক ছিল সামান্যই। এক কথায়, মানবতাবাদের আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত হতে দেখে এই চিন্তাবিদ্‌রা বাস্তব ও আদর্শের দ্বন্দ্বের নিরসন করার চেষ্টা করেছিলেন বাস্তব জগতের বিকল্প এক কল্পনার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তা যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সূচনা করেছিল, তার সঙ্গে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের পার্থক্যগুলির তুলনা করলে ইউটোপীয়

চিন্তাবিদদের ভাবাদর্শের সীমাবদ্ধতাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্লেখানভ্ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত একটি প্রবন্ধে এই প্রশ্নটির একটি আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করেছিলেন।[2] প্রথমতঃ, কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা কতকগুলি নৈর্ব্যক্তিক নীতিবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্গাতারা পুঁজিবাদী সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করেছিলেন। এক কথায়, কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীরা কার্যতঃ ছিলেন ভাববাদী; অপরদিকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল কোন শাশ্বত, স্বতঃসিদ্ধ ধারণার পরিবর্তে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির বাস্তবমুখী বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়তঃ, কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের মত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা ভবিষ্যৎ সমাজের রূপরেখা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসের গতিপথকে বিশ্লেষণ করা, যার ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি কোন্ পথে আসবে, তার ব্যাখ্যা তাঁদেব পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। অর্থাৎ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন অবাস্তব কল্পনা নয়, ভবিষ্যতের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ছিল তাঁদের বিশ্লেষণেব মূল কথা। সমাজতন্ত্র একটি রাজনৈতিক ধাবণা ও সেটি প্রতিষ্ঠিত হবে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে,—মার্কস এঙ্গেলসের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ইউটোপীয়ান্ চিন্তাবিদদের পার্থক্যটি ছিল এখানেই যে তাঁরা সমাজতন্ত্র বলতে বুঝেছিলেন ইতিহাস নিরপেক্ষ বিমূর্ত একটি কল্পনাকে। এই কারণেই তাঁদের পক্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। প্রায় একইভাবে কোলাকোভ্স্কি (L. Kolakowski) বলেছেন যে ইউটোপীয় চিন্তার ভিত্তি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্য; মার্কসের কাছে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল শ্রমিকের দারিদ্র্য বা শোষণ নয়,—এই দারিদ্র্য ও শোষণের ফলে সমাজ থেকে শ্রমিকের বিচ্ছিন্নকরণের প্রক্রিয়া। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকেই জন্ম নেয় শ্রমিকের আত্মসচেতনতা ও তা থেকে সৃষ্ট হয় শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা পালন করার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা।[3] কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের চিন্তার জগতে এই দৃষ্টিভঙ্গীটি ছিল অনুপস্থিত।

---

2. G. Plekhanov, 'Preface to the Third Edition of Engels' Socialism : Utopian and Scientific', *Selected Philosophical Works*, Vol. III, পৃঃ ৪৫-৪৬, ৫০।

3. Leszek Kolakowski, *Main Currents of Marxism*, Vol. I, পৃঃ ২২২-২২৪।

তৃতীয় অধ্যায়

মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি ঃ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

মার্কসবাদকে যখন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, অন্যান্য মতাদর্শের মত সমাজচিন্তার ইতিহাসে মার্কসবাদও যেহেতু একটি মতাদর্শ, তার "বৈজ্ঞানিক" চরিত্রটির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটি তবে কোথায় নিহিত ? যে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যৌক্তিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তার অনুসন্ধান পদ্ধতির সঠিকতার ওপরে; পরবর্তীকালের গবেষণায় সাধারণভাবে নতুন উপাদানের সংযোজন হয় অথবা অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের পদ্ধতি ভুল প্রমাণিত হলে সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করে পুরনো পথটিকে বাতিল করা হয় এবং এভাবেই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটে। সমাজচিন্তার ইতিহাসে মার্কসবাদ প্রথম একটি পদ্ধতির জন্ম দেয়, যার ভিত্তিতে মানুষের বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের পারস্পরিক সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের এক ঐতিহাসিক সম্ভাবনার ও এই পদ্ধতিরই সার্থক প্রয়োগ ও বিকাশের মাধ্যমে সভ্যতার ইতিহাসব্যাখ্যার বাস্তব ভিত্তি সৃষ্ট হয়। যে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির ওপরে নির্ভর করে মার্কসবাদ সমাজতন্ত্রের ধারণাকে কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে, চিন্তার ইতিহাসে সেটি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিকেই বলা যেতে পারে মার্কসবাদের মূল তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভিত্তি। কিন্তু যুগান্তকারী যে বিশ্লেষণ পদ্ধতির ওপরে ভিত্তি করে মার্কসবাদের তত্ত্বটি গড়ে উঠেছে, তার স্বরূপ আলোচনা করার পূর্বশর্তরূপে সর্বাগ্রে তার উৎস ও পটভূমিকাটির ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন।

॥ ১ ॥

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের উৎস

উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে মার্কসবাদের উদ্ভব হয়। মানুষের চিন্তার ইতিহাসের এক অভিনব যুগসন্ধিক্ষণে মার্কসবাদের জন্ম। মানব-

সভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ অবদান, তাকে স্বীকার করে নিয়েই মার্কসবাদের সৃষ্টি। সে কারণেই সমকালীন বিজ্ঞানের জগতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের প্রতিভূ চিন্তাবিদ্‌দের কাল্পনিক সমাজতন্ত্র সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা, একাধিক দার্শনিকের প্রগতিশীল মতাদর্শ,—বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত এই চিন্তাগুচ্ছ মার্কসীয় দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতকে সৃষ্টি করেছিল।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মূলতঃ কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার ও তাত্ত্বিক চিন্তার যুগ্ম ফলশ্রুতি। ঐতিহাসিক ঘটনাটি হল ফরাসী বিপ্লব ও শিল্পবিপ্লবের যৌথ প্রভাবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর উত্থান ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা। চল্লিশের দশকে, যেটি ছিল মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাপর্ব, সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনাটি ছিল প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতাবৃদ্ধি। একই সঙ্গে ধনতন্ত্রের অত্যাশ্চর্য উন্নতি ও অপরদিকে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ছিল এই সময়ের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একাধিক সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের পরাজয় ঐতিহাসিকভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর সামনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উপস্থাপিত করেছিল: পুঁজিবাদের জোয়াল থেকে মুক্তি পেতে হলে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করা প্রয়োজন; কিন্তু পুঁজিবাদের ধ্বংস যে অনিবার্য ও সে ধ্বংসকে যে ডেকে আনতে পারে শ্রমিকশ্রেণী, তার নিশ্চয়তা কোথায়? অর্থাৎ, পুঁজিবাদের ধ্বংসের বীজ যে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, এবং পুঁজিবাদ তার জন্মের ও অগ্রগতির প্রয়োজনে যে শ্রমিকশ্রেণীকে সৃষ্টি করে, সেই শ্রমিক-শ্রেণীই যে সঠিক পথে সংগ্রাম পরিচালনা করে ধনতন্ত্রের পতন ঘোষণা করতে পারে,—এই ইতিহাসবোধকে জন্ম দেবার জন্য অনিবার্যভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব দর্শনের,—যে দর্শন প্রলেতারিয়েতকে এই জীবনবোধে উদ্দীপিত করতে পারে।

শ্রমিকশ্রেণীকে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য এই যুগের বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ যে সমাধানসূত্রগুলি দিয়েছিলেন, কালের বিচারে সেগুলি সবই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সাঁ সিমোঁ, ফুরিয়ে, রবার্ট ওয়েন প্রমুখ সংস্কারপন্থী কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিকদের মতাদর্শ। তাঁরা প্রলেতারিয়েতের শোষণমুক্তির জন্য যে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন ও ধনতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে ভবিষ্যৎ সমাজের যে রূপরেখাটি উপস্থাপিত করে-

ছিলেন, কঠিন বাস্তবের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল যে, ইউটোপীয় ভাবাদর্শের ওপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এই ধারণাগুলির মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। এ কথা স্পষ্টই প্রমাণিত হল যে, মানবতাবাদ ও নীতি-বোধের আদর্শকে সম্বল করে পুঁজি ও শ্রমের অসম দ্বন্দ্বের নিরসন করা যায় না, কারণ এই ধরনের চিন্তা পুঁজিবাদের দুর্বলতাকে, পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত গভীর সংকটের বীজকে, সর্বোপরি পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজনে ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত বিরোধিতার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারে যে রাজনৈতিক শক্তি, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী, তাকে চিহ্নিত করতে প্রলেতারিয়েতকে শিক্ষা দেয় না। এক কথায়, এই দর্শন বাস্তববিমুখ ও সংগ্রামবিরোধী।

সংস্কারপন্থীদের পাশাপাশি জ্যাকোবিন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ বাবফ্ ও পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীরাও এক ধরনের কাল্পনিক সাম্যবাদের আদর্শকে ভিত্তি করে শ্রমিকশ্রেণীকে মুক্তির পথ দেখাতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে বিপ্লবকে সুসম্পন্ন করা যায় না, বা বিপ্লবী নিষ্ঠাই যে শ্রমিকমুক্তিকে সুনিশ্চিত করতে পারে না, ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে একের পর এক ব্যর্থ শ্রমিক অভ্যুত্থান, ধর্মঘট প্রভৃতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাবফ্ মূলতঃ ছিলেন একজন একনিষ্ঠ বিপ্লবী ও আদর্শবাদী। কিন্তু পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিকে সুনিশ্চিত করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সঠিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, যেটি ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীব পক্ষে পুঁজিবাদেব প্রকৃত স্বরূপ, তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও তার ধ্বংসের বীজকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুঁজিবাদও এক নতুন পৃথিবীর, এক নতুন দর্শনের সৃষ্টি করেছিল। সেই দর্শন, যার সারবস্তু ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও মধ্যযুগীয় অন্ধকারের করালগ্রাস থেকে ইউরোপকে রক্ষা করলেও অচিরেই পুঁজিবাদী সভ্যতার জন্ম দিয়ে এক ভিন্ন শোষণব্যবস্থার সূচনা করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর সামনে ইতিহাসের প্রয়োজনে যে নতুন দর্শনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, তা পুঁজিবাদী সভ্যতার দার্শনিক চিন্তা থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য ছিল, কারণ ধনতান্ত্রিক সভ্যতাপ্রসূত বুর্জোয়া দর্শনকে ভিত্তি করে বা তার সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়ে পুঁজিবাদী সমাজের প্রকৃত চরিত্রটি অনুধাবন করা সম্ভবপর ছিল না। শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে

তাই ঐতিহাসিকভাবেই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এক বিকল্প দর্শনের প্রয়োজনীয়তা, যে দর্শনের ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণী সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে পুঁজিবাদকে বিশ্লেষণ করে পুঁজিবাদের পতন ঘটিয়ে শুধু শ্রমিকের নয়, গোটা মানবজাতির মুক্তি ঘটাতে পারে। আর তারই ফলশ্রুতিরূপে জন্ম নিয়েছিল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্ব, যা কোন ভাবাবেগ বা বিষয়ীগত দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা চালিত না হয়ে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার নিষ্ঠুর শোষণের বাস্তব সত্যকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে শ্রমিকশ্রেণীকে সাহায্য করে,—যা প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামে পুঁজিবাদ বিরোধিতার মূল তাত্ত্বিক হাতিয়ারে পরিণত হয়। এক কথায়, উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমিকশ্রেণীর সামনে যে নতুন দর্শনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, তা বুর্জোয়া শোষণব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটিযে নতুন এক শোষণব্যবস্থা প্রবর্তিত করার স্বার্থে দেখা দেয়নি; তার প্রয়োজন উৎসারিত হয়েছিল শোষণব্যবস্থাকে চিরকালের জন্য উচ্ছেদ কবার স্বার্থে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি দিলে এই তত্ত্বের ইতিহাসগত প্রয়োজনীয়তাকে নিম্নোক্ত সূত্রগুলির মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা যায়।

প্রথমতঃ, ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংকট পুঁজিবাদী শোষণের প্রকৃত রূপটিকে বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করার বাস্তব ভিত্তি সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে শ্রমিকশ্রেণী ইতিহাসের এই পর্বে একটি রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রমিকশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনবোধ ও ইতিহাসচেতনাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য এক নতুন দর্শনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। তৃতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণীর উন্মেষের ফলে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্যটিও সূচীত হয়েছিল। ইতিহাসে অন্যান্য শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছিল এক শোষণব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে নতুন এক শোষণব্যবস্থা কায়েম করার স্বার্থে। শ্রমিকশ্রেণীর ওপরে সম্পূর্ণ অভিনব এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল, যার তাৎপর্য এখানেই যে এই শ্রেণী ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে ইতিহাসে চিরদিনের জন্য শোষণব্যবস্থার অবসান ঘটাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় যে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা ঐতিহাসিক কারণে বৈপ্লবিক হতে

বাধ্য ছিল, কারণ তার সামনে যে দায়িত্ব উপস্থিত হয়েছিল, তা ছিল সমাজ-ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর ঘটানর বৈপ্লবিক দায়িত্ব। স্বাভাবিকভাবেই এই বৈপ্লবিক দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল এক বিপ্লবাত্মক দর্শনের, যে দর্শনের চরিত্র ইতিহাসের অন্যান্য সব দার্শনিক চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হতে বাধ্য ছিল।

ইতিহাসগত কারণ ছাড়াও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠার পিছনে কয়েকটি তত্ত্বগত কারণও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ সে যুগের একাধিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্ব মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তির উদ্ভবকে গভীরভাবে সহায়তা করেছিল। এগুলির মধ্যে স্মরণীয় ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির (অ্যাডাম্ স্মিথ্, ডেভিড রিকার্ডো) ও কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রবক্তাদের (সাঁ সিমোঁ, ফুরিয়ে, কাবে প্রমুখ) ভাবনাচিন্তা, পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Restoration) পর্বের ফ্রান্সের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্‌দের (গিজো বা Guizot, মিনিয়ে বা Mignet) গবেষণা, বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ মরগ্যানের (Morgan) মৌলিক চিন্তা প্রভৃতি। এঁদের ভাবনার মধ্যে নানা ধরনের অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব সম্পর্কে এঁরা যে বিশ্লেষণের সূত্রপাত করেছিলেন, মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনের উন্মেষের পক্ষে সেটি যথেষ্ট পরিমাণে সহায়ক হয়েছিল। ব্রিটেনে উইলিয়াম পেটি ও জন লক্ যে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক চিন্তার সূত্রপাত করেছিলেন, তাকে অনুসরণ করে অ্যাডাম্ স্মিথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, বিনামূল্যে গ্রহণ করা শ্রমই হল মুনাফা এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সমাজের তিন শ্রেণী, শ্রমিক, পুঁজিপতি এবং জমিদার, মজুরি, মুনাফা এবং জমির খাজনার রূপে জাতীয় আয়ের অংশ পায়। এই আলোচনাকে পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছিলেন রিকার্ডো। স্মিথ ও রিকার্ডোই প্রথম মূল্যের শ্রমতত্ত্বের (labour theory of value) আলোচনার সূত্রপাত করেন, যার সূত্র ধরে মার্কস উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্বের (theory of surplus value) ব্যাখ্যা দান করেছিলেন। বুর্জোয়া দর্শনের সীমাবদ্ধতার জন্য স্মিথ ও রিকার্ডোর পক্ষে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সামাজিক শ্রমের ভূমিকা নিরূপণ করা সম্ভব ছিল না,—যেটি ছিল মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রধান ভিত্তি। তা সত্ত্বেও, স্মিথ ও রিকার্ডো যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন সেটি ছিল পুঁজিবাদী সমাজের বাস্তব অবস্থা প্রসূত। বস্তুবাদী এই বিশ্লেষণ মার্কসের অর্থনৈতিক

তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠা দানের ক্ষেত্রে ছিল গভীর তাৎপর্যবহ। একইভাবে বলা যায় যে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের চিন্তার মধ্যেও যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদ যে একটি অমানবিক সমাজব্যবস্থা ও সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা যে শ্রমিকস্বার্থের পরিপন্থী,—এই ধারণার ভিত্তিতে তাঁরা সে কল্পতত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন, মার্কসবাদের সূত্রপাতের পক্ষে তা ছিল গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁদের চিন্তার মধ্যে অস্পষ্টতা ও অস্বচ্ছতা থাকা সত্ত্বেও পুঁজিবাদের সমালোচনাধর্মী দর্শন হিসেবে মার্কসবাদের উন্মেষের পক্ষে কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ঐতিহাসিক ভূমিকা উপেক্ষণীয় ছিল না। ফ্রান্সে 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা' পর্বের দুই বিশিষ্ট গবেষণাবিদ্ গিজো (Guizot) ও মিনিয়ে (Mignet)-এর অবদানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অসংখ্য তথ্য সহযোগে তাঁরা ফ্রান্সের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার শ্রেণীকাঠামোর এবং সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানার ভূমিকার যে বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ করেছিলেন, মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনের উৎসারণের পক্ষে তা ছিল গভীর অর্থবহ। একই সময়ে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ মরগ্যান্ মানবসমাজের বিবর্তনের যে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছিলেন, মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সেই অবদানও অবশ্যই স্মরণীয়।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দ্বিতীয় তত্ত্বগত উৎসটি নিহিত ছিল সমকালীন দার্শনিকদের চিন্তার মধ্যে। এই দার্শনিক অবদানগুলিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের অন্যতম উৎসরূপে মার্কস-এঙ্গেলস্ চিহ্নিত করেছিলেন ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাপর্বে বস্তুবাদী দার্শনিকদের অবদানকে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিদেরো (Diderot), হলবাথ্ (Holbach), হেলেভেসিয়াস্ (Helvetius), লা মেৎরি (La Mettrie), রোবিনে (Robinet) প্রমুখ প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সের চিন্তাবিদ্রা এবং ব্রিটেনে বস্তুবাদী চিন্তার প্রতিনিধি বেকন, হব্‌স ও লক্। প্রাক্-শিল্পবিপ্লব যুগের এই চিন্তাধারার মধ্যে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এই বস্তুবাদ ছিল একান্তই যান্ত্রিক এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা আংশিকভাবে প্রভাবিত। কিন্তু এই দুর্বলতা সত্ত্বেও এই দার্শনিকরা ভাবজগতের ঊর্ধ্বে বস্তুজগৎকে স্থাপন করে ও বস্তুজগৎ নিরপেক্ষ কোন ধারণা বা চিন্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে মার্কসীয় দ্বন্দ্ব-তত্ত্বের বস্তুবাদী ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন।

মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধারাটির প্রতিনিধি ছিলেন চিরায়ত জার্মান ভাববাদী দর্শনের প্রবক্তারা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাণ্ট্ (Kant), ফিখ্টে (Fichte) ও হেগেল (Hegel)। যান্ত্রিক বস্তুবাদী দর্শন যেমন দ্বন্দ্বতত্ত্বের বস্তুবাদী চরিত্রটির বিকাশলাভে সহায়তা করেছিল, এই ভাববাদী দার্শনিকদের অবদান তেমনি তাৎপর্যমণ্ডিত ছিল মার্কসীয় দর্শনের দ্বান্দ্বিক চরিত্রটির রূপায়নের ক্ষেত্রে। কাণ্ট্ এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করলেন যে মানুষ তাঁর যুক্তিজ্ঞান প্রয়োগ করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ সম্পর্কে ধারণা করতে পারে, যদিও এই জগতের অন্তর্নিহিত অর্থকে বুঝতে হলে যুক্তিজ্ঞান পথ দেখাতে পারে না। কাণ্টের চিন্তা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের উৎসারণের পক্ষে দু'টি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, যুক্তিজ্ঞানের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব—কাণ্টের এই বক্তব্য ছিল বস্তুজগৎ সম্পর্কে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অস্তিত্বের মধ্যে জ্ঞানের সীমানাকে আবদ্ধ না রেখে প্রকারান্তরে এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান কোন সময়েই চূড়ান্ত নয়, কারণ জ্ঞাতব্য জগতের প্রকৃত পরিধি অসীম ও অনন্ত। এক কথায়, ইন্দ্রিয়ানুভূতি যে আপাত জ্ঞানের সন্ধান দেয়, সেই জ্ঞান চূড়ান্ত নয়। কাণ্ট যেহেতু ছিলেন একজন ভাববাদী দার্শনিক, সেই কারণে তিনি আপাত জ্ঞান ও প্রকৃত জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে ভিন্ন এক অতীন্দ্রিয় জগতের কল্পনা করেছিলেন এবং প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হলেও কাণ্ট দুই জগতের মধ্যে এই সীমারেখাটি চিহ্নিত করে কার্যতঃ জ্ঞানপ্রক্রিয়ায় বস্তুর আপাতরূপ (appearance) ও অন্তর্নিহিত চরিত্রের (essence) পার্থক্যের গুরুত্বকে চিহ্নিত করেছিলেন, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যার তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী।[1]

ফিখ্টের বক্তব্য ছিল যে, ব্যক্তি তাঁর স্বসত্তা (ego) এবং পারিপার্শ্বিকের

দ্বান্দ্বিক সংঘাতের মাধ্যমে নিজের বিকাশ ঘটায়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষ তার নিজের ক্ষমতা ও স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হয় ও এই সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ হল তার সৃষ্টিশীলতা। ফিখ্‌টের এই বক্তব্য একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, দ্বান্দ্বিক সংঘাতের প্রশ্নটির অবতারণা করে তিনি মানুষের ইতিহাস সৃষ্টির পিছনে দ্বন্দ্বের তাৎপর্যকে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয়তঃ, দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রয়োগ করে ফিখ্‌টে মানুষের সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন হেগেল। হেগেলের দর্শনের বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে তাঁর চিন্তার দু'টি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত দিক্ এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা যায়। প্রথমতঃ, হেগেলই প্রথম দ্বন্দ্বতত্ত্বের (Dialectics) একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু রূপ দেন, যদিও সেটি ছিল ভাববাদী চিন্তার ফসল। তিনি দেখালেন যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুই নিশ্চল নয়; বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের সমস্ত সত্ত্বা ও ধারণাই এক অতীন্দ্রিয় পরমাত্মার (Spirit) দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় আত্মপ্রকাশের পরিণতি; এই আত্মা যেহেতু প্রতি মুহূর্তে নতুন সত্ত্বা সৃষ্টি করে ও পুরনো সৃষ্টিকে অতিক্রম করে ও এই আত্মা যেহেতু এক বিরামহীন সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের বিকাশ ঘটায়, সেহেতু জগৎসংসারের সব কিছুই চলমান ও পরিবর্তনশীল। দ্বিতীয়তঃ, এই দ্বন্দ্বতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মার সৃষ্টিক্ষমতাকে হেগেল চূড়ান্ত বলে মনে করেছিলেন ও কোন কিছুই যে আত্মার অগম্য ও অবোধ্য নয়, এই আশাবাদী, গতিবাদী দর্শন সৃষ্টি করেছিলেন। ভাববাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন হলেও হেগেলের দর্শন ছিল জগৎকে পরিবর্তন করার একটি আশাবাদী, দ্বান্দ্বিক পরিপ্রেক্ষিত। মার্কসীয় দর্শনের মূল কথাটি হল পুরনো পৃথিবীকে বদল করা ও শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করা যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুই তার আয়ত্তের বাইরে নয়। হেগেলীয় দর্শনের গতিশীলতা ও দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপট তাই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অন্যতম প্রধান উৎস রূপে স্বীকৃত।

মার্কসীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠায় তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ধারাটির প্রতিনিধি ছিলেন লুড্‌ভিগ্‌ ফয়েরবাখ্‌ (Ludwig Feuerbach)। হেগেলীয় দর্শনের ভাববাদী সীমাবদ্ধতার প্রথম সমালোচক ছিলেন ফয়েরবাখ্‌। একাধিক রচনার মাধ্যমে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, আত্মা জাতীয় কোন বিমূর্ত সত্ত্বাকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিয়ে বাস্তবমুখী দর্শন সৃষ্টি করা যায় না। ফয়েরবাখের মতে, মানুষ যখন তার পারিপার্শ্বিকের চাপে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও অসহায় মনে করে,

তখন সেই বোধ থেকেই জন্ম নেয় এই জাতীয় অধিবিদ্যক ধারণা। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরবোধের জন্মও এই কারণেই হয়ে থাকে। তাই ফয়েরবাখের বক্তব্য হল, ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাসকে জন্ম দেয় যে পরিবেশ, তার পরিবর্তন করে মানবসত্তার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাই মানুষের মুক্তি আনতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তিনি এক যুগান্তকারী বক্তব্য রাখলেন যে, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে না, মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে। ফয়েরবাখের দর্শনে হেগেলের চিন্তার বিশালতা ও দ্বন্দ্বতত্ত্বের চুলচেরা বিশ্লেষণ ছিল না ; কিন্তু তাঁর একনিষ্ঠ ভাববাদ-বিরোধিতা ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী মার্কসীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠায় গভীর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এঙ্গেলস্ লিখেছেন, "নানাদিক থেকে ফয়েরবাখ্ হেগেলীয় দর্শন এবং আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে এক অন্তর্বর্তী যোগসূত্র।"

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের তৃতীয় তাত্ত্বিক উৎসটি হল সে যুগের একাধিক অভিনব ও যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যার মাধ্যমে বস্তুজগৎ যে পরিবর্তনশীল এবং বস্তুর নিরন্তর পরিবর্তনের ফলেই যে চলমান বস্তুজগতের বিকাশ ঘটে এই সত্যটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই আবিষ্কারগুলির মাধ্যমেই প্রমাণিত হল যে, কোন তথাকথিত অলৌকিক প্রক্রিয়ার ফলে বস্তুজগতের সৃষ্টি হয়নি এবং বস্তুজগতের গতিশীলতা বস্তুর (matter) গতিশীলতারই অভিব্যক্তি মাত্র। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ তিনটি আবিষ্কার এই পর্বে বিজ্ঞানের জগতে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এগুলি হল : (ক) শক্তির সংরক্ষণ ও রূপান্তর তত্ত্ব ; (খ) প্রাণি-জগতে জীবকোষের গঠন সংক্রান্ত তত্ত্ব ; (গ) ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব।

শক্তির (energy) সংরক্ষণ ও রূপান্তর তত্ত্বের ভিত্তিটি হল বস্তুর অবিনশ্বর-তার তত্ত্ব। প্রাচীন গ্রীসের বস্তুবাদী দার্শনিকেরা প্রথম এই তত্ত্বের জন্ম দেন। পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত (Descartes) গতির পরি-মাণের অপরিবর্তনীয়তার তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশ পদার্থবিদ্ মিখাইল লোমোনোসভ্ ও ফরাসী বিজ্ঞানী লাভোয়াসিয়ে (Lavoisier) বস্তুর পরিমাণের সংরক্ষণতার তত্ত্ব প্রমাণিত করেন। এই তত্ত্ব ও পরীক্ষা-গুলির ওপরে ভিত্তি করে ১৮৪০ সালে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী মায়ার (Mayer) শক্তির সংরক্ষণ ও রূপান্তর তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে পদার্থবিদ্যার জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রচিত হল। সহজ করে বললে

তত্ত্বটির অর্থ হল এই যে, তাপ, আলো প্রভৃতি বস্তুর বিভিন্ন রূপ বস্তুর গতিশীলতার বিভিন্ন গুণগত রূপ মাত্র এবং এই গতিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না ; বস্তু সর্বদাই তার গতিশীলতার মাধ্যমে শক্তির এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছে। এই তত্ত্বটি স্পষ্টই প্রমাণ করল যে, প্রকৃতিজগতে গতি কোন বাহ্যিক কারণে প্রবর্তিত হয় না ; গতিশীলতা বস্তুরই ধর্ম, অর্থাৎ, বস্তুজগৎ ও গতি পরস্পর অভিন্নভাবে যুক্ত।

প্রাণিজগতে জীবকোষের গঠনতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণায় মৌলিক আলোকপাত করেছিলেন জার্মান জীববিজ্ঞানী শ্লাইডেন (Schleiden) ও শ্‌ভান্ (Schwann) ১৮৩৮-৩৯ সালে। এঁদের গবেষণার মাধ্যমে দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হল. প্রথমতঃ, তাঁরা পরীক্ষা করে দেখালেন যে, প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ, উভয়ের বিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে জীবকোষেব পরিবর্তন, অর্থাৎ, সমগ্র বস্তুজগতে জীবকোষের কাজ অভিন্ন। এই তত্ত্বেব তাৎপর্য এখানেই যে, প্রাণ আছে এমন যে কোন বস্তু, তার রূপ যাই হোক না কেন, অন্য প্রাণজ বস্তুর সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। পরোক্ষভাবে বলা যায়, জীবনেব ও জীবজগতের উৎস এক ও অভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, জীবজগতের উদ্ভব, বিকাশ ও লয়প্রাপ্তি পরিচালিত হয় জীবকোষের ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিলুপ্তির মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ, কোন অলৌকিক ঐশ্বরিক শক্তি প্রাণের বিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে না।

চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদতত্ত্ব ছিল এই পর্বের নবতম সংযোজন। অসংখ্য পরীক্ষামূলক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে ডারউইন দেখালেন যে, প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ কোন ঐশ্বরিক সৃষ্টি নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিরন্তর সংঘাতের মধ্য দিয়েই প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও পরবর্তীকালে মানবের উদ্ভব সম্ভবপর হয়েছে ; অর্থাৎ, বস্তুজগতের বিবর্তনের ফলেই যে প্রাণের ও পরবর্তীকালে মানবের উদ্ভব হয়েছে—সেটি যে কোন অলৌকিক, ঐশ্বরিক ইচ্ছাপ্রসূত ঘটনা নয়, এই সত্যটিকে তিনি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ডারউইনের তত্ত্ব জীবজগৎ ও প্রাণিজগৎ সংক্রান্ত বহুকালের পুঞ্জীভূত ঐশ্বরিক ও ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলির অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রমাণ করল।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পটভূমিকা প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। প্রশ্নটি হল, মার্কসীয় দর্শনের উদ্ভবের পিছনে কতকগুলি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক কারণ থাকলেও বৈজ্ঞানিক

সমাজতন্ত্রের দুই প্রতিষ্ঠাতা তাঁদের চিন্তার মাধ্যমে যে বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষা সৃষ্টি করেছিলেন, তার বিশ্লেষণে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পদ্ধতিগত গুরুত্ব সম্পর্কে উভয়ে এক মত পোষণ করতেন কিনা। প্রশ্নটি ওঠার কারণ, আজকের দিনের পশ্চিমী "মার্কস বিশেষজ্ঞ"রা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোচনায় এটিকে একটি বিতর্কিত বিষয়রূপে উপস্থাপিত করেছেন। জি. এ. ভেট্টার (G. A. Wetter), আঁরি লাফাব্র (Henri Lefebvre), আর. এন. ক্যারিউ হান্ট্ (R. N. Carew Hunt) প্রমুখের মতে মার্কসই ছিলেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল প্রবক্তা; পরবর্তীকালে এঙ্গেলস তাঁর Dialectics of Nature ও Anti-Duehring-এ মার্কসের এই চিন্তার তাত্ত্বিক রূপ দিয়েছিলেন মাত্র; অর্থাৎ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মূলতঃ মার্কসের সৃষ্টি ও এঙ্গেলসের ভূমিকা এক্ষেত্রে ছিল প্রায় গৌণ। এই মতবাদের বিরোধী অপর একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী মহল মনে করেন যে, মার্কস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে বিশ্লেষণের পদ্ধতি হিসেবে আদৌ সমর্থন করেননি, এই মতটির সমর্থনে সিড্‌নি হুক্ (Sidney Hook), এল. কোলাকোভ্‌সকি (L. Kolakowski), আই ফেট্‌শার (I. Fetscher), আর. সি. টাকার (R. C. Tucker), জেড. এ. জর্ডান (Z. A. Jordan), জে. ওয়াই কাল্‌ভে (J. Y. Calvez) প্রমুখেরা এই ধারণা পোষণ করেন যে, এঙ্গেলস্ তাঁর একাধিক রচনায় তথাকথিত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের ধারণাটির ব্যাখ্যা করেন ও এঙ্গেলসের চিন্তার আলোকে মার্কসকেও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রবক্তারূপে আখ্যা দেওয়া হয়; এক কথায়, এই বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ধারণাটির গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে মার্কস ও এঙ্গেলসের চিন্তা ছিল পরস্পরবিরোধী।

মার্কসীয় চিন্তার বিকাশের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, এই দুটি মতই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও এক অর্থে অবৈজ্ঞানিক, কারণ এই জাতীয় ধারণা মার্কসবাদকে বোঝার ক্ষেত্রে গুরুতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে: প্রথমতঃ, এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে মার্কস-এঙ্গেলসের সম্পর্ক গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ছিল না। উভয়েই পরস্পরের-প্রতি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। মার্কস ও এঙ্গেলস্ একেবারে প্রায় শুরু থেকেই মোটামুটিভাবে তাঁদের আলোচনার ক্ষেত্রগুলিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন। মার্কস মূলতঃ অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার মাধ্যমে এবং এঙ্গেলস্ মুখ্যতঃ প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত রচনার মধ্য দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী তত্ত্বের বিকাশ ঘটান,

যদিও এক একটি সময়ে উভয়ের গবেষণার বিষয়বস্তু পরিবর্তিতও হয়েছে। তাই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল কৃতিত্ব মার্কসের এবং এঙ্গেলসের ভূমিকা ছিল প্রায় গৌণ—এই জাতীয় ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

দ্বিতীয়তঃ, জন্ হফ্‌ম্যান (John Hoffman), ভ্যালেন্টিনো গের্‌রাটানা (Valentino Gerratana) প্রমুখের গবেষণার আলোকে এখন এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে এতটুকু সংশয় ছিল না। একেবারে গোড়ার দিকে মার্কসের দার্শনিক রচনাগুলির দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে প্রকৃতিজগৎকে বৈজ্ঞানিক, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন এবং তাঁর সমাজ বিশ্লেষণের অন্যতম ভিত্তি ছিল প্রকৃতিজগতের গভীর অনুশীলন; কারণ, প্রকৃতিজগতের স্বরূপ বিশ্লেষণ ছাড়া মানব ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের কোন সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। ১৮৪৩ সালে Rheinische Zeitung পত্রিকায় প্রকাশিত Justification of the Correspondent from Mosel প্রবন্ধে, ১৮৪৪ সালে রচিত Economic and Philosophical Manuscripts-এ প্রকৃতিজগৎকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের চেষ্টা মার্কসের আলোচনায় খুবই স্পষ্ট। পরবর্তীকালে ডারউইনের Origin of Species-এর প্রকাশনাকে মার্কস যে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, এঙ্গেলসের কাছে লেখা ১৮৬০ সালের ১৯ ডিসেম্বরের একটি চিঠি তার স্বাক্ষর বহন করছে। সেই চিঠিতে মার্কস লিখেছিলেন, "এই বইটি আমাদের প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর যথার্থ রূপ দিয়েছে"। অতি সম্প্রতি সোভিয়েত গবেষক ওইজারমান (T. Oizerman) পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, মার্কস তাঁর Poverty of Philosophy, The Holy Family, Theses on Feuerbach প্রভৃতি রচনায় ও এঙ্গেলস একাধিক সামাজিক ও দার্শনিক প্রবন্ধে একদিকে হেগেলের ভাববাদী দর্শন ও অপরদিকে দ্বন্দ্বনিরপেক্ষ বস্তুবাদকে খণ্ডন করে কিভাবে বস্তুবাদী দর্শনকে তার সঠিক দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করেছিলেন।[2] তাই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের

2. এই বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখযোগ্য John Hoffman, *Marxism and The Theory of Praxis*, পৃ: ৪৭ ৫৬ এবং T. I. Oizerman, *The Making of the Marxist Philosophy*, Part I, Chapter 3, Sec. 8; Part 2, Chapter I, Secs I–2, 9.

প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলস ছিলেন পরস্পরবিরোধী বা মার্কস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, এই জাতীয় ব্যাখ্যা কোন দিক থেকেই গ্রহণ-যোগ্য নয়।

॥ ২ ॥

দ্বন্দ্বতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের স্বরূপকে অনুধাবন করতে হলে দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাতের তাৎপর্যটিকে প্রথমে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই দুটি ধারার বিরোধিতা দর্শনের জগতের দুটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রথম প্রশ্নটি তত্ত্ববিদ্যামূলক (ontological) : বস্তু ভাব (চিন্তা)-কে সৃষ্টি করে, না বস্তুজগৎ ভাবজগতের সৃষ্টি ? ভাববাদী দার্শনিকদের মতে ভাবজগৎই বস্তুজগৎকে সৃষ্টি করে ; বস্তুবাদীদের উত্তর এর সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ, বস্তুজগতের অস্তিত্ব ভাব-নিরপেক্ষ। দ্বিতীয় প্রশ্নটি জ্ঞানতত্ত্বমূলক (epistemological) : বস্তুব (reality) স্বরূপ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা কি যুক্তি ও চিন্তার মাধ্যমে সম্ভব ? ভাববাদীদের মতে, মানুষ তার যুক্তিজ্ঞান দিয়ে বস্তু সম্পর্কে প্রকৃত ও সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে পারে না, কারণ মানুষের জ্ঞানের পরিধি সীমিত। পক্ষান্তরে বস্তুবাদীরা মনে করেন, মানুষের যুক্তিজ্ঞানের ক্ষমতা অসীম ও তার প্রয়োগে বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্যের ভিত্তিতে ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা যায়।

ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, এটি ধরে নেওয়া হয় যে বস্তুজগতের উৎপত্তির কারণ বস্তুজগতের বাইরে নিহিত, অর্থাৎ, কোন এক দুর্জ্ঞেয়, অলৌকিক শক্তির ইচ্ছায় বস্তুজগৎ সৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, বস্তুজগৎ ভাবজগতের ঊর্ধ্বে নয়। বস্তুজগৎ যে রূপের মাধ্যমে মানুষের কাছে প্রতিভাত হয়, তা ভাবেরই প্রতিফলন মাত্র। তৃতীয়তঃ, বস্তুজগৎ যেহেতু ভাবজগতের ওপরে নির্ভরশীল, বস্তুজগৎ সম্পর্কে মানুষের বিষয়গত জ্ঞান বা ধারণা সেহেতু কখনই হতে পারে না। ভাববাদী দর্শনের বিরোধী বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীরও কয়েকটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, বস্তুবাদীদের মতে, চিন্তা বা ভাবের জগৎ বস্তুজগতের বিকাশেরই একটি

বিশেষ পর্বে সৃষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বস্তুজগৎ নিরপেক্ষ কোন চিন্তা বা ধারণার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, বস্তুজগতের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে ভাবজগৎ নিরপেক্ষ। বস্তুজগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বস্তুর বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে অগ্রসর হয়। তৃতীয়তঃ, বিজ্ঞান ও যুক্তিজ্ঞানের ওপরে নির্ভর করে বস্তুগৎ সম্পর্কে সঠিক, বিষয়গত জ্ঞানলাভ মানুষের পক্ষে সম্ভব, অর্থাৎ, বস্তুজগতের পরিধি সীমাহীন হলেও তা মানুষের কাছে দুজ্ঞের্য় নয়।

ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের এই মৌলিক পার্থক্যের ভিত্তিতে উভয় দর্শনকেই কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। ভাববাদের মূলতঃ দু'টি রূপ ; (ক) আত্মবাদী ভাববাদ (Subjective Idealism): ব্রিটিশ দার্শনিক বার্কলে (Berkeley) [১৬৮৫-১৭৫৩], ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ভাববাদী বসুবন্ধু প্রমুখেরা এই চিন্তাব উদ্গাতা। এঁদের মতে, বস্তুজগতের অস্তিত্বকে মানুষের বিষয়ীগত ভাবজগৎ নিবপেক্ষভাবে চিন্তা করা যায় না, অর্থাৎ বস্তু-জগৎ মানুষের চিন্তার বিষয়ীগত প্রতিচ্ছবি মাত্র। (খ) বিষয়গামী ভাববাদ (Objective Idealism): এই দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা জার্মান ভাববাদী দার্শনিক হেগেল, ভারতের শংকরাচায প্রমুখেরা। এঁদের মতে বস্তুজগৎ এক অতীন্দ্রিয় সত্তার আত্মবিকাশের প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ, বস্তুজগৎ ব্রহ্ম বা আত্মা (Spirit) জাতীয় কোন এক বিমূর্ত সত্তার বিকাশের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এক্ষেত্রেও মনে করা হয় যে, বস্তুজগৎ ভাবজগতের নিয়ন্ত্রণাধীন ও বস্তুজগতের ভাবজগৎ নিরপেক্ষ কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

বস্তুবাদী দর্শনকে মূলতঃ দু'টি শাখায় ভাগ করা হয়ে থাকে। (ক) প্রাচীন বস্তুবাদী দর্শন: গ্রীক দার্শনিক এ্যানাক্সাগোরাস (Anaxagoras), ডেমোক্রিটাস্ (Democritus), ভারতবর্ষের চার্বাক প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌রা সুদূর অতীতের বস্তুবাদী দার্শনিক চিন্তার প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁদের মতে, সমগ্র বস্তুজগৎ কোন এক মৌল উপাদান থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং তাঁদের অনেকেই মনে করতেন যে বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ একমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমেই সম্ভব। চিন্তাজগৎ যে বস্তুজগতের ক্রমবিকাশের একটি পর্যায়ে সৃষ্টি হয় এবং চিন্তাজগৎ যে বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেই জ্ঞান তাঁদের ছিল না। (খ) যান্ত্রিক বস্তুবাদী দর্শন: প্রকৃতিবিজ্ঞানের অগ্রগতি ও মূলতঃ গতিবিদ্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সপ্তদশ

শতাব্দীতে ব্রিটেনে ও পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকের প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সে এই দর্শনের জন্ম দেয়। এই ধারাটির প্রতিনিধিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইংরেজ বস্তুবাদী দার্শনিক টমাস্ হব্স ও দিদেরো, হলবাখ্, লা মেৎরি, কঁদিলাক্ প্রমুখ ফরাসী দার্শনিকবৃন্দ। এঁদের মতে, ভাবজগৎ প্রকৃতিজগতের নিরন্তর গতিশীলতার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং প্রকৃতিজগতে যেমন ঋতুবদলের মত একাধিক ঘটনা চক্রগতিতে আবহমান কাল থেকে ঘটে আসছে, সমগ্র বস্তুজগৎও তেমনি এই গতির পুনরাবৃত্তি মাত্র, অর্থাৎ, বস্তুজগতের সব ঘটনাই শুধুমাত্র গতি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা চিন্তার অগম্য।

মার্কস-এঙ্গেলস্ যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের জন্ম দিয়েছিলেন, বস্তুবাদী হলেও তা ছিল বস্তুবাদী দর্শনের প্রচলিত ধারাগুলির বিরোধী, কারণ উল্লেখিত ধারাগুলি চিন্তাজগৎ ও বস্তুজগতের পারস্পরিক সম্পর্ককে যান্ত্রিকভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিল। প্রাক্-মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনে ভাবজগৎ ছিল বস্তুজগতের ওপরে চূড়ান্তভাবে নির্ভরশীল ও ভাবজগতের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছিল। বস্তুজগৎ যেমন চিন্তাজগৎকে প্রভাবিত করে, তেমনি মানুষ তার যুক্তি, চিন্তা ও কল্পনার মাধ্যমে বস্তুজগতে যা অবাঞ্ছিত, যা বর্জনীয়, তাকে পরিহার করে নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে বস্তুজগতেরও যে পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম, সেই ধারণা প্রাক্-মার্কসীয় বস্তুবাদীদের ছিল না। ভাবজগৎ যেমন বস্তুজগৎপ্রসূত, তেমনি বস্তুজগতের পরিবর্তন সাধনে চিন্তার যে সক্রিয় ভূমিকা থাকে, যান্ত্রিক বস্তুবাদের প্রতিনিধিদের আলোচনায় তা ছিল প্রায় অবহেলিত। এর ফলস্বরূপ, প্রাক্-মার্কসীয় বস্তুবাদীদের চোখে ভাবজগৎ ও বস্তুজগৎ ছিল সম্পূর্ণ পৃথক দুই সত্তা এবং ভাবজগৎ বস্তুজগতের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় এঁদের দর্শনে বস্তুজগতের পরিবর্তন ঘটানর ক্ষেত্রে চিন্তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল উপেক্ষিত। ফলে বস্তুজগতের গতিশীলতাকে স্বীকার করেও এঁরা মানুষের চিন্তার সক্রিয় ভূমিকাকে অস্বীকার করে যে দর্শন রচনা করলেন, সমাজবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা জন্ম দিল এক অনড় দৃষ্টিভঙ্গীর, এবং দর্শনের চিন্তার ইতিহাসে যেটি অধিবিদ্যার (metaphysics) সঙ্গে সম্পৃক্ত। মার্কস-এঙ্গেলস্ যে দর্শন সৃষ্টি করলেন, তার পদ্ধতিগত ভিত্তি ছিল অধিবিদ্যাবিরোধী দ্বন্দ্বতত্ত্ব। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করতে হলে

শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় ভূমিকা যে অনিবার্য হয়ে পড়ে, সেই ধারণা অধিবিদ্যা-কেন্দ্রিক বস্তুবাদী দর্শন থেকে জন্ম নিতে পারে না। একই সঙ্গে ভাববাদ ও অধিবিদ্যামূলক বস্তুবাদকে খণ্ডন করে ও উভয়ের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে মার্কস-এঙ্গেলস্ বস্তুবাদী দর্শনকে এক সম্পূর্ণ নতুন প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলেন। তাই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুধাবন করতে হলে অধিবিদ্যা ও দ্বন্দ্বতত্ত্বের পার্থক্যগুলিকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

অধিবিদ্যামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মূলতঃ চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমটি হল স্বকীয়তার নীতি (Principle of Identity)। এই মতানুযায়ী যে কোন বস্তুর রূপ এক, অভিন্ন ও অপরিবর্তনীয়। একটি সমাজব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে অপরিবর্তনীয় থাকলে সেই আপাত স্থিতিকেই অধিবিদ্যা চূড়ান্ত বলে মনে করে। এই স্থিতাবস্থা যে একান্তই সাময়িক ও সমাজব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান অন্তর্দ্বন্দ্ব যে সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে সমাজবিপ্লবের প্রক্রিয়ার সূচনা করে ও সমাজবিবর্তনের পথকে ত্বরান্বিত করে স্থিতাবস্থার রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় গতিশীলতার সৃষ্টি করে, অধিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী তাকে স্বীকার করে না। অধিবিদ্যা তাই স্থিতিশীলতাকে রক্ষা করার একটি প্রকৃষ্ট পদ্ধতি।

অধিবিদ্যার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল যে, এই পদ্ধতি অনুযায়ী যে কোন বস্তু বা ধারণা অন্য বস্তু বা ধারণা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র। এটিকে বলা হয়ে থাকে বিচ্ছিন্নতার নীতি (Principle of Isolation)। এই নীতি অনুসারে অধিবিদ্যায় আস্থাশীল ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্কটি প্রতিভাত হয় না। তার ফলে বিভিন্ন ঘটনার বিচ্ছিন্নতাকেই চূড়ান্ত বলে মনে হয়। এই কারণে বস্তুজগৎ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বাস্তববর্জিত হয়ে দাঁড়ায় এবং চিন্তাভাবনাও বিজ্ঞানবিরোধী রূপ নেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে সাহিত্য ও রাজনীতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিষয় বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক; একই দৃষ্টিকোণ থেকে চিরাচরিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় রাষ্ট্রকে সমাজ থেকে পৃথক একটি বিশুদ্ধ রাজনৈতিক সংস্থা বলে মনে করা হয়। কিন্তু সাহিত্য যে রাজনীতি নিরপেক্ষ নয় ও রাজনীতি যে সাহিত্যবহির্ভূত নয়, বা রাষ্ট্র যে সমাজনির্ভর এবং সমাজব্যবস্থা যে রাষ্ট্রব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়, পারস্পরিক এই সম্পর্কের প্রশ্নটি অধিবিদ্যামূলক চিন্তায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় ও তার ফলে অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তববিরোধী হয়ে দাঁড়ায়।

অধিবিদ্যক পদ্ধতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন ঘটনা ও ধারণাকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা। এটিকে বলা হয় চূড়ান্ত বিভাজনের নীতি (Principle of Eternal Division)। বিরোধকে চূড়ান্ত মনে করার অর্থ, বিরোধের যে নিরসন হতে পারে তার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া ও স্থিতাবস্থাটিকেই স্বীকার করে নেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, সমাজে ধনী ও দরিদ্রের বিরোধিতা থেকে উদ্ভূত বৈষম্যকে চূড়ান্ত বলে মনে করার অর্থ হবে এই অসাম্যকে চিরকালীন বলে গ্রহণ করা। তেমনই সমাজে শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বকে শাশ্বত মনে করলে এই বিরোধের নিরসনের উপায় যে এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই নিহিত আছে সেই সম্ভাবনাটিকে, অর্থাৎ বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে, অস্বীকার করা হবে।

অধিবিদ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর চতুর্থ নীতিটি হল আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী ধারণা বা সত্তাকে একসূত্রে গ্রথিত করার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা (Principle of mutual exclusiveness of opposites)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চিরাচরিত উদারনৈতিক ভাবধারা অনুযায়ী একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এই বৈপরীত্যকে চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু মার্কসীয় তত্ত্বে সর্বহারার একনায়কত্বের ধারণাটি একই সঙ্গে রূপের দিক থেকে একনায়কতন্ত্রী হলেও ভাবের দিক থেকে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ বলে স্বীকৃত। অর্থাৎ, অধিবিদ্যক দৃষ্টিতে গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র দুটি স্বতন্ত্র, পরস্পর সম্পর্কশূন্য, বিমূর্ত ধারণা মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতধর্মী ধারণাকেও যে একই সূত্রে গ্রথিত করা যায়, সেই পরিপ্রেক্ষিত অধিবিদ্যা থেকে উৎসারিত হয় না।

অধিবিদ্যাকে নস্যাৎ করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের জন্ম। অধিবিদ্যা যেখানে স্থিতিশীলতার জন্ম দেয়, দ্বন্দ্বতত্ত্ব তার বিরোধিতা করে। তাই সমাজের পরিবর্তনশীলতা, গতিশীলতাকে ব্যাখ্যা করতে হলে দ্বন্দ্বতত্ত্বের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে ওঠে। অধিবিদ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল ভিত্তিটি হল সাবেকী যুক্তিবিদ্যা (formal logic)। সাবেকী যুক্তিতত্ত্বকে সূত্রাকারে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন অ্যারিস্টটল এবং আজও সাবেকী যুক্তিতত্ত্ব বলতে প্রধানতঃ এ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যাকেই বোঝায়। এ্যারিস্টটল বর্ণিত সূত্রগুলি এই রকম : (ক) স্বকীয়তার সূত্র (Principle of identity): 'ক' সর্বদা 'ক'-তেই অবস্থান করে এবং এই অবস্থিতি অপরিবর্তনীয় ; (খ) অ-বিরোধিতার সূত্র

(Principle of non contradiction): 'ক'-এর অবস্থিতি একই সঙ্গে ইতিবাচক ও ইতিবাচকতার বিরোধী, অর্থাৎ নেতিবাচক, হতে পারে না। (গ) মধ্যভাগ অবলুপ্তির নীতি (Principle of excluded middle : 'ক'-এর অবস্থিতি হয় ইতিবাচক নতুবা নেতিবাচক, অর্থাৎ, স্থিতি বা নেতি যে কোন মুহূর্তে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত। স্থিতি ও নেতির মধ্যবর্তী কোন অবস্থানকে সাবেকী যুক্তিবাদ যেহেতু অস্বীকার করে, সেই কারণে এই দুই অবস্থান পরস্পর নিরপেক্ষ ও উভয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভিত্তি হল দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যা (dialectical logic)। দ্বান্দ্বিক যুক্তিতত্ত্ব অনুযায়ী 'ক'-এর অবস্থিতি একই সঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক, কারণ 'ক'-এর অবস্থিতি এক মুহূর্তের জন্যও চূড়ান্তভাবে স্থায়ী নয়। 'ক' যেহেতু চলমান বস্তুজগতেরই অংশ, সেই কারণে 'ক' নিজেও পরিবর্তনশীল। তাই একটি বিশেষ মুহূর্তে 'ক'-এর যে অবস্থিতি, আপাতদৃষ্টিতে স্থিতিশীল মনে হলেও তার পর মুহূর্তেই সেই অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ, 'ক'-এর প্রতি মুহূর্তের অবস্থান তার পূর্বাবস্থার নেতিকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। তাই বাহ্যত: 'ক'-এর অবস্থিতি একটি দীর্ঘ সময় ধরে অপরিবর্তনীয় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে 'ক'-এর অবস্থিতি একই সঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক। অধিবিদ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্যটি এখানেই যে, অধিবিদ্যা সাবেকী যুক্তিতত্ত্বের ওপরে নির্ভর করে এক অপরিবর্তনীয় বিশ্ববীক্ষার জন্ম দেয়; মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব এই পদ্ধতিকে বর্জন করে সৃষ্টি করে পরিবর্তনমুখী, জীবনকেন্দ্রিক, বাস্তবসম্মত এক দর্শন। দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল ভিত্তিটি হল বস্তুজগতের অভ্যন্তরে নিহিত দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে বস্তুজগতের পরিবর্তন সাধিত হয়। এই দ্বন্দ্ব থেকেই জন্ম নেয় গতি, আর গতি সূচনা করে পরিবর্তনের। অধিবিদ্যার জগতে এই অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিক বিরোধের (contradiction) কোন অস্তিত্ব নেই।

যাঁরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিরোধী, তাঁরা প্রকৃতিজগতে, অর্থাৎ বস্তুজগতে দ্বন্দ্বের গুরুত্বকে অস্বীকার করেন। আর্ণষ্ট্ ব্লখ্ (Ernst Bloch), আঁরি লাফাবুর (Henri Lefebvre), সিড্নি হুক্ (Sidney Hook), মের্লো পন্তি (Merleau-Ponty) প্রমুখ পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রয়োগ ও ব্যবহার বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে একমাত্র বিমূর্ত চিন্তা ও ভাবের জগতে সীমাবদ্ধ; সেই সঙ্গে তাঁরা মনে করেন যে, প্রকৃতিজগতে দ্বন্দ্ব-

তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়। এই চিন্তার ভিত্তিতে এঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব চিন্তাজগতে প্রযোজ্য ডায়ালেকটিক্‌সকে যান্ত্রিক ভাবে বস্তুজগতের ওপরে আরোপ করার চেষ্টা করে। এই যুক্তির প্রত্যুত্তরে স্ত্রাক্‌স (Straks), আন্দ্রেইএভ (Andreyev) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, দ্বন্দ্ব-তত্ত্ব বস্তুজগতের মধ্যেই নিহিত ও বস্তুজগৎ দ্বন্দ্বতত্ত্বের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। চিন্তাজগৎ যেহেতু বস্তুজগৎ থেকেই উদ্ভূত হয়, সেহেতু চিন্তাজগৎ ও বস্তুজগৎ উভয় ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্বতত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ সম্ভব। তাই বস্তুজগতে দ্বন্দ্বতত্ত্ব আরোপ করার প্রশ্ন ওঠে না; বরং বস্তুজগৎই চিন্তাজগতে দ্বন্দ্বতত্ত্ব প্রয়োগের উৎসরূপে কাজ করে। এই কারণেই মার্কসীয় চিন্তার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, এঙ্গেলস্‌, যিনি বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের সূত্রগুলিকে সংগঠিত রূপ দেন, দ্বন্দ্বতত্ত্বের আলোচনা করেছেন Dialectics of Nature (১৮৭৩-৮৬) এবং Anti-Duehring (১৮৭৮)-এ বস্তুজগতের পরিপ্রেক্ষিতে। এঙ্গেলসের এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বস্তুজগতের পরিবর্তনকে অনুধাবন করার অদ্বিতীয় পদ্ধতি। হেগেল তাঁর The Science of Logic গ্রন্থে দ্বন্দ্বতত্ত্বের যে ভাববাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করে-ছিলেন, তাকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে এবং সমসাময়িক বিভিন্ন ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও মতাদর্শগত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এঙ্গেলস্‌ বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের তিনটি প্রধান সূত্রকে লিপিবদ্ধ করেন, যেগুলি অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিরোধী।

॥ ৩ ॥

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল সূত্রাবলী

এঙ্গেলস্‌ বর্ণিত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সূত্রগুলিকে তিনটি ধারায় ভাগ করা হয়ে থাকে।

প্রথম সূত্র : পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তর (Transformation of Quantity into Quality)। পরিবর্তনশীল বস্তুজগতে বস্তুর মধ্যে নিহিত গতিশীলতা সর্বদাই বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। পদার্থবিদ্যার গবেষণার মাধ্যমে মানুষ আজ যে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন পদার্থ আবিষ্কার করতে পারছে তা সম্ভব হচ্ছে

বস্তুজগতে পদার্থের পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ও তার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, পরমাণুর জগতে যে কোন পদার্থের প্রোটনের (Proton) পরিমাণের পরিবর্তন ঘটিয়ে সেই পদার্থের নিউক্লিয়াসের গঠনের পরিবর্তন সাধন করে গুণগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থকে সৃষ্টি করা আজ সম্ভব। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে নেপচুনিয়াম (Neptunium)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। একইভাবে উদ্ভাবিত হয়েছে সর্বাধিক ভারী মৌল বস্তু প্লুটোনিয়াম (Plutonium)।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, বস্তুজগতে পরিমাণগত পরিবর্তন হয় ধীরে ধীরে, ক্রমান্বয়ে। কিন্তু পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয় আচমকা এক উল্লম্ফনের (leap) মাধ্যমে। পরমাণুর পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সহসা যে বিপুল পারমাণবিক শক্তির সৃষ্টি করে, তা সম্ভব হয় পরমাণুব বিভাজন প্রক্রিয়ায় আকস্মিক এই উল্লম্ফনের ফলে। সমাজ বিবর্তনেব ইতিহাসও একই কথা বলে। একটি সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষ সমাজব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ গতিশীলতা ও দ্বন্দ্বের ফলে পুঞ্জীভূত হতে থাকে ও এক সময়ে সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে ঘটে যায় আকস্মিক এক বিস্ফোরণ, যা সূচিত করে সমাজব্যবস্থায় এক গুণগত পরিবর্তন। এক কথায়, গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয় পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়াতে আকস্মিক এক বিঘ্ন ঘটিয়ে; অর্থাৎ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন বস্তু বা ঘটনার ক্রমবিকাশ হয় (ক) ক্রমাগত পরিমাণগত পরিবর্তন + (খ) পরিমাণগত পরিবর্তনে আকস্মিক ছেদ ঘটিয়ে গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে।

যে উল্লম্ফন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তন সূচিত করে, তাকে দ্বান্দ্বিক উল্লম্ফন (dialectical leap) আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই উল্লম্ফনকে মোটামুটি চারটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(ক) উল্লম্ফনের সারবস্তু (Content of the Leap): সারবস্তুর দিক থেকে বিচার করলে উল্লম্ফন দুই ধরনের হতে পারে। এক, গুণগত পরি-বর্তনের ফলে একটি বস্তুর নেতিকরণ হয়ে সম্পূর্ণ নতুন কোন বস্তুর সৃষ্টি হতে পারে। ইতিহাসে সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ বা ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ এইভাবে ঘটেছে। দুই, অনেক ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয় বস্তুর মৌলিক অবস্থাকে অক্ষুন্ন রেখে তার অভ্যন্তরে

রূপান্তর ঘটিয়ে। যেমন, ইতিহাসের এক দীর্ঘ সময় ধরে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অটুট থাকলেও তার অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। বাণিজ্য পুঁজির শিল্প পুঁজিতে রূপান্তর বা একচেটিয়া পুঁজির আবির্ভাবের ফলে সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় এই জাতীয় উল্লম্ফনের পরিণতি।

(খ) উল্লম্ফনের মাত্রা (Scale of the Leap) : ইতিহাসের এক একটি পর্বে দেখা যায় যে, গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে একটি দীর্ঘস্থায়ী উল্লম্ফনপর্বে একাধিক উল্লম্ফনের মাধ্যমে। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা দেখিয়েছেন যে আদিমযুগের বানরজাতীয় স্তর থেকে আধুনিক মানবের স্তরে মানুষের উত্তরণ অনেকগুলি স্তরের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে ; এই স্তরগুলি এক একটি ক্ষুদ্র উল্লম্ফনপর্ব, যেগুলি সামগ্রিকভাবে বানরের স্তর থেকে মানুষের স্তরে উল্লম্ফনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত। আবার ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর একের পর এক দেশে যে বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধিত হয়েছে, সেগুলির আকস্মিকতা ও গতির মাত্রা বিচার করলে এই ঘটনাগুলিকে বড় ধরনের উল্লম্ফন বলা যেতে পারে।

(গ) উল্লম্ফনের আঙ্গিক (Form of the Leap) : গুণগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লম্ফনের আঙ্গিক সব ক্ষেত্রে এক নাও হতে পারে। পৃথিবীর সব দেশেই সমাজতান্ত্রিক বা সমাজতন্ত্রমুখী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে আকস্মিক কোন এক উল্লম্ফনের মাধ্যমে। কিন্তু এই উল্লম্ফন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের রূপ নিয়েছে। রুশদেশে বা চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে ধরনের উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে (সশস্ত্র সংগ্রাম, গৃহযুদ্ধ) পূর্ব ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে ভিন্ন ধরনের উল্লম্ফনের মাধ্যমে।

(ঘ) উল্লম্ফনের গতি (Speed of the Leap) : গুণগত পরিবর্তন কখনও শ্লথগতিতে অগ্রসর হয়, আবার কখনও বা তা সম্পন্ন হয় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, মূলতঃ সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে যখন সমাজের মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়, তখন তা ঘটে আকস্মিকভাবে, অত্যন্ত দ্রুত উল্লম্ফনের মাধ্যমে। সেই তুলনায় একটি প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তনগুলি ঘটে অপেক্ষাকৃত শ্লথগতিতে।

দ্বিতীয় সূত্র : বৈপরীত্যের মিলন ও সংগ্রাম (Unity and Struggle of Opposites)। গতিশীল বস্তুজগতে যেহেতু কোন কিছুই স্থায়ী নয়,

সেহেতু প্রশ্ন ওঠে, এই গতিশীলতার উৎসটি কি ? প্রাক্-মার্কসীয় দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, অতীতের ভাববাদী ও বস্তুবাদী দার্শনিকরা এই প্রশ্নের সঠিক, বৈজ্ঞানিক উত্তরটি দিতে সক্ষম হননি। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে উপনিষদ্ ব্রহ্মকে দৃশ্যমান জগতের চালিকাশক্তিরূপে বর্ণনা করেছে ; গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের মতে, এই চালিকাশক্তি হলেন ঈশ্বর, যাকে কেউ চালনা করে না ; হেগেলের মতে প্রকৃতিজগৎ এক স্বয়ম্ভূ আত্মার (Spirit) গতিশীলতার বহিঃপ্রকাশ। প্রাচীন গ্রীসের বস্তুবাদী দার্শনিকরাও বিশেষ বিশেষ এক একটি বস্তুকে প্রকৃতিজগতের মূল চালিকাশক্তি বা উপাদান বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ্যানাক্সিমেনেসের (Anaximenes) মতে এই উপাদান হল বায়ু ; হেরাক্লিটাসের ধারণা ছিল যে বস্তুজগতের চালিকাশক্তি হল আগুন। প্রাচীন চীনের বস্তুবাদী দার্শনিকদের ধারণা ছিল যে, চলমান বস্তুজগতের সব কিছুই আগুন, জল, কাঠ, মাটি ও ধাতুর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুবাদী ও ভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে তফাৎ থাকলেও উভয়ের দৃষ্টিতেই বস্তুজগতের গতিশীলতার কারণরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে কোন অপরিবর্তনীয় সত্তা বা মৌলবস্তুকে।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বস্তুর পরিবর্তনশীলতার উৎসকে বস্তুর মধ্যেই নিহিত বলে মনে করে। যেহেতু যে কোন বস্তুই বিপরীত গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়, এই বিপরীত উপাদানগুলির দ্বন্দ্ব (contradiction) বস্তুর পরিবর্তনের দিক নির্দেশ সূচিত করে। উদাহরণস্বরূপ, দ্বান্দ্বিক যুক্তিতত্ত্বে যখন বলা হয় যে, একটি বস্তুর অস্তিত্ব একই সঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক, তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বস্তুর ইতিবাচক অস্তিত্বের মধ্যেই তার নেতিবাচক অস্তিত্বের উৎসও নিহিত আছে ; অর্থাৎ, বস্তুটি একটি মুহূর্তে স্থিতিশীল মনে হলেও, পরমুহূর্তেই তার বিপরীত শক্তি তার পূর্বমুহূর্তের নেতিকরণ ঘটিয়ে বস্তুটিকে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় একটি নতুন সত্তা দান করে। দ্বান্দ্বিক বিরোধিতার (dialectical contradiction) মাধ্যমে বস্তুর রূপান্তরতত্ত্ব থেকে দু'টি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এক, যে কোন ঘটনা বা বস্তু বিপরীত শক্তির সমন্বয় এবং সেই সমন্বয় বস্তুটিকে বা ঘটনাটিকে আপেক্ষিক স্থায়িত্ব দেয় মাত্র ; দুই, বস্তু বা ঘটনাটির অভ্যন্তরে বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব এই আপেক্ষিক স্থায়িত্বকে ধ্বংস করে বস্তুটির রূপান্তর ঘটায়, অর্থাৎ, দ্বান্দ্বিক বিরোধিতাই চূড়ান্ত এবং বস্তু বা ঘটনার রূপান্তরে এই দ্বন্দ্বই মূল চালিকাশক্তিরূপে কাজ করে। লেনিন এই প্রসঙ্গে

লিখেছেন, "বৈপরীত্যের সমন্বয় শর্তসাপেক্ষ, সাময়িক পরিবর্তনশীল, আপেক্ষিক। সম্পূর্ণভাবে পৃথক দুই বিপরীতের দ্বন্দ্বই হল চূড়ান্ত..."[৩]

এই বক্তব্যের বিরোধী পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীরা প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ, হেলমুট্ ওগিয়ারমানের (Helmut Ogiermann) মত ক্যাথলিক দার্শনিক মনে করেন যে, প্রকৃতিজগতের বিভিন্ন পরিবর্তনকে বস্তুর অন্তর্দ্বন্দ্ব বা স্ববিরোধিতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁর মতে, বস্তুজগতের পরিবর্তন সূচিত করে রহস্যময়, দুর্জ্ঞেয় কোন এক শক্তি। দ্বিতীয়তঃ, গুষ্টাভ্ ভেট্টার (Gustav Wetter), মেরলো পন্তি (Merleau-Ponty), কালভে (Calvez) প্রমুখেরা নিজেদের মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করে বস্তুজগতের পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বাস্তব ভিত্তিকে অস্বীকার করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁরা পুঁজিবাদী সমাজের মূল চালিকাশক্তি যে শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব, এই সত্যকে গ্রহণ করতে অপারগ। তৃতীয়তঃ, হাইডেগারের (Heidegger) মত দার্শনিকরা এক ধরনের "ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বতত্ত্বে" বিশ্বাসী। এঁদের মতে, সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব বা সমাজজীবনের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব যেহেতু চিরকালীন ও অপরিবর্তনীয়, সেহেতু দ্বন্দ্ব কখনও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের উৎস হতে পারে না।

বৈপরীত্যের মিলন ও সংগ্রামের প্রক্রিয়াটিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার অক্ষমতা থেকেই উপরোক্ত মতামতগুলির সৃষ্টি হয়েছে। গতিশীল বস্তুজগতে দ্বন্দ্বতত্ত্বের দ্বিতীয় সূত্রটির উপস্থিতিকে দু'টি স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা প্রয়োজন। প্রথম স্তরে দ্বন্দ্বগুলি ধীরে ধীরে উৎসারিত হয়ে বস্তুর পরিবর্তনের পূর্বাভাষ সূচিত করে। এই পর্বে বিপরীত শক্তিগুলির সমন্বয় অটুট থাকে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই সমন্বয় হ্রাস পেয়ে বিরোধিতা তীব্র হয়ে ওঠে ও এই স্থিতাবস্থা ভেঙ্গে পড়ার মুখে এসে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পুঁজিবাদের আদিপর্বে শ্রম ও পুঁজির যে সমন্বয় বহাল ছিল, উভয়ের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাঙ্গন দেখা দেয়। বৈপরীত্যের এই দ্বন্দ্ব দ্বিতীয় স্তরটির জন্ম দেয় যখন এই দ্বন্দ্বের নিরসন হয়ে বস্তুর বা ঘটনাটির মৌলিক রূপান্তর সাধিত হয়। যে কোন সমাজব্যবস্থার

3. V. I. Lenin, 'On the Question of Dialectics', *Collected Works*, Vol. 38 (Philosophical Notebooks), পৃ: ৩৬০।

অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি, সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে এই বিরোধের নিরসন ও নতুন সমাজের জন্ম—এ সবই এই সূত্রটির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক কথায়, সামগ্রিক স্থিতি ও সমন্বয়, দ্বান্দ্বিক সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি ও তার নিষ্পত্তি এবং পুনরায় সমন্বয় ও সংগ্রামের প্রক্রিয়ার শুরু—এভাবেই বস্তুজগতের পরিবর্তন দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর রুশ বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী আলেক্জাণ্ডার হেরজেন (Alexander Herzen) যথার্থই বলেছিলেন যে দ্বন্দ্বতত্ত্ব হল বিপ্লবের বীজগণিত।

দ্বন্দ্বের রূপ মূলতঃ দুই ধরনের : বৈর (antagonistic) ও অবৈর (non-antagonistic)। দ্বন্দ্বের এই রূপ বৈপরীত্যের বিরোধ নিরসনের পদ্ধতিকে নির্ধারণ করে দেয়। বৈর দ্বন্দ্ব সমাজে অবস্থিত পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলির সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত হয়। যেমন, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুঁজিপতি ও শ্রমিকের বিরোধ সৃষ্টি করে বৈর দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন হয় পুঁজিবাদকে বিপ্লবের মাধ্যমে উচ্ছেদ করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান, তার রূপ অবৈর, কারণ সেখানে শোষক ও শোষিতের বৈর সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে শোষিতশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার্থে সমাজব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সেই সমাজে শ্রমিক ও কৃষকের দ্বন্দ্ব বা শহর ও গ্রামের মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক যেহেতু শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক নয়, সেহেতু তা বৈর নয়, অবৈর এবং এই অবৈর দ্বন্দ্বের উত্থান ও নিরসনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র অগ্রসর হয়। স্বভাবতই যেহেতু এই দ্বন্দ্বের চরিত্র অবৈর, সেহেতু তা নিরসনের পদ্ধতিও বৈর দ্বন্দ্ব নিরসনের পদ্ধতির সমগোত্রীয় হবে না। এই প্রসঙ্গে লেনিন বুখারিনের Economics of the Transition Period গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছিলেন তা উল্লেখযোগ্য। বুখারিন দ্বন্দ্ব ও বৈর সম্পর্ককে এক করে দেখেছিলেন, অর্থাৎ তাঁর চোখে দ্বন্দ্ব ও বৈর সম্পর্ক ছিল সমার্থক। লেনিন দেখালেন যে দ্বন্দ্ব বৈর ও অবৈর দুইই হতে পারে, কারণ দ্বন্দ্ব ও বৈর সম্পর্ক একগোত্রীয় নয়।

দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজবিপ্লবের প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করতে হলে আরও দু'টি দিক থেকে দ্বন্দ্বকে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমতঃ, অন্তর্দ্বন্দ্ব (internal contradiction) ও বহির্দ্বন্দ্বের (external contradiction) তাৎপর্যটি বিচার করা প্রয়োজন। একটি ব্যবস্থা, ঘটনা বা বস্তুর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে বলা হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বিভিন্ন ঘটনা, বস্তু বা ব্যবস্থার পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে

বহির্দ্বন্দ্ব আখ্যা দেওয়া হয়। যে কোন দেশে বিপ্লবী পরিবর্তন সাধন করার জন্য এই দুই দ্বন্দ্বের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সদ্যস্বাধীন যে সব দেশ ধনতন্ত্রের পথ গ্রহণ করেছে (যেমন, ভারত), সেখানে একাধারে দেশের অভ্যন্তরে শ্রম ও পুঁজির বৈর দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ; অপরদিকে দেশীয় পুঁজির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বহির্দ্বন্দ্বও রয়েছে। এই সব দেশে বিপ্লবের প্রশ্নের আলোচনায় দেশীয় পুঁজিপতিদের এই দুই দ্বান্দ্বিক অবস্থানকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কোন কোন সময়ে বহির্দ্বন্দ্ব অন্তর্দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে বড় হয়ে দেখা দেয়, আবার কখনও বা অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠার ফলে বহির্দ্বন্দ্ব হ্রাস পায়। তাই দেখা যায়, এই সব দেশের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী লেনিনের ভাষায় দ্বৈত চরিত্র সমন্বিত। এই শ্রেণী একই সঙ্গে সীমিত অর্থে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে ও শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থকে খর্ব করে পুঁজিবাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বন্দ্ব মুখ্য (Principal) ও গৌণ (Secondary) দুই-ই হতে পারে। যে কোন দেশে বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও রণকৌশল নির্ধারণে দ্বন্দ্বের এই দুই দিক ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে মনে রাখা দরকার। মুখ্য দ্বন্দ্ব বলতে বোঝায় কোন বস্তু বা ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে। যেমন, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রমিক ও পুঁজিপতির স্বার্থের দ্বন্দ্ব হল মুখ্য, কারণ এই দ্বন্দ্বই পুঁজিবাদী সমাজের ভিত্তি এবং এই দ্বন্দ্বের নিরসন ছাড়া পুঁজিবাদের উচ্ছেদ সম্ভব নয়। তেমনি, পুঁজিবাদী সমাজে বড় ও ছোট পুঁজিপতির বা শিল্প পুঁজি ও কৃষি পুঁজির দ্বন্দ্বকেও অবহেলা করা যায় না, কারণ বিপ্লবের বিশেষ কোন স্তরে শোষক শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ এই দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদী সমাজের মুখ্য দ্বন্দ্ব নয় ; তাই এই দ্বন্দ্ব গৌণ। বিভিন্ন অবস্থায় মুখ্য ও গৌণ এই উভয় দ্বন্দ্বের সম্পর্ককে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার ওপরে অনেকাংশে নির্ভর করে সে দেশের বিপ্লবের সাফল্য।

তৃতীয় সূত্র : নেতির নেতিকরণ (Negation of the Negation)। বস্তুর পরিবর্তনের অর্থ হল তার প্রথম অবস্থার নেতিকরণ এবং তার পরিবর্তে নতুন এক বস্তুর উদ্ভব, অর্থাৎ, বস্তুর পূর্বাবস্থার নেতিকরণ ছাড়া তার রূপান্তর ঘটা সম্ভব নয়। এই নেতিকরণের প্রক্রিয়াকে প্রাক্‌-মার্কসীয় দার্শনিক

চিন্তায় অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। প্রথমতঃ, অধিবিদ্যার দৃষ্টিতে একটি বস্তুর যখন নেতিকরণ হয়, তখন সেই নেতিকরণের উৎস নিহিত থাকে বস্তুর বহির্জগতে, বস্তুর অভ্যন্তরে নয়। বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিচারে বস্তুর অন্তর্দ্বন্দ্বই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার নেতিকরণের শর্ত সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, অধিবিদ্যার দৃষ্টিতে নেতিকরণের অর্থ হল একটি বস্তুর সম্পূর্ণ বিলোপসাধন। মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব নেতিকরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একই সঙ্গে বস্তুর স্থিতাবস্থার বিলোপসাধন ও নতুন অবস্থার উদ্ভবের প্রশ্নটিকে বিচার করে।

অধিবিদ্যামূলক নেতিকরণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক দ্বান্দ্বিক নেতিকরণের দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, এই প্রক্রিয়ায় বস্তুর পুরাতন অবস্থার নেতিকরণ ঘটিয়ে নতুন সৃষ্টির পূর্বশর্ত প্রস্তুত করা হয়, যে সৃষ্টি বস্তুর প্রাক্তন অবস্থার তুলনায় গুণগতভাবে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ স্তরের। দ্বিতীয়তঃ, নিছক নেতিকরণের স্বার্থেই বস্তুর একটি অবস্থাকে অস্বীকার করা হয় না। এর তাৎপর্য এখানেই যে, পুরাতন ব্যবস্থার যা কিছু গ্রহণীয়, রক্ষণীয় ও শ্রেষ্ঠ, তার সব কিছুকেই বহন ও গ্রহণ করে নতুন সৃষ্টির সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করা হয়। এক কথায়, দ্বান্দ্বিক নেতিকরণ (dialectical negation) বলতে কোন বস্তু বা ব্যবস্থার নিছক ধ্বংস বা অবলুপ্তি বোঝায় না। নেতিকরণের মাধ্যমে বস্তুর পুরনো রূপ পরিবর্তিত হয়ে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পুঁজিবাদের নেতিকরণের চূড়ান্ত রূপ, কিন্তু একই সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প ও বিজ্ঞানের জগতে যে অবদান-গুলি রেখে গেছে, সেগুলিকে গ্রহণ ও স্বীকার করে সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রকে বর্জন করে এক বিকল্প ব্যবস্থার জন্ম দেয়, যা পুঁজিবাদের তুলনায় অনেক গুণে শ্রেষ্ঠতর। নেতির নেতিকরণ যেহেতু একটি অবিরাম প্রক্রিয়া, সেহেতু এটিকে সাধারণতঃ একটি ঘূর্ণায়মান রেখার (Spiral) সঙ্গে তুলনা করা হয়। ঘূর্ণায়মান রেখার মত নেতির নেতিকরণের প্রক্রিয়াও ক্রমাগত এক একটি স্তরকে অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ স্তরের দিকে অগ্রসর হয়। হেগেলের ভাষায় বলা যায়, প্রথম যে ঘটনার নেতি হয় সেটি বাদ (Thesis); যে ঘটনা নেতিকরণ ঘটায়, সেটি প্রতিবাদ (Antithesis) এবং নেতির নেতিকরণ সাধিত হয় সম্বাদের (Synthesis) মাধ্যমে। তাই দ্বন্দ্বতত্ত্বে 'সম্বাদ' একই সঙ্গে নেতিবাচক ও ইতিবাচক অর্থ বহন করে। 'সম্বাদ' বলতে পুরাতন

অবস্থার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সংরক্ষণ ও একই সঙ্গে তার সেই অবস্থার রূপান্তর এই দুই প্রক্রিয়াকেই বোঝায় এবং এই কারণেই দ্বান্দ্বিক নেতিকরণের ধারণা অধিবিদ্যক নেতিকরণের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

দ্বান্দ্বিক নেতিকরণের প্রক্রিয়া প্রধানত: কয়েকটি রূপের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমতঃ, সংরক্ষণ (Sublation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে ব্যবস্থার নেতিকরণ ঘটে, তার শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে নতুন সৃষ্টির সঙ্গে সেগুলিকে সংযুক্ত করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই লেনিন প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, অতীতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির জগতে বুর্জোয়াশ্রেণীর মহত্তম যে অবদান, তাকে গ্রহণ করে ও তার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েই শ্রমিকশ্রেণী তার নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব শিল্প সৃষ্টি করতে পারে। নেতিকরণের দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় রূপান্তরকরণ (transformation), অর্থাৎ, মৌল বস্তুটি বা মূল ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রেখে তার অন্যান্য দিকের পরিবর্তন ঘটান হয়। যেমন, একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভবের ফলে সাম্রাজ্যবাদের যখন জন্ম হয়, তখন পুঁজিবাদের মূল কাঠামোটি অটুট রেখে সমাজব্যবস্থায় পুঁজিবৃদ্ধির পূর্বের পদ্ধতির নেতিকরণ ঘটিয়ে নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তেমনিভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সাম্যবাদে রূপান্তরের ক্ষেত্রেও শোষণহীন সমাজব্যবস্থার মূল চরিত্রটিকে অক্ষুন্ন রেখে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের পূর্বাবস্থার নেতিকরণ ঘটান হয়।

বস্তুজগতে পরিবর্তনের প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে নেতির নেতিকরণের সূত্রটি তাই বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। কিন্তু এক সময়ে খোদ মার্কসবাদী মহলেই এই সূত্রটি অন্য দুটি সূত্রের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে অবহেলিত হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে স্তালিনের Dialectical and Historical Materialism প্রকাশিত হবার পর দেখা গেল যে স্তালিনের আলোচনায় এই সূত্রটি প্রায় উপেক্ষিত। ফলে এই পর্বের বিভিন্ন রচনায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তৃতীয় সূত্রটির প্রয়োগ ছিল প্রায় অবহেলিত। পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালে সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানী আলেকজান্দ্রভ (Alexandrov) রচিত Dialectical Materialism গ্রন্থের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এ্যাকাডেমিশিয়ান কেদরভ (Kedrov) এই সূত্রটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করেন। কেদরভ খোলাখুলিভাবেই মন্তব্য করেন যে ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত বিজ্ঞান ও দর্শনের গবেষণার ক্ষেত্রে একাধিক ত্রুটির অন্যতম

কারণ ছিল এই যে, লেনিন যেটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সেই তৃতীয় সূত্রটিকে এই পর্বে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষা করা হয়েছিল।[4]

॥ ৪ ॥

মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল সূত্রগুলির ওপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব। জ্ঞানতত্ত্ব যে প্রশ্নটি উত্থাপন করে সেটি হল এই যে, মানুষের চেতনায় কি বস্তুজগতের সঠিক প্রতিফলন সম্ভব? অর্থাৎ, মানুষ কি সচেতনভাবে বস্তুজগতের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম? এবং মানুষ যদি এই জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়, তবে সে জ্ঞানও কি সম্পূর্ণ না আংশিক? দর্শনের জগতে এই জ্ঞানতত্ত্ব বা Epistemology (গ্রীক episteme থেকে গ্রহণ করা হয়েছে) নামে পরিচিত। সুদূর অতীতে, প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকরা এই প্রশ্নের দুটি পরস্পরবিরোধী উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ডেমোক্রিটাস্ (Democritus), এপিকিউরাস্ (Epicurus) প্রমুখেরা মনে করতেন যে, বস্তুজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানোপলব্ধি সম্ভব ও সেই জ্ঞান বস্তুজগৎ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে ক্র্যাটিলাসের (Cratylus) মত দার্শনিকের ধারণা ছিল যে, বস্তু যেহেতু দ্রুত পরিবর্তিত হয়, এই পরিবর্তনশীলতাই বস্তুজগৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্রাক্-মার্কসীয় দার্শনিক চিন্তায় এই প্রশ্নটির ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দেবার চেষ্টা হয়েছে। এগুলিকে প্রধানতঃ চারটি ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে।

(ক) **অজ্ঞাবাদ** (Agnosticism)ঃ গ্রীক শব্দ Agnostes (অর্থাৎ, অজানা, অজ্ঞেয়) থেকে উৎসারিত এই দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬)। হিউমের মত অনুযায়ী জ্ঞান সংবেদন (sensation) নির্ভর। তাঁর ধারণানুযায়ী মানবমন সংবেদনের মাধ্যমে বস্তুজগৎ সম্পর্কে যে ধারণায় উপনীত হতে

4. এই আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Guy Planty Bonjour, *The Categories of Dialectical Materialism. Contemporary Soviet Ontology*, পৃঃ ১২৯-১৩১।

পারে, মানুষের জ্ঞানের পরিধি তার বাইরে বিস্তৃত হতে পারে না, অর্থাৎ, সংবেদন বহির্ভূত কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব কিনা, সে প্রশ্ন হিউমের কছে মূল্যহীন। হিউমের এই তত্ত্ব আপাতদৃষ্টিতে বস্তুবাদী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এই চিন্তা ছিল সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। জ্ঞান সংবেদননির্ভর মাত্র,—এই বক্তব্য অষ্টাদশ শতকেব দার্শনিক মহলে সাড়া জাগাতে পেরেছিল ঠিকই, কারণ এই বক্তব্যের অর্থ হল অলৌকিক কোন ধারণাকে জ্ঞানেব উৎসরূপে অস্বীকাব করা। হিউমেব এই তত্ত্ব তাই ধর্মীয় আদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বস্তুবাদীদেব সাহায্য কবেছিল। কিন্তু দু'টি কাবণে হিউমের তত্ত্বেব অবৈজ্ঞানিক চবিত্রটি অচিরেই প্রকাশ পেল। প্রথমতঃ, সংবেদনকে জ্ঞানেব উৎস রূপে চিহ্নিত কবে তিনি কার্যতঃ সংবেদন নিরপেক্ষ বস্তুজগতেব অস্তিত্বকে অস্বীকার কবেছিলেন ; অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে বস্তুবাদী মনে হলেও, বস্তুজগৎ সম্পর্কিত জ্ঞানকে যখন বিষয়ীগত সংবেদনের ওপবে নির্ভরশীল মনে কবা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তা ভাববাদী চিন্তায় পর্যবসিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞান যদি একান্তভাবেই সংবেদননির্ভর হয়, তাব অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বস্তুজগৎ সম্পর্কে কোন বিষয়গত ধারণা বা জ্ঞান লাভ কবা সম্ভবপর নয়।

(খ) **যুক্তিবাদ** (Rationalism) : হিউম যেমন সংবেদনকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলে মনে করেছিলেন, যুক্তিবাদীরা তেমনি মানুষের যুক্তিকেই জ্ঞানেব একমাত্র উৎস বলে স্বীকার করেন। এঁদের মতে বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান একান্তভাবে যুক্তিনির্ভব ; যুক্তিনির্ভর চিন্তাই মানুষকে জ্ঞানের সীমানায় পৌঁছে দেয়। এই চিন্তার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত (Descartes) [১৫০৬-১৬৫০]। তিনি নিজে ছিলেন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ এবং বিশ্লেষণধর্মী জ্যামিতিব (Analytic Geometry) প্রতিষ্ঠাতা। ইউক্লিডিয়াম্ জ্যামিতি যেমন কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধকে ভিত্তি করে যুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিপাদ্যকে গড়ে তোলে, দেকার্তও সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, যুক্তির একনিষ্ঠ প্রয়োগের ফলে মানুষ বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্যামিতিক নিয়মে জ্ঞানলাভ করতে পারে। পরবর্তীকালে উনবিংশ শতকে রীমান্ (Riemann), বলিয়াই (Bolyai), লোবাচেভ্‌সকি (Lobachevsky) প্রমুখ গণিতবিদের গবেষণার মাধ্যমে যখন অ-ইউক্লিডিয় জ্যামিতি (Non-Eucledan Geometry) প্রতিষ্ঠিত হল, তখন দেখা গেল যে, এই নতুন জ্যামিতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করলে ইউক্লিডের অনেক স্বতঃসিদ্ধই

বাতিল হয়ে যায়। গণিতবিজ্ঞানে নতুন নতুন সংযোজনের ফলে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হল যে, বিশুদ্ধ যুক্তির প্রয়োগ করে বস্তুজগৎ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয় না,—যেমন বস্তুজগতের জটিলতাকে বোঝার পক্ষে ইউক্লিডিয় জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট ত নয়ই, ভুলও বটে।

(গ) **চিরায়ত ভাববাদী দর্শন** (Classical Idealist Philosophy) : ভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন কাণ্ট্ ও হেগেল। কাণ্ট্ দেখালেন যে, যুক্তিনির্ভর জ্ঞান যে কোন বস্তুর প্রতিভাসের (appearance) মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ আমাদের যুক্তিজ্ঞানের অগোচর, কারণ সেটি এক অতীন্দ্রিয় সত্তা, যাকে কাণ্ট্ বলেছেন স্ববস্তু (noumenon বা essence বা thing-in-itself)। এই স্ববস্তুকে একমাত্র কতকগুলি গভীর নৈতিক, নান্দনিক মূল্যবোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে উপলব্ধি করা যেতে পারে। তাই কাণ্টের বক্তব্য অনুযায়ী, বস্তুর অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে যুক্তির ক্ষমতা সীমিত ও জ্ঞানলাভও তাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। হেগেল কাণ্টীয় ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে, প্রতিভাস ও স্ববস্তুর বিরোধিতাকে নস্যাৎ করে জ্ঞানতত্ত্বে এক নতুন সংযোজন করলেন। তিনি দেখালেন যে, জগতে কোন কিছুই দুর্জ্ঞেয় নয়, কারণ বস্তুজগৎ ও ভাবজগৎ উভয়েই এক অতীন্দ্রিয় 'আত্মা'র (Spirit) দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় আত্মপ্রকাশের ফলশ্রুতি ও সে কারণেই এই 'আত্মা' তার পরম যুক্তিজ্ঞানের প্রয়োগে জগতের সবকিছু সম্পর্কেই জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম। যদিও হেগেলের জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞানলাভকে 'আত্মা'র অসীম সৃষ্টিশীল ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাহলেও কোন-কিছুই যে যুক্তিজ্ঞানের সীমানার ঊর্ধ্বে নয়, এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত।

(ঘ) **অধিবিদ্যাগত বস্তুবাদ** (Metaphysical Materialism) : সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বিজ্ঞানের জগতে গতিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির ফলে অধিবিদ্যাগত বস্তুবাদ জন্মলাভ করে। প্রাক্-মার্কসীয় দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে এই তত্ত্ব ছিল নিঃসন্দেহে বস্তুবাদী ও এক অর্থে যথার্থই প্রগতিশীল। কিন্তু এই দর্শনের অন্যতম ত্রুটি ছিল এই যে, মানুষের চেতনায় বস্তুজগতের যান্ত্রিক প্রতিফলনকে জ্ঞানলাভ বলে গণ্য করা হয়েছিল। ফলে এঁদের কাছে জ্ঞানলাভ ছিল একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া মাত্র, যেখানে বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান-অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির চিন্তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল অস্বীকৃত।

মার্কস-এঙ্গেলস উপরোক্ত মতবাদগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের সৃষ্টি করেন। প্রাক্-মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বে যেখানে বিষয়ীগত সংবেদন অথবা বিষয়গত বস্তুজগৎকেই জ্ঞানের একমাত্র ও চূড়ান্ত উৎস্বরূপে গণ্য করা হয়েছিল, মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞানোপলব্ধির প্রক্রিয়ায় বস্তুজগতের অস্তিত্বকে জ্ঞানের প্রাথমিক উৎসরূপে স্বীকার করে ব্যক্তির চিন্তা ও সচেতন কর্ম-প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে স্বীকার করা হয়। এক কথায়, জ্ঞান-লাভের প্রক্রিয়াকে যেমন বস্তুজগৎ নিরপেক্ষ মনে করা হয় না, তেমনি তাকে বস্তুজগতের "দর্পণসদৃশ যান্ত্রিক প্রতিবিম্ব" রূপেও গণ্য করা হয় না। এই ধারণার ভিত্তিতে মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বকে তিনটি মূল সূত্রের আকারে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, বস্তুজগতের বিষয়গত অস্তিত্বই হল জ্ঞানের উৎস। দ্বিতীয়তঃ, বস্তুর ওপরে ব্যক্তির সৃষ্টিশীল শ্রমের যথার্থ প্রয়োগপদ্ধতি জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়াকে নির্দিষ্ট রূপ দেয়। তৃতীয়তঃ, বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভের অর্থ হল জ্ঞাতব্য বস্তুর অন্তর্নিহিত অর্থ ও তার মধ্যে নিহিত মৌলিক সম্পর্কগুলিকে সচেতনভাবে অনুধাবন করা। উদাহরণস্বরূপ, ধনতন্ত্র সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান তখনই সার্থক যখন তার অন্তর্নিহিত পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বকে অনুধাবন করা সম্ভবপর হয়।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী যে জ্ঞানতত্ত্বের জন্ম দেয়, তার মূল ঝোঁকটি লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, জ্ঞান উৎসারণের ভিত্তিটি হল ভাব-নিরপেক্ষ বস্তুজগৎ। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য বস্তুর ওপরে ব্যক্তির সক্রিয় হস্তক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সক্রিয় ও সচেতন হস্তক্ষেপকে বলা হয় অনুশীলন (practice, যা গ্রীক শব্দ praxis থেকে উদ্ভূত)। এই অনুশীলন প্রক্রিয়াকে দু'টি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। কতকগুলি ক্রিয়াপদ্ধতিকে বলা যায় বিষয়গত, অর্থাৎ যেখানে ব্যক্তির অনুশীলন প্রক্রিয়া ব্যক্তি-নিরপেক্ষ পারি-পার্শ্বিক দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তি প্রকৃতিকে ব্যবহার করে যে উৎপাদনপদ্ধতি সৃষ্টি করে, তার চরিত্র একান্তভাবেই বিষয়গতভাবে নির্ধারিত হয়; অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার অনুশীলনপ্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবেই পরিবেশনির্ভর। আবার অনেক ক্ষেত্রে এই অনুশীলন প্রক্রিয়া হয় বিষয়ীগত। সেখানে ব্যক্তির সক্রিয়তা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থা বিষয়গতভাবে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা

নির্ধারণ করে দিলেও, বিষয়ীগতভাবে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি এক বিপ্লবী অনুশীলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সম্ভাবনার বাস্তব রূপ দেয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের জন্য তাই এই দু'টি প্রক্রিয়াই অপরিহার্য। বিষয়গত অনুশীলন যেমন পুঁজিবাদের শোষণের চরিত্রটি বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে, বিষয়ীগত অনুশীলন তেমনি এই ব্যবস্থাকে পরিস্থিতি অনুযায়ী উচ্ছেদের প্রয়োগপদ্ধতিকে চিহ্নিত করে।

অনুশীলনের মাপকাঠিতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানের সঠিকতা প্রমাণিত হয়। এই প্রসঙ্গে জ্ঞানতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে অনুশীলনের তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, জ্ঞানের বিষয়গত ভিত্তি হল অনুশীলন। দ্বিতীয়তঃ, অনুশীলন প্রক্রিয়া অবিরাম পরিবর্তনশীল, কারণ যে বস্তুজগৎ অনুশীলনের বিষয়বস্তু, সেই জগৎই পরিবর্তনশীল। তৃতীয়তঃ, অনুশীলনের মাধ্যমেই জ্ঞান যথার্থ না মিথ্যা সেটি প্রমাণিত হয়। মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্ব অনুযায়ী যেহেতু নিরন্তর অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান উৎসারিত হয়, সেহেতু জ্ঞান কখনই সম্পূর্ণ হয় না। এবং অনুশীলন প্রক্রিয়া ও জ্ঞান অর্জনও তাই অবিরাম গতিতে চলতে থাকে।

মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, কোন্ পদ্ধতিকে অনুসরণ করলে সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জ্ঞানপ্রক্রিয়াকে সুনিশ্চিত করা সম্ভব? বস্তুবিষয়ে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিগত দিক্‌টির বিশ্লেষণ মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বের সাম্প্রতিককালের আলোচনায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ১৮৫৭-৫৮ সালে রচিত Outlines of a Critique of Political Economy (সংক্ষেপে Grundrisse)তে মার্কস এই প্রশ্নটির যে দার্শনিক ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার ভিত্তিতে জ্ঞানপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত স্তরকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথম স্তরে, জ্ঞানপ্রক্রিয়ার যাত্রাবিন্দুটি হল জ্ঞাতব্য বস্তু, অর্থাৎ, যে বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে একজন জ্ঞানলাভে আগ্রহী। এই পর্যায়ে জ্ঞাতব্য বিষয়টি সম্পর্কে যেহেতু কোন ধারণাগত উপলব্ধি (conceptual understanding) সম্ভব নয়, সেই কারণে এটি কতকগুলি উপাদানের যোগফল হিসেবে পরিলক্ষিত হয় মাত্র। জ্ঞানপ্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল, জ্ঞাতব্য বস্তুটি যে উপাদানগুলির আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে গঠিত, সেগুলিকে চিহ্নিত করা। এটি একান্তভাবেই একটি মননপ্রক্রিয়া এবং মার্কস একে বস্তুর স্থানিক স্তর থেকে

বিমূর্তনের স্তরে যাত্রা (movement from concrete to abstract) রূপে বর্ণনা করেছেন। প্রচলিত বিজ্ঞানের ভাষায় এটি হল বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (method of analysis)। দু'টি স্তরের মধ্যে পার্থক্য এখানেই যে, প্রথম স্তরে জ্ঞাতব্য বস্তুটির স্বরূপ অজ্ঞাত; দ্বিতীয় স্তরে বস্তুর অভ্যন্তরীণ আন্তঃ-সম্পর্কগুলিকে চিহ্নিত করে বস্তুর চরিত্র সম্পর্কে আমরা একটি প্রাথমিক ধারণায় উপনীত হই এবং এটি সম্ভব হয় বিমূর্ত (abstract) বিশ্লেষণপ্রক্রিয়াব সাহায্যে বস্তুর স্থানিক (concrete) অস্তিত্বের নেতিকরণের মাধ্যমে।

জ্ঞানপ্রক্রিয়ার তৃতীয় পর্যায়টি হল বিপরীতমুখী একটি প্রক্রিয়া, যাকে মার্কস বলেছেন বিমূর্তনের স্তর থেকে স্থানিক স্তরে উত্তরণ (movement from abstract to concrete)। এই পর্বটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই পর্যায়ে চিহ্নিত সম্পর্কগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সেই সঙ্গে কোন্ সম্পর্কগুলি বস্তুর স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে এবং কোন্ সম্পর্কগুলি গৌণ ও গৌণ সম্পর্কগুলি কিভাবে মুখ্য সম্পর্কগুলির ওপরে নির্ভরশীল, তার বিশ্লেষণ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এই তৃতীয় স্তরেই আমাদের ধারণাগত উপলব্ধি জন্মায় যে আলোচ্য বস্তু বা বিষয়টি কোন্ ধরনের সঞ্চিত সম্পর্কের ব্যক্ত রূপ, অর্থাৎ, প্রথম পর্বে যার স্বরূপ ছিল অজ্ঞাত, তৃতীয় পর্বের শেষে সম্পর্কগুলির অন্বয় (synthesis) প্রতিষ্ঠাব মাধ্যমে জ্ঞাতব্য বস্তু সম্পর্কে ধারণাগত উপলব্ধি জন্মায়। মার্কস এই প্রক্রিয়াকে বলেছিলেন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া (method of synthesis), যেখানে বিশ্লেষণের নেতিকরণ ঘটিয়ে সংশ্লেষণ প্রতিষ্ঠা নেয় এবং পরিণতিতে বস্তুর প্রাথমিক স্থানিক অস্তিত্বের ধারণাগত স্থানিক অস্তিত্বে রূপান্তর ঘটে।

জ্ঞানপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্বে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ উভয়েই যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই দু'টি প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসৃত হবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়? সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, জ্ঞাতার ইতিহাসসচেতনতা, যথোপযুক্ত অনুশীলনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞাতব্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা জ্ঞাতাকে বস্তুর অন্তর্নিহিত সম্পর্কগুলিকে সঠিক মনন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্লেষণ ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কসবাদ পুঁজিবাদের প্রকৃত স্বরূপকে এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে এবং এটিকেই প্রধান ও নিয়ামক সম্পর্করূপে চিহ্নিত করে। অপরদিকে শোষণপ্রক্রিয়া

থেকে বাস্তব জীবনে বিচ্ছিন্ন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার তাত্ত্বিকরা স্বাভাবিক কারণেই এই সম্পর্কটিকে অনুধাবন করতে অক্ষম হন ও ফলে এক ভ্রান্ত ইতিহাসচেতনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাঁরা পুঁজিবাদ সম্পর্কে যে সব সংস্কারপন্থী ও তথাকথিত মানবতাবাদী তত্ত্ব পরিবেশন করেন, সেগুলি পুঁজিবাদ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

চতুর্থ অধ্যায়

মার্কস ও বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব

॥ ১ ॥

বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পটভূমিকা

মার্কস-এঙ্গেলস সমাজবিবর্তনের ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে যে বৈপ্লবিক তত্ত্বের সৃষ্টি করেন, সেটি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে খ্যাত। যদিও ১৮৪৮ সালের **কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে** তাঁরা সর্বপ্রথম এই আলোচনার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছিলেন, চল্লিশের দশকের গোড়াতেই তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন রচনায় কখনও এককভাবে, কখনও যৌথভাবে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মূল ভিত্তিটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এই পর্বে যে প্রশ্নটি মার্কসকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল সেটি ছিল ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার সমস্যা। এই প্রশ্নটির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার প্রয়োজনের খাতিরেই পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছিল।

মার্কস প্রবর্তিত বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের (Alienation) একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ছিল। ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে এই সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল শিল্পবিপ্লব এবং পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থার শিকার যে ব্যক্তি তার বিচ্ছিন্নতা। শিল্পবিপ্লবের কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার জগতে যেমন অত্যাশ্চর্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল, তেমনি এই ঘটনার ফলে পুঁজিপতিদের কাছে অধিকতর মুনাফা অর্জনের এক অভাবিত ও অবারিত সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে পুঁজিই গোটা সমাজব্যবস্থার নিয়ামক শক্তিরূপে আবির্ভূত হল। তারই ফলশ্রুতি হল সৃষ্টিশীল শ্রমপ্রক্রিয়া থেকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা, কারণ শ্রমশক্তি পুঁজিনির্ভর হয়ে পড়ার ফলে শ্রমপ্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায় সৃষ্টিবিমুখ, অর্থাৎ পুঁজির বশংবদ।

শ্রমপ্রক্রিয়া থেকে এই বিচ্ছিন্নতা শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপে জন্ম দেয় এক খণ্ডিত জীবনবোধের, আর তার প্রতিবাদরূপে সমকালীন ইউরোপের

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে ধ্বনিত হয় বিদ্রোহ,—চিন্তার ইতিহাসে যেটি রোমান্টিক আন্দোলন নামে পরিচিত। রোমান্টিক আন্দোলনের মূল কথাটি ছিল বিচ্ছিন্নতাবোধকে অতিক্রম করে ব্যক্তিমানসের সামগ্রিকতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। রোমান্টিক ভাবাদর্শের প্রতিনিধিদের মতে, যন্ত্রসভ্যতা ও মুনাফাকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার যুগ্ম পেষণে সমাজে ব্যক্তিমানসের সামগ্রিকতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে জন্ম দিয়েছিল এক অপূর্ণ, বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত ও ক্ষতবিক্ষত ব্যক্তিসত্তার, আর সে কারণেই বিচ্ছিন্নতাবোধকে অতিক্রম করে ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতাকে প্রতিষ্ঠা করা ঐতিহাসিক কারণে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। রোমান্টিক আন্দোলন ছিল এই চিন্তারই প্রতিফলন। মূলতঃ দু'টি ভিন্ন ধারার মাধ্যমে এই আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। রুশো প্রবর্তিত ধারাটি জন্ম দিয়েছিল নৈরাশ্যবাদী রোমান্টিকতার। দ্বিতীয় ধারাটি ছিল প্রথমটির বিপরীত। শেলী, বায়রণ প্রবর্তিত ধারাটির মূল সূত্রটি ছিল বিদ্রোহী রোমান্টিকতার।

সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে যে বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম হয়েছিল, তা বিশেষ তীব্র আকার ধারণ করেছিল ফ্রান্সে ও পরে জার্মানীতে, যার পিছনে ছিল সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কারণ। অষ্টাদশ শতকের জার্মানী ও ফ্রান্সের চিন্তারাজ্যে আসীন ছিলেন যে চিন্তাবিদ্‌রা, তাঁরা একাধারে যেমন শিল্প-বিপ্লবের অমানবিক রূপটির আত্মপ্রকাশকে দেখে হয়েছিলেন বেদনাহত, তেমনি এই দুই দেশের রাজতন্ত্রভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে আত্মিক বিচ্ছিন্নতা এঁদেরকে করে তুলেছিল চূড়ান্ত নৈরাশ্যবাদী। রাজতন্ত্র ও আধা সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ছিল বিকাশশীল বুদ্ধিজীবীদের আশাআকাংখার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাঁদের আত্মিক চাহিদা ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃত গণতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে খণ্ডিত ব্যক্তিসত্তাকে প্রকৃত মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু যেহেতু বাস্তবে তা সেই মুহূর্তে সম্ভবপর ছিল না, যেহেতু পরিবেশ ছিল প্রতিকূল, সেহেতু নৈরাশ্যবাদী রোমান্টিকরা বাস্তবের সঙ্গে তাঁদের আত্মিক ভাবনার বিচ্ছিন্নতার দ্বন্দ্বকে নিরসন করার চেষ্টায় সমকালীন বাস্তব জগৎকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করে গড়ে তুললেন এক স্বপ্নরাজ্য। তাঁদের কাব্য, শিল্প, সঙ্গীতের মাধ্যমে এই কল্পরাজ্যে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হলেন মানবাত্মাকে তার পূর্ণ মহিমায়। এই রোমান্টিকরা বিচ্ছিন্নতার নিরসন ঘটাতে চাইলেন বাস্তবকে পরিবর্তন করে নয়, কল্পনার শিল্পরাজ্যে

অবগাহন করে বাস্তবকে অতিক্রম করে। তাই এই রোমান্টিকতা ছিল এক অর্থে পুঁজিবাদবিরোধী, শিল্পবিপ্লববিরোধী, আধুনিকতাবিরোধী। এই ধারার অন্যতম পুরোধা ছিলেন রুশো, যাঁর কাছে মানুষের প্রাক্-ইতিহাসই ছিল আদর্শ, যাঁব কাছে আধুনিক শিল্পসভ্যতা ছিল প্রকৃত অর্থে সভ্যতার পরিপন্থী। তাই রুশোর রোমান্টিকতার কেন্দ্রবিন্দু যে ব্যক্তি, সে বিচ্ছিন্ন, বেদনাহত, যন্ত্রণাদগ্ধ। তাই দেখা যায় যে, এই যন্ত্রণার নিবসন ঘটাতে এই খণ্ডিত ব্যক্তিসত্তা ফিরে পেতে চায় তার হারিয়ে যাওয়া অতীতকে, যে অতীত তাকে প্রতিষ্ঠিত কববে তাব পূর্ণ মর্যাদায়। সে কারণে রোমান্টিকতার এই ধারাটি তীব্র আবেগ, বেদনা ও মর্মন্তুদ যন্ত্রণাবোধে আপ্লুত। গ্যোয়েটেব অমর সৃষ্ট The sufferings of young Werther-এর নায়ক ভের্থাবের মর্মান্তিক আত্মহনন এই ভাবনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতীক। একই সুবেব অনুরণন দেখি জার্মানীর দুই কবি ফ্রীড্‌রিষ্ হোয়েলডারলিন ও ফ্রীড্‌রিষ্ নোফালিসের কবিতাগুচ্ছে। এই কবিতা তাই স্বপ্নময, বাস্তববিমুখ; আধুনিক সভ্যতা এঁদের রচনায় উপেক্ষিত; নিসর্গ প্রকৃতি, বিস্তীর্ণ বনভূমি এঁদেব কবিতায় সৌন্দর্যের, পূর্ণতার প্রতীক। হোয়েলডারলিন তাই লেখেন,

> "I understand the silence of the ether ,
> the word of man I could never comprehend".

এই ধারাটির সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অবস্থান ছিল যে বোমান্টিক ভাবাদর্শেব, তার মূল কথাটি ছিল বিচ্ছিন্নতাবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিদ্রোহী রোমান্টিকতার তাৎপর্য ছিল এখানেই যে, বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করে না, বিচ্ছিনতার বন্ধনকে ছিন্ন করেই মানুষ পেতে পাবে মুক্তির আস্বাদ। এই ধাবাটির প্রতিনিধিরা তাঁদের বৈপ্লবিক শিল্পকর্মের মাধ্যমে বাস্তব জগতেব বিচ্ছিন্নতাকে ধ্বংস করে বিদ্রোহী মানবাত্মাকে তার সামগ্রিকতার আদর্শে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাই এঁদের দৃষ্টি ছিল ভবিষ্যতের পানে নিবদ্ধ,—হারিয়ে যাওয়া অতীতকে ফিরে পাওয়ার আকুতি এঁদেব চিন্তাজগতে ছিল প্রায় অনুপস্থিত। শেলীর Prometheus Unbound (১৮২০), বায়রণের Prometheus (১৮১৬) Manfred (১৮১৭), বেটোফেনেব নবম সিম্ফনি এই বিদ্রোহী রোমান্টিকতার মূর্ত প্রতীক। এই রোমান্টিক-তার মধ্যেও ছিল তীব্র আবেগ ও উন্মাদনা; সেই সঙ্গে ছিল মানুষের সৃষ্টি-শীলতা সম্পর্কে গভীর প্রত্যয়। তাই বিদ্রোহী রোমান্টিকরা যে গভীর

মানবতাবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা ছিল বিপ্লবী উন্মাদনায় পূর্ণ এবং শিল্পবিপ্লবপ্রসূত পুঁজিবাদের অমানবিক, সৃষ্টিবিমুখ জীবনবোধের বিরোধী। তাই বায়রণ Manfred-এর উক্তির মধ্য দিয়ে অতিপ্রাকৃতের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন সদম্ভ আত্মপ্রত্যয়:

> "I do not combat against Death, but thee
> And thy surrounding angels···
> —I do defy—deny—
> Spurn back, and scorn Ye !···"

অথবা

> "The Mind—the Spirit—the Promethean spark,
> The lightning of my being".

রোমান্টিক আন্দোলনের এই দু'টি ভাবধারার মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে যে মিলটি ছিল সেটি লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, দুটি ধারাই খণ্ডিত ব্যক্তিসত্তার রূপান্তর ঘটিয়ে ব্যক্তির পূর্ণতার বিকাশসাধনের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, উভয় ধারাই ছিল বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বের আলোচনায় মার্কসের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদী সমাজে বিচ্ছিন্নতাবোধের মূল কারণটিকে অনুসন্ধান করা। তাই অনেক দিক থেকেই তরুণ মার্কসের গভীর মানবতাবাদী আদর্শ ছিল বিদ্রোহী রোমান্টিকতার ভাবধারায় প্রভাবিত। চল্লিশের দশকের প্রথম পর্বের রচনায় মার্কসের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিচ্ছিন্নতাবোধকে ধ্বংস করে ব্যক্তিসত্তাকে তার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা; দ্বিতীয়তঃ, বিচ্ছিন্নতাবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, বিচ্ছিন্নতা-বোধ যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জন্ম দেয়, তাকে ধ্বংস করে বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এই পর্বে মার্কসের চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোলাকোভ্‌স্কি (Kolakowski), ম্যাক্‌লেলান (McLellan) প্রমুখেরা তরুণ মার্কসের বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে বিদ্রোহী রোমান্টিকতার তাৎপর্যকে তাই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।[1]

1. Leszek Kolakowski, *Main Currents of Marxism*. Vol. I; পৃঃ ৪০৯-৪১৪; David McLellan, 'Marx and the Whole Man', in Bhiku Parekh (ed), *The Concept of Socialism*, পৃঃ ৬৩।

ইতিহাসগত এই প্রেক্ষাপট ছাড়া দ্বিতীয় যে উৎসটি মার্কসের বিচ্ছিন্নতা-বোধের আলোচনাকে প্রভাবিত করেছিল তা ছিল সমকালীন ইউরোপের দার্শনিক ভাবধারা। প্রথমতঃ, হেগেলীয় দর্শন, ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও, মার্কসের বিচ্ছিন্নতাবোধের আলোচনায় দু'টি দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রথমতঃ, হেগেলীয় চিন্তা অনুযায়ী Spirit তার অনন্ত ও পরম সত্তা সম্পর্কে সচেতন হবার প্রয়াসে সৃষ্টি করে সসীম জগৎকে, যার অর্থ Spirit এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্ববিচ্ছিন্নতা ঘটায়। কিন্তু Spirit যেহেতু অনন্ত ও অসীম, তাঁর সৃষ্ট কোনও সীমিতসত্তা, বস্তু বা ভাবের মধ্যেই সে তার প্রকৃত স্বরূপকে চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই হেগেলীয় দর্শনে Spirit যেমন সৃষ্টি করে তার স্ববিচ্ছিন্নতাকে, তেমনি পরমুহূর্তেই তাকে অতিক্রম করে Spirit সৃষ্টি করে নতুন সত্তাকে; এই প্রক্রিয়ার অবিরাম গতিশীলতার মাধ্যমেই Spirit নিজের বিপুল সত্তাকে খুঁজে পায়; Spirit যে জগৎকে সৃষ্টি করে তার যুগপৎ উন্মেষ ও অতিক্রমণের ফলশ্রুতি হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব। হেগেলীয় দর্শনে Spirit-এর স্ববিচ্ছিন্নতার এই ধারণা তরুণ মার্কসের দার্শনিক চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল, যদিও হেগেলের চিন্তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, হেগেলের ভাববাদী দর্শনে বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করার যে গভীর আত্মপ্রত্যয় Spirit-এর চরিত্রের মধ্যে নিহিত, মার্কসের কাছে সেটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যমূলক। হেগেলের দর্শন শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করেনি, বিচ্ছিন্নতাকে নিরসন করার সন্ধানও যে এই দর্শনের মর্মবস্তু,—মার্কসের কাছে হেগেলের চিন্তার এই দিকটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচ্ছিন্নতা যে চিরকালীন নয়, অনন্ত যাত্রার শেষে স্ববিচ্ছিন্নকরণ প্রক্রিয়ার অবসান ঘটিয়ে, নিজের স্বরূপ ও আদিপ্রকৃতি সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করে Spirit যে নিজের পূর্ণতাকে প্রতিষ্ঠিত করে,—তরুণ মার্কসের চিন্তাকে এই তত্ত্ব গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

হেগেলীয় দর্শনের প্রথম বস্তুবাদী সমালোচক লুড্‌ভিগ্‌ ফয়েরবাখ্‌ (Ludwig Feuerbach)-এর নৃতত্ত্বমূলক মানবতাবাদ (anthropological humanism) ছিল মার্কসের বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের দ্বিতীয় দার্শনিক উৎস। ডেভিড ম্যাকলেনানের মতে, ১৮৪৩-৪৫ সালে মার্কসের প্রথম পর্বের রচনায় ফয়েরবাখের Preliminary Theses for Reform of Philosophy এবং Outlines of the Philosophy of Future লেখা দু'টির প্রভাব ছিল অত্যন্ত

গভীর। এই প্রসঙ্গে লুই আলথুসে (Louis Althusser) লিখেছেন যে, মার্কসের প্রথম জীবনের লেখা ছিল ফয়েরবাখীয় চিন্তাধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত। ১৮৪২ থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত মার্কসের পরিভাষাই যে কেবল ফয়েরবাখীয় তাই নয়, যেটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ তা হল এই যে, মার্কস যে মূল দার্শনিক সমস্যাটি উত্থাপন করেছিলেন সেটিও ছিল ফয়েরবাখীয়।[2] ফয়েরবাখের (১৮০৪-৭২) চিন্তায় দু'টি দিক বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, তার দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হল ব্যক্তি, যে একটি জৈবিক সত্তা, কোন নৈর্বক্তিক Spirit নয়। তাঁর ধারণানুযায়ী ব্যক্তি তার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে ব্যক্তির মধ্যে জন্ম হয় নৈরাশ্যবোধের ও তা থেকে সৃষ্ট হয় ঈশ্বরকল্পনা। এক কথায় ঈশ্বর জাতীয় কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা ব্যক্তিজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না। ঈশ্বরবোধ বিচ্ছিন্নতাপ্রসূত নৈরাশ্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। হেগেলের চিন্তার সঙ্গে ফয়েরবাখের ধারণার বিরোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। হেগেল যেখানে Spirit-এর বিমূর্ত আত্মপ্রকাশকে মনে করেন বিচ্ছিন্নতা, ফয়েরবাখের দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্নতার ধারণাটি একান্তভাবেই বস্তুজগৎপ্রসূত। তাই ফয়েরবাখ্ই প্রথম দর্শনের চিন্তার ইতিহাসে বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটির আলোচনায় একটি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনিই প্রথম বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, ঈশ্বর ব্যক্তিসত্তাকে সৃষ্টি করে না; ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধই ঈশ্বরের ধারণার জন্ম দেয়। দ্বিতীয়তঃ, ফয়েরবাখ্ বিচ্ছিন্নতার নিরসন করেছেন ব্যক্তি ও পরিবেশের একাত্মকরণের মাধ্যমে, অর্থাৎ, তাঁর মতে, উভয়ের এই সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি তার পূর্ণসত্তাকে ফিরে পায় ও বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে। এই প্রসঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে চিরাচরিত ধারণার সমালোচনা করে ফয়েররাখ্ বলেছেন যে, ধর্মপ্রবণতা হল মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের অভিব্যক্তি। তাঁর মতে, ধর্মের প্রকৃত অর্থ মানবাত্মার স্বার্থক ও পূর্ণ নৈতিক বিকাশ। তাই তাঁর ধারণা অনুযায়ী, বিচ্ছিন্নতার অবসান হবে তথাকথিত ধর্মীয় অনুশাসনকে স্বীকার করে নয়, ধর্মের প্রকৃত অর্থ যে নৈতিক মূল্যবোধ, তার বিকাশের মাধ্যমে। এখানেও হেগেলের সঙ্গে ফয়েরবাখের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য লক্ষণীয়।

---

2. David McLellan, *The Young Hegelians and Karl Marx*, পৃঃ ১০১-১১৩। Louis Althusser, *For Marx*, পৃঃ ৫।

হেগেল Spirit-এর বিচ্ছিন্নতার নিরসন ঘটান অধিবিত্থক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে; ফয়েরবাখ্ এই সমস্যার সমাধান করেন বস্তুজগতে পরিবেশ ও ব্যক্তির অন্বয় সাধন করে।

যে প্রশ্নটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেটি হল এই যে, হেগেল ও ফয়েরবাখের বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীকে তরুণ মার্কস কি চোখে দেখেছিলেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে আলোচনায় হেগেল ও ফয়েরবাখের ব্যাখ্যা তরুণ মার্কসকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাটিও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এঁদের দার্শনিক চিন্তায় যে অসম্পূর্ণতা ও গুরুতর অসঙ্গগতি ছিল, মার্কস তাঁর তরুণ বয়সে সে সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। ১৮৪৪ সালে রচিত The Critique of Hegelian Dialectic and Philosophy as a Whole প্রবন্ধে মার্কস হেগেলের দর্শনের যে সমালোচনা করেন, সেটি এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, হেগেলের মতে Spirit-এর আত্মোপলব্ধির প্রক্রিয়া বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। মার্কসের বক্তব্য ছিল, বিচ্ছিন্নতার এই অধিবিত্থক ব্যাখ্যা সমাজজীবনে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। বিচ্ছিন্নতা কোন বিমূর্ত, অতিপ্রাকৃত ঘটনা নয়। বিচ্ছিন্নতার উৎস এই চলমান বস্তুজগতের মধ্যেই নিহিত। দ্বিতীয়তঃ, সুইন্‌জউডের (Swingewood) আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে,[3] হেগেলীয় দর্শনে যেহেতু Spirit-ই হল বিচ্ছিন্নতার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, সেহেতু তার বহিঃক্রমণ প্রক্রিয়া ও বিচ্ছিন্নকরণ সমার্থক বলে গণ্য করা হয়; অর্থাৎ, Spirit-এর সৃষ্টিশীলতা, যা তার আত্মোপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ (objectification), একই সঙ্গে সৃষ্টি করে তার বিচ্ছিন্নতা (alienation)। কিন্তু সমাজজীবনে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির প্রক্রিয়া ও বিচ্ছিন্নকরণ প্রক্রিয়া সমার্থক নয়। সেখানে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির সার্থক ফলশ্রুতি যে বহিঃক্রমণ প্রক্রিয়া, তা থেকে উৎসারিত হয় সৃষ্টিশীলতা। সেই সৃষ্টিশীলতা বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয় না। বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয় সেসব ক্ষেত্রে যেখানে ব্যক্তি তার আত্মোপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়, যেখানে পরিবেশ ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই হেগেল যেখানে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করে উভয়কে সমার্থক মনে করেন, মার্কসের

3. Alan Swingewood, *Marx and Modern Social Theory*, পৃঃ ৯০-৯৯।

বস্তুবাদী বিচারে পরিবেশ ও ব্যক্তির বৈর দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়।

ফয়েরবাখ্ হেগেল বর্ণিত বিচ্ছিন্নতা প্রশ্নের একটি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আলোচনাও ছিল অবৈজ্ঞানিক ও তরুণ মার্কসের রচনার ওপরে ফয়েরবাখের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও মার্কস তাঁর Theses on Feuerbach (১৮৪৫) The German Ideology (১৮৪৬) প্রভৃতি রচনায় ফয়েরবাখীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা করেছিলেন। ফয়েরবাখ্ প্রসঙ্গে মার্কসের সমালোচনা দু'টি দিক থেকে আলোচ্য। প্রথমতঃ, বস্তুবাদী হয়েও বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নের বিশ্লেষণে ফয়েরবাখ্ কোন সামাজিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের নির্দেশ দিতে পারেননি। নীতি-শাস্ত্রপ্রণোদিত এই ব্যাখ্যায় মানুষ বলতে ফয়েরবাখ্ চিহ্নিত করেছেন ইতিহাস-নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট সমাজের মানুষ নয়, যে মানুষ সামাজিক মানুষ নয়, যে ব্যক্তি হল একটি নৃতাত্ত্বিক, জৈবিক সত্তা। দ্বিতীয়তঃ, ফয়েরবাখ্ হেগেলীয় ভাববাদকে খণ্ডন করতে গিয়ে তাঁর দ্বন্দ্বতত্ত্বেরও বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল কথা হল যে গতিশীলতা, ফয়েরবাখের চিন্তায় সেটি ছিল অনুপস্থিত। ফয়েরবাখ্ তাই ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে বিচ্ছিন্নতার সমস্যার যে সমাধানসূত্র দিয়েছিলেন, তাতে পরিবেশকে পরিবর্তন করার দৃষ্টিভঙ্গীটি ছিল উপেক্ষিত। মার্কসের চোখে ফয়েরবাখের দর্শনের অন্যতম ত্রুটি ছিল তাঁর ক্রিয়াবিমুখ মানবতাবাদ।

তরুণ মার্কস তাঁর প্রথম পর্বের যে রচনাগুলিতে বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটির বিশ্লেষণ করেন, তার বস্তুবাদী চরিত্রটির উৎস খুঁজতে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে ১৮৪০ সালের দিকে। ওই সময়ে জার্মানীর মেহনতি মানুষের দুর্দশা, কল্পনাধর্মী সমাজতান্ত্রিক চিন্তা, সমকালীন ইউরোপের বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রভৃতির প্রভাবে ১৮৪২ সালে Rheinische Zeitung পত্রিকার সম্পাদকরূপে মার্কস একাধিক প্রবন্ধে সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির নেতিবাচক ভূমিকার স্বরূপটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। এর পরে ১৮৪৩ সালে Critique of Hegel's Philosophy of Law প্রবন্ধে তিনি হেগেলের ভাববাদী রাষ্ট্র-চিন্তাকে খণ্ডন করে লিখলেন যে, রাষ্ট্র সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে না, সমাজই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পুঁজির ব্যক্তিগত

মালিকানাই যে রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ামক শক্তিরূপে কাজ করে, পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অন্যতম প্রধান এই সূত্রেব সূত্রপাত এই সময়তেই হয়েছিল। ১৮৪৩ সালে মার্কস প্যারিসে আসেন। মার্কসের প্যারিসবাসের অভিজ্ঞতা তাঁর বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। এখানে তিনি সমকালীন ফ্রান্সের বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ্ তিয়েরি (Thierry), মিনিয়ে (Mignet), গিজো (Guizot), প্রমুখের রচনা ও মাকিয়াভেল্লি, রুশো, মঁতেস্কুব রাষ্ট্রতত্ত্ব গভীরভাবে অনুশীলন করতে শুরু করেন। সেই সঙ্গে সাঁ সিমোঁ, ফুরিয়ে প্রমুখ কল্পনাধর্মী সমাজতন্ত্রীদের পুঁজিবাদের সমালোচনার সঙ্গে মার্কস এই সময়ে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন। এই সব কিছুই তাঁর মনে একাধিক প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। পরবর্তীকালে কুগেলমানের কাছে লেখা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে, তৎকালীন ফ্রান্সের বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ্রাই প্রথম ইতিহাসে শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রামের উপস্থিতিকে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু যে প্রশ্নগুলি মার্কসকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল সেগুলি হল; ইতিহাস যদি শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারা পরিচালিত হয়, কোন্ শ্রেণী ইতিহাসে প্রকৃত বিপ্লবী চিন্তার ধারক ও বাহক? মানবজাতির ভবিষ্যৎই বা কোন শ্রেণীব হাতে ন্যস্ত? সেই ভবিষ্যৎ সমাজের রূপই বা কি হবে? মার্কসের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, হেগেলের বিমূর্ত ভাববাদী দর্শন বা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের চিন্তার ওপরে ভিত্তি করে এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই মার্কস এই পর্বে বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত সমস্ত রচনা পাঠে মনোনিবেশ করেন। স্মিথ, রিকার্ডো, ম্যাক্কুলখ্ (McCulloch), জেমস মিল, সে (Say), ত্রাসি (Tracy) বোয়াগিল্বের (Boisguillebert) প্রমুখের তত্ত্বকে মার্কস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ শুরু করেন। এই সময়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হল Deutsch-Franzoesische Jahrbuecher পত্রিকায় এঙ্গেলসের Outlines of a Critique of Political Economy (১৮৪৪)-এর প্রকাশনা। এঙ্গেলস এই রচনায় তাঁর ব্রিটেনে থাকাকালীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাই যে পুঁজিবাদী সমাজের বৈরদ্বন্দ্বের মূল এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করেন। এঙ্গেলসের এই রচনা মার্কসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

প্যারিসে থাকাকালীন মার্কস যে শুধুমাত্র পুঁজিবাদী সমাজের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন তা নয়, প্যারিসই তাঁকে প্রথম আধুনিক শ্রমিক-

শ্রেণীর সমস্যা ও সংগ্রামী চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা প্রদান করে। চল্লিশের দশকের ইউরোপে প্যারিস ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের পীঠস্থান। ফ্রান্সে এই সময়ে শ্রমিক আন্দোলন উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠছিল। জার্মানীতে থাকাকালীন গণআন্দোলনের সঙ্গে মার্কসের প্রাথমিক পরিচয় হয়। ফ্রান্সের শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা মার্কসের চেতনাকে পরিণত রূপ দিল। সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বিভিন্ন ধারার প্রতিনিধি রাজনৈতিক নেতা, তাত্ত্বিক ও সাহিত্যিকের সঙ্গে এই পর্বে মার্কসের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস, যাঁর আজীবন সখ্যতা মার্কসের চিন্তার বিকাশে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল এবং যাঁর অবদানকে উপেক্ষা করে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাকে ব্যাখা করা যায় না। তিনি ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন লুই ব্লাঁ (Louis Blanc), পিয়ের লরু (Pierre Leroux), প্রুধোঁ (Proudhon), হাইনরিখ হাইনে, মিখাইল বাকুনিন প্রমুখেরা। শ্রমিকশ্রেণীই যে ইতিহাসের ভবিষ্যৎ, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিই যে আনতে পাবে মানুষের মুক্তি, এই গভীর প্রত্যয় ক্রমশঃ মার্কসের চিন্তায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৮৪৪ সালের গোড়ায় রচিত Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law: An Introduction এবং On the Jewish Question প্রবন্ধ দু'টিতে এই চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়।

এই পটভূমিকাটির দিকে লক্ষ্য কবলে দেখা যায় যে, বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটিকে মার্কস ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। রোমান্টিক ভাবধারা, হেগেল ও ফয়েরবাখের দর্শন, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্ ও ইতিহাসবিদ্দের চিন্তা, কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রতিনিধিদের বুর্জোয়া - -লোচনা,—এই সব ধারার প্রভাবই মার্কসের ওপরে পড়েছিল। কিন্তু কোন একটি রচনাতে মার্কস বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের সামগ্রিক আলোচনা তখনও পর্যন্ত করেননি। ১৮৪৪ সালে মার্কস তাঁর Economic and Philosophical Manuscripts-এ প্রথম বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটিকে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেন। মার্কসের জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত[4] এই পাণ্ডুলিপিতে, যেটি "প্যারিস পাণ্ডু-

4. মূল পাণ্ডুলিপিটি মাকসের জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত ছিল। পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ডেভিড রিয়াজানভের প্রচেষ্টায় এই পাণ্ডুলিপিটি সংগৃহীত হয় ও ১৯৩২ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়।

লিপি" (Paris Manuscripts) নামে পরিচিত, তিনি এই প্রশ্নটির একটি সামগ্রিক আলোচনার সূত্রপাত করেন। মার্কসের এই বিশ্লেষণ ছিল তাঁর বিপুল গবেষণার ও প্যারিসবাসের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। ইস্‌তভান্ মেজা-রোসের (Istva'n Mesza'ros)-এর মতে, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মার্কস বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের যে বিশ্লেষণ "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে করে গেছেন, তা একাধিক কারণে মৌলিকত্বের দাবি রাখে।[5] প্রথমতঃ, এই আলোচনায় মার্কস যে ধারণামৌলগুলি (Category) ব্যবহার করেছেন, সেগুলি নীতি-জ্ঞানপ্রসূত নয়। সেগুলি উৎসারিত হয়েছিল বাস্তব জীবন থেকে, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। দ্বিতীয়তঃ, মার্কস বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের আলোচনা করেছেন কোন বিশেষ কল্পরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে নয়। বিচ্ছিন্নতার সার্বিক ও সর্বজনীন রূপটির বিশ্লেষণই ছিল মার্কসের উদ্দেশ্য। তৃতীয়তঃ, কোন হেগেলীয় বিমূর্ত "আত্মা"র সামগ্রিক আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে মার্কস বিচ্ছিন্নতার অবসানের কথা বলেননি। তাঁর বিশ্লেষণে বিচ্ছিন্নতার অবলুপ্তি ঘটে প্রলেতারিয়েতের আত্মোপলব্ধির মধ্যে, অর্থাৎ মানবিক সত্তার পূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

॥ ২ ॥

"প্যারিস পাণ্ডুলিপি" ও বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব

যদিও "প্যারিস পাণ্ডুলিপিতেই" মার্কস বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের একটি সামগ্রিক আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, তরুণ মার্কসের দার্শনিক চিন্তার পট-ভূমিকাটিকে বিচার করলে দেখা যায় যে ১৮৪২ সালের পূর্ববর্তী পর্যায়েও মার্কস এই প্রশ্নটি নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। এক কথায়, মার্কসের বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বের আলোচনায় যদিও "প্যারিস পাণ্ডুলিপি" হল মূল কেন্দ্রবিন্দু, প্রাক্-১৮৪৪ পর্বের রচনাগুলিও এই প্রসঙ্গে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিতর্কিত হলেও এই প্রসঙ্গে অ্যাডাম শ্যাফ্ (Adam schaff) যে পদ্ধতিগত প্রশ্নটি উত্থাপিত করেছেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[6] তিনি দেখিয়েছেন যে, মার্কস তাঁর একেবারে প্রথম পর্বের রচনায় বিচ্ছিন্নতাবোধকে দেখেছিলেন তার ধর্মীয় রূপের পরিপ্রেক্ষিতে। দ্বিতীয় স্তরে বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে

5. **Istva'n Mesza'ros,** ***Marx's theory of Alienation,*** **পৃঃ ৬৪-৬৫।**
6. **Adam Schaff,** ***Marxism and the Human Individual,*** **পৃঃ ১০৮-১২৭।**

মতাদর্শগত ও দার্শনিক স্তরে। তৃতীয় স্তরে মার্কসের চোখে বিচ্ছিন্নতা মূলতঃ একটি রাজনৈতিক ধারণা। চতুর্থ স্তরে মার্কস বিচ্ছিন্নতার মূল কারণটিকে নিহিত দেখেন সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির মধ্যে, যার সুসংবদ্ধ ও পরিণত রূপটি আমরা পাই তাঁর "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে। মার্কসের বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের আলোচনায় প্রতিটি স্তরই তাই বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

(ক) **বিচ্ছিন্নতা: ধর্মীয়**—সমকালীন জার্মানীতে বিচ্ছিন্নতাবোধের অন্যতম প্রতীক ছিল ধর্ম, ধর্মীয় প্রথা ও ঈশ্বরবোধের প্রতি গভীর আস্থা। মার্টিন লুথার তাঁর প্রোটেস্ট্যাণ্টবাদের মাধ্যমে যে ভক্তিবাদের সূচনা করেছিলেন, জার্মানীর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাববাদী দর্শনের ধারা তাকে পুষ্ট ও সংহত করেছিল। শেলিং (Schelling), শ্লায়ারমাখের (Schleirmacher) ও সর্বশেষে হেগেলের বিমূর্ত Spirit বা 'আত্মা'কেন্দ্রিক দর্শন এই চিন্তাকে আরও সুদৃঢ় করে। কিন্তু বাস্তব বিচারে ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রতি এই আস্থা ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির পরিপন্থী। ঈশ্বরভাবনার অর্থ, বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হয়ে বিচ্ছিন্নতাকে সৃষ্টি করে যে পরিবেশ তার কাছে আত্মসমর্পণ করা। পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অন্বয় সাধন করে পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাতে হবে,—মানুষের সৃষ্টিশীলতার প্রতি গভীর আস্থা পোষণ করে এই বৈপ্লবিক ঘোষণা প্রথম করেন ফয়েরবাখ্, তাঁর Lectures on the Essence of Religion-এ। মানুষই মানুষের একমাত্র উপাস্য দেবতা; অন্যায়, অবিচার ও নিরাপত্তার অভাব যে নৈরাশ্যমূলক বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়, তার নিরসন হবে সর্বশক্তিমান কোন বিমূর্ত সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ করে নয় বা কোন স্বর্গলোককে কল্পনা করেও নয়; মর্তলোককে স্বর্গলোকে রূপান্তরিত করেই বিচ্ছিন্নতার অবসান হতে পারে,—ফয়েরবাখের এই প্রত্যয়সিদ্ধ, ধর্মবিরোধী, ঈশ্বরবিরোধী চিন্তার অন্যতম শরিক ছিলেন তরুণ মার্কস। মার্কসের একেবারে প্রথম পর্বের রচনাতেই ধর্ম ও ঈশ্বরবোধ যে বিচ্ছিন্নতার বহিঃপ্রকাশ তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধর্ম ও ঈশ্বরবোধ মানুষের অসহায়তা ও নৈরাশ্যবোধ থেকে উৎসারিত হলেও মানুষই যে ঈশ্বরবোধের শিকার হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ, মনুষ্যত্বের মহিমা যে ঈশ্বরভজনার ফলে ভূলুণ্ঠিত হয়, তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১৮৪১ সালে মার্কসের গবেষণামূলক নিবন্ধ Difference between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature-এ। সেখানে তিনি লেখেন যে,

স্বর্গের ও মর্তের সব দেবতাই তাঁর কাছে ঘৃণ্য, কারণ তাঁরা মানুষের মধ্যে যে দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজ করে তাকে স্বীকার করেন না। একই সুরের প্রতিধ্বনি দেখি তাঁর Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law : An Introduction-এ, যেখানে বিদ্রোহী রোমান্টিকতার ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ, Faust ও Prometheus-এর আদর্শে পরিচালিত তরুণ মার্কস জেহাদ ঘোষণা করেছেন ধর্ম ও ঈশ্বরবোধের বিরুদ্ধে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জন্ম নিয়েছিল মার্কসের নিরীশ্বরবাদ, কারণ নিরীশ্বরবাদই ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে, বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে তার স্বমহিমায়, তার পূর্ণ আত্মমর্যাদায়, তার সামগ্রিকতায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। শুধুমাত্র তরুণ মার্কসই নয়, তরুণ এঙ্গেলসের এই পর্বের রচনাও ছিল নিরীশ্বরবাদের দ্বারা পরিচালিত। তৎকালীন ইংরেজ সাহিত্যিক কার্লাইল ও জার্মান ভাববাদী দার্শনিক শেলিং-এর ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে লিখিত Review of Thomas Carlyle's Past and Present এবং Schelling on Hegel, Schelling, Philosopher in Christ প্রভৃতি প্রবন্ধে এঙ্গেলসের চিন্তাতেও এই সুরের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

(খ) **বিচ্ছিন্নতা : দার্শনিক ও মতাদর্শগত**—ধর্ম ও ঈশ্বরচেতনা বিচ্ছিন্নতাবোধের বহিঃপ্রকাশ, সেই বোধকে সুদৃঢ় করে ও বাঁচিয়ে রাখে জীবনবিমুখ, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন মতাদর্শ ও দার্শনিক ভাবধারা। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মার্কস-এঙ্গেলসের দৃষ্টিতে জার্মান ভাববাদী দর্শন ছিল সমকালীন জার্মানীর বাস্তব পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবীদের আত্মিক বিচ্ছিন্নতার বহিঃপ্রকাশ। এই বোধই জন্ম দিয়েছিল বিমূর্ত ভাববাদের,—যা বাস্তবে ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাতে পারে না। তার ফলে ভাববাদী দর্শন গড়ে ওঠে কতকগুলি নৈর্ব্যক্তিক ধারণাকে কেন্দ্র করে,—যে ধারণাগুলির 'পরে ভিত্তি করে ইতিহাসের গতিপথের পরিবর্তন ঘটান যায় না, কারণ অচিরেই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এই ধারণাগুলিই ব্যক্তির আত্মিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। তাই তরুণ মার্কসের প্রথম পর্বের রচনায় আমরা পাই হেগেলীয় দর্শনের ভাববাদী চিন্তার বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা। প্রথম জীবনে রচিত তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধেই মার্কস ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদ ও ভাববাদের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই দেখা যায় যে, প্রাচীন গ্রীসের বস্তুবাদী দার্শনিক ডেমোক্রিটাস

ও হেরাক্লিটাস, অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সের বস্তুবাদী দার্শনিকদের চিন্তা, বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদ্‌দের তত্ত্ব মার্কসের দৃষ্টিকে বারে বারেই আকর্ষণ করেছে। তাই এই পর্বের রচনায় মার্কস গুরুত্ব দিয়েছেন বস্তুবাদী দর্শন ও মতাদর্শকে, কারণ বিচ্ছিন্নতাবোধকে সৃষ্টি করে যে বাস্তব পরিস্থিতি, তার ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করতে পারে বস্তুনিষ্ঠ জীবন-দর্শন, কোন ভাববাদী আদর্শ নয়। তাই তরুণ মার্কস প্রলেতারিয়েতের পক্ষে নতুন এক দর্শনের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেন, যে দর্শন প্রলেতারিয়েতকে সমস্ত বন্ধন ও বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। তাই Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right : An Introduction এ মার্কস লেখেন যে, জার্মানীর মানুষের মুক্তি একমাত্র মানুষের মুক্তির মধ্যেই সম্ভব। এই মুক্তির মস্তিষ্কটি হল দর্শন ও তার হৃদয় হল প্রলেতারিয়েত। শ্রমিকের মুক্তি ছাড়া দর্শনকে বাস্তবমুখী করা যাবে না এবং বাস্তবমুখী দর্শনকে সৃষ্টি না করে শ্রমিকের মুক্তিকে সুনিশ্চিত করাও সম্ভব নয়। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তরুণ মার্কস একাধারে যেমন ছিলেন ভাববাদী দর্শনের সমালোচক, তেমনই বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাতে পারে এমন এক জীবনকেন্দ্রিক, বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন।

(গ) **বিচ্ছিন্নতা : রাজনৈতিক**—যে বিচ্ছিন্নতাবোধের অভিব্যক্তি জীবনবিমুখ ভাববাদী দর্শন, তা থেকে জন্ম নেয় ব্যক্তির খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন, জীবনবিরোধী রাজনৈতিক সত্তা। দর্শনের ইতিহাস বিচার করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাববাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারা শেষ পর্যন্ত জনবিরোধী, অনেক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক মতবাদকে যথার্থ বলে গ্রহণ করে তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। প্লেটোর ভাববাদী দর্শনের ভিত্তিতে রচিত Republic-এ তাই দেখা যায় দাসব্যবস্থার প্রতি তাঁর সমর্থন। হেগেলের দর্শনও একইভাবে তৎকালীন প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের প্রতি একনিষ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল, কারণ তাঁর মতে Spirit-এর আত্মপ্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধার ছিল প্রাশিয়ান জাতীয়তাবাদী রাজতন্ত্র। এক কথায়, ভাববাদী দর্শন যে বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে উৎসারিত, সেই বোধেরই আর একটি প্রকাশ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনবিরোধী রাজনীতি ও এই বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার যে ব্যক্তি, তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও অবস্থানও

তাই খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন, জীবনবিরোধী। মার্কস দেখালেন, পুঁজিবাদী সমাজে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এক জটিল আকার ধারণ করে। মার্কসের দৃষ্টিতে এই বিচ্ছিন্নতার সূত্র নিহিত থাকে পুঁজিবাদী সমাজের দ্বান্দ্বিক চরিত্রের মধ্যে। এই সমাজে ব্যক্তির দু'টি রূপ। প্রথমতঃ, পুঁজিবাদ যে সমাজব্যবস্থাকে সৃষ্টি করে, হেগেল যাকে বলেছেন পুরসমাজ (Civil Society), তার সদস্যরূপে ব্যক্তির একটি একান্ত নিজস্ব মানবিক সত্তা আছে ; অর্থাৎ, সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তি এখানে স্বাধীন। তাঁর ধর্ম, সংস্কৃতি, মূল্যবোধের বিকাশের ক্ষেত্রে সে স্বাধীন, অনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এই মানবিক সত্তা ছাড়াও ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় রূপ আছে। রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে ব্যক্তি রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা সৃষ্টি করে, তার কেন্দ্রবিন্দু যে রাষ্ট্রশক্তি ও তার লৌহদৃঢ় পরিচালন-ব্যবস্থা, তাকে উপেক্ষা করে পুরসমাজের সদস্য পুরব্যক্তির স্বাধীনতা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। পুরব্যক্তি তাই আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন হলেও, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে সে রাষ্ট্রব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। এর অর্থ, ব্যক্তির সামাজিক সত্তা তার রাজনৈতিক সত্তার বিরোধী, অর্থাৎ ব্যক্তি তার জীবনে দ্বিখণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন। মার্কস ব্যক্তির এই রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার দু'টি কারণ নির্দেশ করেছেন। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রশক্তি যে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পরিচালনা করে, তার বিরুদ্ধে ব্যক্তি সম্পূর্ণ অসহায়, কারণ রাষ্ট্রের আইনশৃংখলাজনিত অমোঘ নির্দেশ ব্যক্তির পক্ষে অলংঘনীয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রব্যবস্থা যাঁরা পরিচালনা করেন, পুঁজিবাদী সমাজে তারা যেহেতু পুঁজি-বাদের প্রতিনিধি, সেহেতু সমাজজীবন ও জনজীবন থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন ও ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র সমাজব্যবস্থা থেকে শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, তার বিরোধীও বটে। এই বিচ্ছিন্নতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মধ্যে। মার্কস তৎকালীন জার্মানীর রাষ্ট্রব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন, প্রাশিয়ান আমলাতন্ত্র ছিল জার্মানীর সমাজজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও উভয়ের সম্পর্ক ছিল একান্তভাবেই বৈরদ্বান্দ্বিক। মার্কসের আলোচনার ভিত্তিতে দেখা যায় যে, আমলাতন্ত্রই সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার শোষণ-যন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রেখে ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে ও তারই ফলশ্রুতি হল রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে ব্যক্তির, অর্থাৎ, রাজনৈতিক স্তরে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা।

মার্কস On the Jewish Question (১৮৪৪) এবং Critique of Hegel's Philosophy of Right (১৮৪৪) রচনা দু'টিতে এই প্রশ্নটির বিশ্লেষণ করেন। মার্কস এই বিষয়টির ব্যাখ্যার মাধ্যমে রাষ্ট্র যে সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের চরিত্র যে শোষণমূলক, স্বাধীনতা-বিরোধী ও জনবিরোধী এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্লেষণ থেকেই মার্কসের চিন্তাজগতে প্রশ্ন ওঠে যে, রাষ্ট্র যদি বিচ্ছিন্নতারই এক বহিঃপ্রকাশ মাত্র, অর্থাৎ রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির পুরসত্তার বিরোধী হয়, তবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করেই কি এই বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটান যায় না? এই প্রশ্নেরই সূত্র ধরে মার্কস দ্বিতীয় একটি সমস্যার বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেটি হল এই যে, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাকে টিঁকিয়ে রাখে পুরসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন যে রাষ্ট্রশক্তি, তার উৎসটি কোথায়? এই প্রশ্নটির আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কস হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখান যে, রাষ্ট্রই সমাজব্যবস্থার প্রধান ধারক হেগেলের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। পুরসমাজের মধ্যেই নিহিত থাকে ব্যক্তিস্বার্থ ও সেই ব্যক্তিস্বার্থ সৃষ্ট হয় অর্থনৈতিক কারণে। মার্কস দেখালেন যে, মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু কিছু ব্যাক্তির অর্থনৈতিক স্বার্থকে রক্ষা করতেই প্রয়োজন হয় রাষ্ট্র-শক্তির, স্বাভাবিক কারণেই যা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের বিরোধী ও জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং রাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে উদ্ভূত ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের বিচ্ছিন্নতারই অভিব্যক্তি। একই সূত্র ধরে "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে সমাজে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধের মূল কারণ যে অর্থনৈতিক জীবনে বিচ্ছিন্নতা, সেই প্রশ্নটির বিশ্লেষণে মার্কস ব্যাপৃত হয়েছিলেন। মার্কসের বিবেচনায় বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নের প্রকৃত সমাধানটি হতে পারে রাজনৈতিক উপায়ে, অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্ছেদ ও ধ্বংস সাধন করে, কারণ রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন ছাড়া পুঁজিবাদের কাঠামোকে বদল করে অর্থ-নৈতিক স্তরে বিচ্ছিন্নতার ছেদ ঘটান যায় না। সে কারণেই দেখা যায় যে, চল্লিশের দশকের সময় থেকে শুরু করে অন্তিমপর্ব পর্যন্ত মার্কসের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ রচনাতে রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্ছেদের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছে। এই প্রশ্নে এঙ্গেলস ও মার্কসের মতামত ছিল অভিন্ন,—এঙ্গেলস ছিলেন একই মতের ধারক ও বাহক।

(ঘ) **বিচ্ছিন্নতা : অর্থনৈতিক**—মার্কস ১৮৪৪ সালে রচিত "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে একাধিক প্রবন্ধের মাধ্যমে সমাজজীবনে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার

অর্থনৈতি কারণগুলি অনুসন্ধান করেন। "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে মার্কসের এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার তিনটি কারণ চিহ্নিত করা যায়। প্রথমতঃ, মার্কসের আলোচনার যাত্রাবিন্দু হল ব্যক্তির শ্রম, যে শ্রমের পূর্ণ অধিকারী ব্যক্তি স্বয়ং। মার্কস দেখিয়েছেন, মানবসমাজের অগ্র-গতির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে অচিরেই প্রয়োজন দেখা দিল শ্রম বিভাজনের এবং যেহেতু শ্রমবিভাজন প্রক্রিয়া কখনই প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে সমান হতে পারে না, সেহেতু শ্রমবিভাজন জন্ম দিল অসাম্যের। যদিও শ্রমবিভাজন প্রয়োজন হয়েছিল সামাজিক উৎপাদনের স্বার্থে, এই ঘটনার পূর্ণ সুযোগ নেবার চেষ্টা করে সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি, যারা শ্রমবিভাজন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে সামাজিক উৎপাদনব্যবস্থার 'পরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমবিভাজন প্রক্রিয়া জন্ম দিল সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার, কারণ, মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীরা উৎপাদনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে গোটা সমাজব্যবস্থার উপরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইল এবং সেটি সম্ভব করার একমাত্র উপায় ছিল উৎপাদিত বস্তুর 'পরে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে সেটিকে সামাজিক সম্পত্তিরূপে অস্বীকার করা। শ্রমবিভাজনের আগে সমাজে উৎপাদন ও ভোগ ছিল যৌথ ; সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। ঐতিহাসিক কারণে শ্রমবিভাজনের জন্মের সূত্র ধরেই সৃষ্ট হয়েছিল সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভবের ফলে সমাজে অর্থনৈতিক অসাম্যের বনিয়াদ পাকাপাকিভাবে রচিত হল। উৎপাদনব্যবস্থাকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই সমাজের শ্রমবিভাগকেও নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থাৎ যারা প্রকৃত অর্থে উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় রত, সেই শ্রমজীবী মানুষদের শ্রম ও শ্রমপ্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে উৎপাদনব্যবস্থার পরিচালকগোষ্ঠী ও তারই ফলে সৃষ্ট হয় অসাম্য। এর পরিণতিতে শ্রমিকের সঙ্গে তার সৃষ্ট বস্তুর ও নিজস্ব শ্রমপ্রক্রিয়ার এক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়, কারণ উৎপাদনব্যবস্থায় শ্রমজীবী ব্যক্তির প্রধান ভূমিকা থাকলেও তার উৎপাদিত দ্রব্যকে আত্মসাৎ করে মালিকপক্ষ। মার্কস দেখিয়েছেন, সমাজবিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে মুদ্রার আবির্ভাব ও সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বিচ্ছিন্নতাকে স্থায়িত্ব দিয়েছে। উত্তরকালে যন্ত্রভিত্তিক আধুনিক ফ্যাক্টরীব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পুঁজিবাদী সমাজে প্রলেতারিয়েতের বিচ্ছিন্নতা এক চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে।

এই বিশ্লেষণের সূত্র ধরে মার্কস পুঁজিবাদী সমাজে প্রলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার দু'টি প্রধান কারণের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমতঃ, পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থায় শ্রম সমাজের বা শ্রমিকের কারও স্বার্থেই নিয়োজিত হয় না। তা সিদ্ধ করে একমাত্র পুঁজিপতিদের স্বার্থ যারা শ্রমপ্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে ও এরই ফলে জন্ম নেয় প্রলেতা-রিয়েতের বিচ্ছিন্নতাবোধ। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকের শ্রমের মালিক যেহেতু পুঁজিপতি, সেহেতু তার শ্রমপ্রক্রিয়ায় শ্রমিক সম্পূর্ণভাবে মালিকের আজ্ঞা-বহ; অর্থাৎ, শ্রমিক তার নিজস্ব শ্রম, উৎপাদিত বস্তু ও শ্রমপ্রক্রিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে এই বিচ্ছিন্নতাবোধকে বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কস লিখেছেন যে, শ্রমিকের সঙ্গে তার উৎপাদিত বস্তুর একটি বৈর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিক যত বেশী পরিমাণে উৎপাদনে তার শ্রমকে নিয়োজিত করে, তার উৎপাদিত বস্তুর সঙ্গে তার বিরোধিতা ও বিচ্ছিন্নতা তত তীব্র আকার ধারণ করে ও এর পরিণতিতে তার নিজেরই ক্ষয় হয়।

এই ব্যাখ্যা থেকে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে, ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক সম্পত্তির আবির্ভাবের ফলেই বিচ্ছিন্নতাবোধতাড়িত শ্রমের (alienated labour) জন্ম হয়। ওইজারমান (Oizerman) তাঁর সাম্প্রতিক-কালের গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলেই শ্রমবিচ্ছিন্নতার জন্ম, এই সূত্রটি আপাতদৃষ্টিতে সঠিক মনে হলেও, বিচ্ছিন্নতার পূর্ণ মার্কসীয় ব্যাখ্যা তা থেকে উৎসারিত হয় না। তিনি সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি শ্রমবিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয় এ কথা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রমবিচ্ছিন্নতাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাবের মূল কারণ।[7] মার্কসের রচনাগুলির আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন যে, সমাজজীবনে শ্রমবিভাজনের পূর্ববর্তী পর্যায়ে ব্যক্তি ও প্রকৃতি ছিল সমন্বিত। ব্যক্তির জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনের ওপরে ভিত্তি করে জীবিকানির্বাহ করা। কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখা গেল যে, একক ব্যক্তির শ্রমক্ষমতা দিয়ে প্রকৃতিকে মানুষের সামগ্রিক প্রয়োজনে নিয়োজিত করা সম্ভবপর নয়। বরং ব্যক্তির একক শ্রম ও প্রকৃতির মধ্যে

7. T. I. Oizerman, *The Making of the Marxist Philosophy*, পৃঃ ২৩৪-২৩৮।

দেখা দিল এক অসম দ্বন্দ্ব, যে দ্বন্দ্বে ব্যক্তি তার একক শ্রমক্ষমতায় প্রকৃতিকে বশে আনতে ব্যর্থ হয়। তার ফলে প্রতিটি ব্যক্তির কাছেই প্রয়োজন দেখা দিল একক প্রচেষ্টায় প্রকৃতিকে জয়লাভের চেষ্টা না করে সামগ্রিকভাবে শ্রম-ক্ষমতাকে নির্দিষ্ট পথে চালনা করার, যাতে যৌথ শ্রমের পরিণতিতে উৎপাদনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এককভাবে ব্যক্তি তার সামগ্রিক প্রয়োজনে প্রকৃতিকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হওয়ায় সমাজের সাধারণ প্রয়োজনে জন্ম নেয় শ্রমশক্তির বিভাজন প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, ব্যক্তি ও প্রকৃতির অসম দ্বন্দ্ব থেকে জন্ম নেয় শ্রমবিভাজন, যেটি প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির শ্রমশক্তির ফলশ্রুতি। আবার শ্রমবিভাজন প্রক্রিয়া থেকে যেহেতু সৃষ্ট হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সেহেতু প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন শ্রম, অর্থাৎ, শ্রমবিচ্ছিন্নতাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি করে। যদিও পরবর্তীকালে পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানা ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতাবোধকে তীব্র করে তোলে, প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির শ্রমশক্তির সঙ্গে প্রকৃতির বিচ্ছিন্নতাই সমাজে শ্রমবিভাগ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব ও সামাজিক অসাম্য সৃষ্টির মূল কারণ। এই বিশ্লেষণটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ মার্কস বর্ণিত এই ব্যাখ্যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, উৎপাদিকাশক্তির, অর্থাৎ, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বে মানুষ একদিন সমকক্ষ হয়ে উঠবে যার ফলে সে তার সৃষ্টিশীল শ্রমশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে শ্রমের বিচ্ছিন্নতার অবসান করে প্রকৃতিকে তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। এর ফলে, প্রথমতঃ, অবসান হবে সেই পরিস্থিতির যা শ্রমবিচ্ছিন্নতার জন্ম দিয়েছিল, অর্থাৎ, মানুষ প্রকৃতিকে করায়ত্ত করার সুযোগ পাবে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমবিচ্ছিন্নতার অবসান উৎপাদনের অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করবে, যার ফলে সৃষ্ট হবে ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপসাধনের পূর্ব শর্ত। তৃতীয়তঃ, উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রগতির মাধ্যমেই ব্যক্তি তার সৃষ্টিশীল শ্রমের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারবে। বিচ্ছিন্নতাবোধের আলোচনায় মার্কস শ্রম ও প্রকৃতির যে দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ করেছিলেন, তারই ভিত্তিতে তিনি পরবর্তী পর্যায়ে রচনা করেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব।

এই আলোচনার ভিত্তিতে মার্কস তাঁর "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে পুঁজিবাদী সমাজে প্রলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার চারটি রূপের বিশ্লেষণ করেছেন। ম্যাক্‌লেলান্, ওলম্যান (Ollman) প্রমুখেরা সাম্প্রতিককালে মার্কসের

এই তত্ত্বের যে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার ভিত্তিতে এই বিষয়টি একটি বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে।[৪] প্রথমতঃ, ব্যক্তির সঙ্গে তার শ্রমপ্রক্রিয়ার বিচ্ছিন্নতা : ব্যক্তি তার শ্রমক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয় প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে। প্রাকৃতিক সম্পদকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করার তাগিদেই ব্যক্তি প্রকৃতির সঙ্গে উৎপাদনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংযুক্ত হয়। তাই ব্যক্তির পক্ষে তার শ্রমপ্রক্রিয়াটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই শ্রম-প্রক্রিয়াই তাকে মানুষ হিসেবে ও তার নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা দেয়। এখানেই মানুষের সঙ্গে জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীর মৌলিক পার্থক্যটি খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে শ্রমপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃতিদত্ত বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়ে উৎপাদনব্যবস্থা সৃষ্টি করে তার নিজের ইতিহাস রচনা করে। মার্কসের বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, তিনি ব্যক্তির শ্রমপ্রক্রিয়াকে ব্যক্তির সৃষ্টিশীল ক্ষমতার সঙ্গে তিনটি বিশেষ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। এক, শ্রমপ্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ব্যক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে সর্বাধিক একাত্মতা সৃষ্টি হয়। দুই, শ্রমপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে ব্যক্তি তার শ্রমের ক্ষমতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হয়। তিন, এই প্রক্রিয়ার ফলেই শ্রমের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার কারণটি হল, এই সমাজে শ্রমপ্রক্রিয়া পুঁজি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে শ্রমিক তার শ্রমশক্তির অপার সম্ভাবনা ও ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হবার কোন সুযোগ পায় না। এর পরিণতিতে ব্যক্তি তার নিজস্ব শ্রমপ্রক্রিয়া থেকে আত্মিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তির সঙ্গে তার সৃষ্ট বস্তুর বিচ্ছিন্নতা : স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত, স্বাধীন শ্রমপ্রক্রিয়ার পরিণতি হল এই যে, ব্যক্তি তার সৃষ্ট বস্তুর ওপরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে যেহেতু শ্রমিক পুঁজিপতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেহেতু সৃষ্ট বস্তুর ওপরে শ্রমিকের কর্তৃত্ব বজায় থাকে না ; শ্রমিক বাধ্য হয় মালিকের স্বার্থে, বাজারের ও মুনাফার প্রয়োজনে উৎপাদন করতে, অচিরেই যা বাজারী পণ্যে পরিণত হয় এর পরিণতিতে স্রষ্টার

৪. D. McLellan, *Marx Before Marxism* ; পৃ: ২১৮-২২৪, Bertell Ollman, *Alienation : Marx's Concept of Man in Capitalist Society*, Part III, Sections 18-22.

সঙ্গে সৃষ্ট বস্তুর বিচ্ছিন্নতা জন্ম নেয়। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, স্রষ্টা যত বেশী পরিমাণে উৎপাদন করে, তত বেশী পরিমাণে সে তার সৃষ্ট বস্তুকে হারায় ও উভয়ের বিচ্ছিন্নতা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তির সঙ্গে তার সৃষ্ট বস্তুর বিচ্ছিন্নতাকে কেন্দ্র করে দু'টি সম্পর্ক উৎসারিত হয়; এক, স্রষ্টার কাছে তারই সৃষ্ট বস্তু অজানা, অচেনা বলে মনে হয়; এ যে তারই নিজস্ব শ্রম-প্রক্রিয়ার সৃষ্টি, সে ধারণা হয় অন্তর্হিত। দুই, অচিরেই এই সৃষ্ট বস্তু স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে বাজারী পণ্যে পরিণত হয় ও সে নিজেই স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণকর্তা হয়ে দাঁড়ায়। মার্কসের ভাষায়, সৃষ্ট বস্তু তখন এক সজীব কর্তার ও স্রষ্টা তখন নিয়ন্ত্রিত, মৃত, সৃষ্ট বস্তুর ভূমিকা গ্রহণ করে।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা: যেহেতু শ্রমপ্রক্রিয়া ও শ্রম সৃষ্ট বস্তু উভয় থেকেই ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন, ও যেহেতু এই বিচ্ছিন্নতার মূলে থাকে একটি নিয়ন্ত্রণশক্তি, অর্থাৎ পুঁজিপতিরূপী অপর এক ব্যক্তি, সেহেতু পুঁজি-পতির সঙ্গে শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতার অর্থ দাঁড়ায় কার্যতঃ শ্রমিকরূপী এক ব্যক্তির সঙ্গে পুঁজিপতিরূপী অপর এক ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা। এ থেকেই জন্ম নেয় সমাজজীবনে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার সম্পর্ক।

চতুর্থতঃ, ব্যক্তির সঙ্গে তার প্রজাতি সত্তার (Species being) বিচ্ছিন্নতা: মানুষ হিসেবে ব্যক্তির পরিচয় এখানেই যে, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন-ভাবে প্রকৃতিরাজ্যের রূপান্তর ঘটিয়ে তার শ্রমশক্তিকে তার নিজের ও সমাজের সার্বিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। এক কথায়, ব্যক্তি তার সৃষ্টি-শীলতার তাগিদে শ্রমক্ষমতার সর্বোৎকৃষ্ট প্রয়োগ করতে সক্ষম। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক যেহেতু পুঁজিপতির আজ্ঞাবহ দাস মাত্র, সে তার সৃষ্টিশীল শ্রমের স্বাধীন প্রয়োগ থেকে হয় বঞ্চিত, যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে তার নিজের আত্মিক, মানবিক প্রজাতি সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

॥ ৩ ॥

তরুণ মার্কস ও বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক বিতর্ক

১৮৪৪ সালে রচিত মার্কসের "প্যারিস পাণ্ডুলিপি" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন সংস্করণে মার্কসের তরুণ বয়সের এই উল্লেখযোগ্য রচনাটি প্রকাশিত হতে শুরু করে ও "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"কে কেন্দ্র করে অল্পদিনের মধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ

বিতর্কের সূচনা হয়। সাম্প্রতিককালে এই বিতর্ক আরও ব্যাপ্তি লাভ করেছে। এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হল ১৮৪৪ সালের "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে ও তার পূর্ববর্তী রচনায় মার্কসের বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের বিশ্লেষণ। পশ্চিমের "মার্কস বিশেষজ্ঞদের" মত হল, "প্যারিস পাণ্ডুলিপিতে" যেহেতু ব্যক্তির শ্রম-বিচ্ছিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটি মার্কস গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ও যেহেতু মার্কসের পরবর্তীকালের রচনায়, বিশেষতঃ তাঁর "ক্যাপিটালে", "বিচ্ছিন্নতা" কথাটি অনুচ্চারিত, সেহেতু মার্কসকে দেখা উচিত তাঁর স্ববিরোধিতার আলোকে। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, "প্যারিস পাণ্ডুলিপির" তরুণ মার্কস ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন মানব-দরদী, কারণ সেখানেই আমরা দেখি বিচ্ছিন্নতাবোধ, ব্যক্তির যন্ত্রণাবোধ সম্পর্কে মার্কসের গভীর মানবিক সচেতনতা; পক্ষান্তরে "ক্যাপিটাল" রচয়িতা পরিণত বয়সের মার্কসের মধ্যে সেই বিচ্ছিন্নতাবোধ, সেই মানবতাবোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সেখানে মার্কস মূলতঃ একজন অর্থনীতিবিদ্ ও ঐতিহাসিক, তিনি ব্যাপৃত শ্রেণী বিশ্লেষণ নিয়ে, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা নিয়ে নয়। অতএব, এই যুক্তি অনুসারে মার্কসবাদ একটি খণ্ডিত দর্শন মাত্র, কারণ মার্কস নিজে একটি খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব,—তরুণ মার্কস ও পরিণত মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী পরস্পর-বিরোধী। এই বক্তব্যের ভিত্তিতে বলা হয়ে থাকে যে মার্কসবাদের মূল কথা হল মানবতাবাদ, আর সে কারণেই ১৮৪৪ সালের তরুণ মার্কসই হলেন প্রকৃত মার্কস ও মার্কসের প্রথম পর্বের রচনাতেই আছে মার্কসবাদের প্রকৃত প্রতিফলন। "ক্যাপিটালে" যে মার্কসবাদের পরিচয় আমরা পাই, সেখানে শ্রেণীবিশ্লেষণ ও সমাজ ইতিহাসের ব্যাখ্যার গুরুভারে ব্যক্তি অবলুপ্ত। সুতরাং মার্কসবাদের প্রকৃত অর্থকে অনুধাবন করতে হলে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে "ক্যাপিটালে"র পাতায় নয় বা পরিণত মার্কসের রচনার দিকে নয়; আমাদের পাঠ করতে হবে তরুণ মার্কসের রচনাবলীকে, বিশেষতঃ "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"কে। এই তত্ত্বের বিরোধীরা দাবি করেন যে, মার্কস ও মার্কস-বাদকে এই ধরনের স্ববিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখাটা সম্পূর্ণ ভুল ও এই জাতীয় চিন্তা মার্কসবাদ, মার্কসীয় বিপ্লবী দর্শন ও ঐতিহ্যের বিরোধী। এঁদের মতে, মার্কস ও মার্কসবাদ অভিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন। এ কথা অনস্বীকার্য যে মার্কসের সামগ্রিক চিন্তা বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে চরম পরিণতি লাভ করেছিল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে একটি স্তর তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী

স্তরের বিরোধী। তার অর্থ দাঁড়ায় এটাই যে, একটি স্তর তার পূর্ববর্তী স্তরের অসম্পূর্ণতার পরিপূরক। সে অর্থে মার্কসের "ক্যাপিটাল"-এর সামগ্রিক গুরুত্ব "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"র তুলনায় অনেক বেশী, কারণ "ক্যাপিটালে"ই মার্কস তাঁর তরুণ বয়সের রচনার অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে চূড়ান্ত পরিণতির শিখরে পৌঁছেছেন। তাই "তরুণ মার্কস" বনাম "পরিণত মার্কস" বা "প্যারিস পাণ্ডুলিপি" বনাম "ক্যাপিটাল" জাতীয় তত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্ত সাম্প্রতিককালের এই গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে বিবাদমান দুই শিবিরের মধ্যে কোন পক্ষের অবস্থান সঠিক, তার ধারণা করতে হলে উভয় পক্ষের মতামত ও যুক্তিগুলির একটি সম্যক বিশ্লেষণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন।"

যাঁরা মনে করেন যে, তরুণ মার্কসের রচনাই প্রকৃত মার্কসবাদের পরিচায়ক, কারণ বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের বিশ্লেষণই হল মার্কসের প্রকৃত অবদান, তাঁরা মূলতঃ দুই ধরনের যুক্তি উপস্থাপিত করেন। প্রথমতঃ, এরিখ্ ফ্রম্ (Erich Fromm), ম্যাক্সিমিলিয়েন রুবেল (Maximilien Rubel), জাঁ হিপ্পোলিৎ (Jean Hyppolite), পিয়ের বনেল (Pierre Bonnel), ই ফেট্‌শার (I. Fetscher), এস. আভিনেরি (S. Avineri), পিয়ের বিগো (Pierre Bigo), এল. কোলাকোভস্কি (L. Kolakowski) প্রমুখ তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, মার্কস পরিণত বয়সে যা রচনা করেছেন, তা মূলতঃ তাঁর তরুণ বয়সের হেগেলীয় চিন্তার সম্প্রসারণ মাত্র। যেমন, ফ্রম্-এর মতে, "প্যারিস পাণ্ডুলিপি" ও "ক্যাপিটাল" উভয় গ্রন্থের রচয়িতা মার্কসের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটি, যার মূল ধারণাটিকে তিনি ১৮৪৪ সালেই বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই মত অনুযায়ী "ক্যাপিটাল" মৌলিক কোন তাৎপর্য দাবি করতে পারে না। একই মত পোষণ করেন রুবেল, যাঁর ধারণা, "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে যে আলোচনাটি আমরা পাই, সেটিই

পরবর্তীকালে মার্কসের চিন্তাজগতের দিশারী হয়ে দাঁড়ায়। তার এবং ওপরে উল্লেখিত অন্যান্য তাত্ত্বিকদের মত হল, শ্রমবিচ্ছিন্নতার ধারণাই মার্কসের পরবর্তীকালের সব বিশ্লেষণের একমাত্র চাবিকাঠি। এঁদের বক্তব্যের মূল কথাটি হল যে, মার্কস প্রকৃত অর্থে ছিলেন হেগেলীয় ভাবাদর্শে প্রভাবিত। হেগেলের দর্শন থেকেই মার্কস গ্রহণ করেছিলেন তার বিচ্ছিন্নতার ধারণাটি এবং এই হেগেলীয় ধারণাটি প্রথম বিধৃত হয় "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে, যেটি পরিণতি লাভ করে "ক্যাপিটালে"। হেগেলের দর্শনের মূল ভিত্তি ছিল আত্মার (Spirit) বিচ্ছিন্নতা ও এই বিচ্ছিন্নতার সমাধান হেগেল খুঁজে-ছিলেন তার নৈর্ব্যক্তিক দর্শনে। মার্কসের কাছেও মূল প্রশ্নটি ছিল মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও ১৮৪৪ সাল থেকে "ক্যাপিটালের রচনা কাল পর্যন্ত তার উদ্দেশ্য ছিল বিচ্ছিন্নতার উৎস সন্ধান করা ও তার অবসান ঘটান। এই ধারণার ওপরে ভিত্তি করেই এক পক্ষের তাত্ত্বিকরা সিদ্ধান্তে আসেন যে, মার্কসের পরিণত বয়সের রচনা তার তরুণ বয়সের হেগেলীয় চিন্তারই পরিবর্ধন মাত্র। এই 'হেগেলীয় মার্কস" তত্ত্বের প্রথম উদ্গাতা ছিলেন জোহান প্লেঙ্গে (Johann Plenge), যিনি "প্যারিস পাণ্ডুলিপি' প্রকাশনের বহু পূর্বে ১৯১১ সালে এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, হেগেলই হলেন মার্কসের চিন্তাবিন্দু ও হেগেলীয় চিন্তাই মার্কসের মধ্য দিয়ে নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর চরম পরিণতি আজ দেখা যায় ক্যাথলিক তাত্ত্বিক বিগোর চিন্তার মধ্যে, যিনি মনে করেন যে মার্কসের 'ক্যাপিটাল" হেগেলের Phenomenology of Mind এর একটি রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা মাত্র।

এঁদের যুক্তির তাৎপর্যটি দাঁড়ায় এই রকম। প্রথমতঃ, তরুণ মার্কসের রচনার মধ্যেই যেহেতু পরিণত মার্কসকে পাওয়া যায়, সেহেতু পরিণত মার্কসের রচনার কোন মৌলিক গুরুত্ব নেই। অতএব, পরিণত মার্কসের রচনাগুলি, বিশেষতঃ "ক্যাপিটাল", স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি করে না। এক কথায়, তরুণ মার্কসই প্রকৃত মার্কস। দ্বিতীয়তঃ, মার্কসবাদের মূল কথা যেহেতু ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ ও মানবিকতা ও তরুণ মার্কসই যেহেতু প্রকৃত মার্কস, সেহেতু মার্কসবাদের প্রকৃত অর্থ হল মানবতাবাদ, যার স্বাক্ষর বহন করছে তরুণ মার্কসের বিচ্ছিন্নতা বিষয়ক রচনাগুলি।

তরুণ মার্কসই প্রকৃত মার্কস,—এই যুক্তির জের টেনে পশ্চিমী তাত্ত্বিকরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে দ্বিতীয় একটি যুক্তি হাজির করেন, যার পরিণতিতে

আমরা দেখি "তরুণ বনাম পরিণত মার্কস", বা "দুই মার্কস" বা "মার্কস বনাম মার্কস" জাতীয় তত্ত্বের উদ্ভাবন। ত্রিশের দশকে এই ধারণাটিকে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এস. লানড্‌সহুট ও জি. মায়ার (S. Landshut ও G. Mayer) এবং দ্য মাঁ (De Man)। পরবর্তীকালে এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন ড্যানিয়েল বেল (Daniel Bell), রবার্ট টাকার (Robert Tucker) প্রমুখ মার্কিনী "মার্কস বিশেষজ্ঞরা"। এঁদের বক্তব্য হল যে, তরুণ মার্কসের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুটি হল বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন; পরিণত মার্কসের রচনার বিষয়বস্তু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ। এর ফলে মার্কসের পরবর্তীকালের রচনা মানবিকতা বা মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত নয় মানবদরদী তরুণ মার্কস তাঁর পরবর্তী রচনায় অনুপস্থিত সেখানে আমরা দেখি শ্রেণীবিশ্লেষণের প্রবক্তা ইতিহাসবিদ্, অর্থনীতিবিদ মার্কসকে। সেখানে ব্যক্তির বদলে গুরুত্ব লাভ করেছে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু মার্কসবাদের মূল কথা যেহেতু মানবতাবাদ, সেহেতু "পরিণত মার্কস" "তরুণ মার্কস"-এর বিরোধী, অর্থাৎ পরিণত মার্কসকে বর্জন করে, "ক্যাপিটাল"কে উপেক্ষা করে, একমাত্র তরুণ মার্কস ও "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"কে গ্রহণ করেই মার্কসবাদের প্রতি প্রকৃত নিষ্ঠাবান হওয়া সম্ভব।

"দুই মার্কস'-এর তত্ত্বকে কেন্দ্র করে যাঁরা তরুণ মার্কসের রচনাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তাঁদের মতামতের বিরোধীদের মূলতঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে এঁদের বক্তব্যের মধ্যে নৈকট্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী শুধু ভিন্ন নয়, পরস্পরবিরোধীও বটে। এঁদের মধ্যে আপাতমিল শুধু একটি বিষয়ে, সেটি হল এই যে, এরা "দুই মার্কসে"র তত্ত্বে বা "তরুণ বনাম পরিণত মার্কসে"র তত্ত্বে বিশ্বাসী নন এবং মনে করেন যে মার্কসবাদ অবিচ্ছিন্ন এবং "তরুণ" ও "পরিণত" মার্কসের মধ্যে, অর্থাৎ, "প্যারিস পাণ্ডুলিপি" ও "ক্যাপিটালে"র মধ্যে কোন বিরোধ নেই ১৮৪৪ পর্বের রচনাই মার্কসবাদের প্রকৃত পরিচায়ক বা "ক্যাপিটাল" মার্কসবাদের মূল চরিত্রের বিরোধী এই জাতীয় তত্ত্বে এঁরা আস্থাভাজন নন। কিন্তু উভয় পক্ষের এই মিল একান্তই বাহ্যিক। দুই পক্ষের বিশ্লেষণের মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রথম মতটির প্রবক্তা ম্যানডেল (Mandel), মেজারোস্ (Meszaros) প্রমুখ পণ্ডিতরা। এঁরা মনে করেন, মার্কসের চিন্তা খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন নয়,

তরুণ ও পরিণত মার্কসের চিন্তার মধ্যে শুধু যে সঙ্গতি আছে তা নয়, উভয়ের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা আছে। সেই ধারাবাহিকতার কেন্দ্র-বিন্দুটি হল মার্কসের বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব "দুই মার্কস" তত্ত্বের প্রবক্তাদের সঙ্গে এঁদের বক্তব্যের তফাৎটি হল এখানে যে, এঁদের মতে বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের সার্থক, ঐতিহাসিক ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনাটি খুঁজে পাওয়া যাবে German Ideology-তে ও পরিণত মার্কসের রচনায়, যেমন Grundrisse ও "ক্যাপিটাল"-এ, অর্থাৎ, বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বই মার্কসবাদের মূল কথা; তার সূচনা হয়েছিল তরুণ মার্কসের রচনার মধ্যেই; কিন্তু "প্যারিস পাণ্ডুলিপি" বা চল্লিশের দশকের প্রথম পর্বের রচনাই সে আলোচনার শেষ কথা নয়। তরুণ মার্কস পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটি নিয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তার সামগ্রিক রূপ তিনি দিতে পেরেছিলেন তাঁর পরিণত বয়সের রচনায় বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের ঐতিহাসিক ও শ্রেণীগত পরিমণ্ডলটি ব্যাখ্যা করে।

দ্বিতীয় মতটির প্রবক্তা সোভিয়েত ইউনিয়নের ওইজারমান (Oizerman), লাপিন (Lapin), গণতান্ত্রিক জার্মানীর ভোলফ্‌গাং ইয়ান্‌ (Wolfgang Jahn), মানফ্রেড বুহ্‌র (Manfred Buhr), ফরাসী মার্কসবাদী পণ্ডিত ওগুস্ত্‌ করনু (Auguste Cornu), লুই আলথুসে (Louis Althusser) প্রমুখেরা। "তরুণ মার্কস" ও "পরিণত মার্কসের" চিন্তার ধারাবাহিকতার তত্ত্বকে গ্রহণ করে এঁরা মূলতঃ দুটি স্বতন্ত্র যুক্তির ভিত্তিতে এঁদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রথমতঃ, এঁরা প্রত্যেকেই মনে করেন যে মার্কস তাঁর তরুণ বয়সের রচনাতেই, এমন কি প্রাক্-১৮৪৪ পর্বের লেখাতেও, হেগেলের প্রভাবকে কাটিয়ে উঠেছিলেন। ওইজারমান এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, যাঁরা "হেগেলীয় মার্কস" তত্ত্বের ধারকবাহক, তাঁরা ভুলে যান যে, ১৮৪৪ সালের "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তেই Critique of Hegelian Dialectic and Philosophy as a Whole প্রবন্ধে মার্কস হেগেলীয় দর্শনের একটি বস্তুবাদী, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ওইজারমানের গবেষণাকে অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে মার্কসের বিশ্লেষণ ছিল একাধারে কল্পনাবিরোধী (anti-Speculative) ও বস্তুবাদী। এগুলি এমনই বৈশিষ্ট্য যা হেগেলীয় দর্শনের বিরোধী। আলতুসের বিশ্লেষণে এ কথা আরও প্রমাণিত যে, মার্কসের প্রথম পর্বের রচনায় লক্ষণীয় ছিল হেগেলের

নয়, ফয়েরবাখের প্রভাব। এক কথায়, এঁদের মতে হেগেলের ভাববাদকে বর্জন করে, হেগেলের চিন্তার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেই তরুণ মার্কসের পরিণত মার্কসে উত্তরণ ঘটেছিল, অর্থাৎ মার্কসের চিন্তার ধারাবাহিকতার অন্যতম সোপানটি ছিল হেগেলবিরোধিতা।

এঁদের দ্বিতীয় যুক্তিটি হল যে, "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে তরুণ মার্কস বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বের আলোচনার যে সূত্রপাতটি করেছিলেন, সেটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও মার্কসের চিন্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে, বিচ্ছিন্নতাই মার্কসবাদের মূল প্রশ্ন নয়, মূল প্রশ্নটি হল, কোন ধরনের উৎপাদন (= শ্রেণী) সম্পর্ক এই বিচ্ছিন্নতাবোধের বাস্তব পরিমণ্ডলটি সৃষ্টি করে, তার বিশ্লেষণ করা। বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মার্কস উপলব্ধি করেন যে, এর উৎসটিকে অনুসন্ধান করতে হবে পুঁজিবাদী সমাজের বস্তুনিষ্ঠ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, বিমূর্ত মানবতাবাদী দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। অর্থাৎ, ১৮৪৪ সালে মার্কসের কাছে যেটি ছিল মূল প্রশ্ন, তা পরবর্তীকালের নতুন প্রশ্নের বাস্তব ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল ও সেই অর্থে তথাকথিত "পরিণত" ও "তরুণ" মার্কসের চিন্তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তরুণ মার্কসের কাছে মূল প্রশ্নটি ছিল যে, বিচ্ছিন্নতার উৎসটি কোথায় নিহিত। এই প্রশ্নের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি চিহ্নিত করলেন পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে এবং তারই সূত্র ধরে মার্কস মনোনিবেশ করলেন পুঁজিবাদী শ্রেণী সম্পর্কের জন্ম দেয় যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা তার বিশ্লেষণে, অর্থাৎ, পুঁজিবাদী সমাজে বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটির আলোচনা পদ্ধতিগতভাবেই পুঁজিবাদী শ্রেণীসম্পর্কের বিশ্লেষণের সঙ্গে মার্কসের চিন্তার বিকাশে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বের আলোচনা ও "ক্যাপিটাল"-এ পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর ব্যাখ্যা দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে অন্বিত ; একদিকে "ক্যাপিটাল" "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"র সঙ্গে ধারাবাহিকতার স্রোতে যুক্ত, কারণ "ক্যাপিটাল"-এর মূল প্রশ্নের প্রাথমিক ভিত্তি মার্কস রচনা করেছিলেন "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে ; অপরদিকে "ক্যাপিটাল" "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"র সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে মার্কসের চিন্তাকে চরম পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছিল, কারণ "ক্যাপিটাল"-এর শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে ছিল অনুপস্থিত। মানডেল এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটির তাৎপর্যটি অনুধাবন না করে মন্তব্য করেছেন যে, আলতুসে

প্রমুখেরা "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"র গুরুত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বের গুরুত্বটি বুঝতে অক্ষম হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে এমিলি বত্তিগেল্লি (Emile Bottigelli) কর্তৃক টীকাসহ অনূদিত "প্যারিস পাণ্ডুলিপি" প্রসঙ্গে আলতুসের বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "প্যারিস পাণ্ডুলিপি" মার্কসের পূর্ববর্তী রচনার তুলনায় একটি সুনির্দিষ্ট প্রগতিশীল পদক্ষেপ, কারণ এখানেই মার্কস প্রথম অস্পষ্টভাবে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটিকে শ্রমের বিচ্ছিন্নতার, অর্থাৎ, অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছিলেন; মার্কস একই সঙ্গে উপলব্ধি করেন যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার গোড়ায় যে অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ছাড়া শ্রমের বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটির সমাধান সম্ভবপর নয়। সেদিকে থেকে বিচার করলে আলতুসে প্রমুখেরা "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"র গুরুত্বকে আদৌ ছোট করে দেখেননি। বরং এখানেই যে মার্কস তার পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে অর্থনীতি নিরপেক্ষ যে বিশ্লেষণ করেছিলেন, তা থেকে ভিন্ন কিন্তু তখনও অস্পষ্ট, অর্ধোচ্চারিত নতুন এক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন আলতুসে ও অন্যান্য অনেকেই তার গুরুত্বকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়েছেন। আলতুসে এ কথাই বলেছেন যে, "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে মার্কস যে প্রশ্নটি তুলেছিলেন, তাকে একটি নতুন পরিপ্রেক্ষিত দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল পরিণত মার্কসের রচনায়, যথা Grundrisse (১৮৫৭-৫৮) ও "ক্যাপিটাল"-এ (১৮৬৭), কারণ বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটির পিছনে লুকিয়ে ছিল আরও বড়, আরও জটিল এক প্রশ্ন, যার উত্তর খুঁজতেই "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"র মানবতাবাদী মার্কসের উত্তরণ ঘটেছিল "ক্যাপিটাল" রচয়িতা অর্থনীতিবিদ্ মার্কসে এবং এই প্রক্রিয়ার পরিণতিতেই আমরা পেলাম মার্কস স্বষ্ট মার্কসবাদকে। আলতুসে এই প্রসঙ্গে সঠিক মন্তব্যই করেছেন যে, মার্কসবাদ হল তত্ত্বগত-ভাবে মানবতাবিরোধী. অর্থাৎ "ক্যাপিটাল"-এ মার্কস যে বিজ্ঞানসম্মত, বস্তুনিষ্ঠ পরিপ্রেক্ষিতের জন্ম দিলেন, তার সঙ্গে বিমূর্ত, নীতিশাস্ত্রভিত্তিক মানবতাবাদের কোন তাত্ত্বিক সম্পর্ক নেই।

সাম্প্রতিককালের এই বিতর্কের দিকে লক্ষ্য করলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, "তরুণ" বনাম "পরিণত" মার্কস জাতীয় তত্ত্বের তাৎপর্যটি কোথায়? প্রথমতঃ, এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই ধরনের তত্ত্বকে গ্রহণ করার অর্থ হবে মার্কসবাদকে তার শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচ্ছিন্ন করে

দেখা, অর্থাৎ, মার্কসবাদ যে সমাজকে বদলে দেবার একটি তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক হাতিয়ার, তাকে অস্বীকার করে "তরুণ মার্কসই প্রকৃত মার্কস" জাতীয় তত্ত্ব। দ্বিতীয়ত:, বিচ্ছিন্নতাই মার্কসবাদের মূল প্রশ্ন, এই কথা বলার অর্থও একটাই। সেটি হল "ক্যাপিটাল"-এর গুরুত্বকে অস্বীকার করা, অর্থাৎ শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গীকে উপেক্ষা করে মার্কসের প্রকৃত বৈপ্লবিক অবদানকে অস্বীকার করা। এই প্রসঙ্গে যেটি লক্ষণীয় সেটি হল যে, মানডেল, মেজারোস্ প্রমুখেরা আপাতদৃষ্টিতে ও পদ্ধতিগত দিক থেকে ধারাবাহিকতাতত্ত্বের বাহক হয়েও শেষ পর্যন্ত তাঁরা প্রকৃতপক্ষে "দুই মার্কস" তত্ত্বের উদ্গাতাদের সঙ্গেই মিলিত হয়েছেন, এদের চিন্তার শেষ পরিণতি হল বিচ্ছিন্নতাকেই মার্কসবাদের মূল প্রশ্নরূপে চিহ্নিত করা ও "ক্যাপিটাল"-এর গুরুত্বকে স্বীকার করেও তার শ্রেণী পরিপ্রেক্ষিতকে উপেক্ষা করা, অর্থাৎ, মার্কসবাদের মূল বৈপ্লবিক উপাদানটিকেই অস্বীকার করা।

মার্কসবাদের মূল কথাটি হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, যার ভিত্তিতে মার্কস-এঙ্গেলস্ রচনা করেছিলেন পুঁজিবাদকে বিশ্লেষণের জন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও যা থেকে উৎসারিত হয়েছিল পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার জন্য রাষ্ট্র ও বিপ্লবসংক্রান্ত রাজনৈতিক তত্ত্ব ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিটি ছিল বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব; কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে না,—তাকে অতিক্রম করে সৃষ্টি করে এক বৈপ্লবিক সমাজদর্শন। তাই "প্যারিস পাণ্ডুলিপি' থেকে German Ideology (১৮৪৬), "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" (১৮৪৮), Grundrisse (১৮৫৭-৫৮) ও "ক্যাপিটাল" (১৮৬৭)-এ ক্রমান্বয়ে উত্তরণ-প্রক্রিয়ায় মার্কসের বিশ্লেষণপদ্ধতি, মার্কসের ভাষা, মার্কসের শব্দচয়ন ও সর্বোপরি তাঁর বিশ্লেষণ ছিল ১৮৪৪ পর্বের রচনার তুলনায় অনেক বেশী অর্থবহ ও তাৎপর্যমণ্ডিত

পঞ্চম অধ্যায়

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (১)

সমাজে অবিচার, অসাম্য ও শোষণের মূল কারণগুলি নিহিত রয়েছে মানুষের ইতিহাসের মধ্যে,—এই বোধ ও সচেতনতা জন্ম দিয়েছিল ঐতিহাসিক বস্তুবাদের। পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার উৎস খুঁজতে মার্কস-এঙ্গেলস্‌কে বিশ্লেষণ করতে হয়েছিল মানুষের ইতিহাসের ভিত্তিমূলকে; সমাজ ও ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ব্যাখ্যারই অপর নাম ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। মার্কস-এঙ্গেলসের ইতিহাসচেতনার মৌলিকত্ব কোথায়, বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বৈপ্লবিক তাৎপর্যই বা কি, তাকে বোঝার জন্য প্রথমে প্রয়োজন প্রাক্-মার্কসীয় ইতিহাসব্যাখ্যার স্বরূপটিকে অনুধাবন করা, কারণ মার্কস-এঙ্গেলসের ইতিহাস বিশ্লেষণ পদ্ধতিগত দিক থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মার্কসীয় ইতিহাসব্যাখ্যা একাধারে বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানভিত্তিক, যে দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের পূর্বসূরীদের মধ্যে ছিল অনুপস্থিত :

প্রাচীন গ্রীসে একাধিক দার্শনিকের ধারণা ছিল যে, সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনের নিয়ন্তা হলেন বিভিন্ন দেবদেবী। মধ্যযুগে সেন্ট্ টমাস্ এ্যাকুইনাস্ এই মত পোষণ করতেন যে, স্বাধীনতা, দাসত্ব, রাষ্ট্রশক্তি, সামাজিক অসাম্য সব কিছুরই মূলে আছেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। এই ধরনের অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যার পাশাপাশি ইতিহাসকে বোঝার আরও এক ধরনের পদ্ধতি সুদূর অতীতকাল থেকে মার্কসের সময় পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল, যদিও এই ব্যাখ্যাটিও ইতিহাসের মূল অর্থকে বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীসের বস্তুবাদী দার্শনিক ডেমোক্রিটাস পিথাগোরাসের ঈশ্বরভিত্তিক ইতিহাসব্যাখ্যার বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন যে, বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে সমাজজীবনের ক্রমবিকাশ ঘটে। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের প্রাক্-বিপ্লব পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হেলভেসিয়াস্ (Helvetius) মানুষের সমাজের আদিম অধ্যায় থেকে আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্যের স্তরে উত্তরণকে বাস্তব প্রয়োজনের ফলশ্রুতি বলে বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর সময়ের অপর এক দার্শনিক দিদেরো (Diderot) মনে করতেন যে, মানুষের জীবনধারার পরিবর্তনের জন্য

প্রয়োজন তার সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন, যদিও তাঁর চোখে এই পরিবর্তনের অর্থ ছিল ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্ রুশোর ধারণা ছিল যে, সমাজে অসাম্যের মূল কারণটি নিহিত আছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের মধ্যে। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের প্রকৃত ঐতিহাসিক কারণ তিনি নির্দেশ করতে পারেননি। অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গিজো (Guizot), মিনিয়ে (Mignet) প্রমুখ ইতিহাসবিদরা সমাজবিবর্তনের বিভিন্ন পর্বকে সংঘাত-পূর্ণ শ্রেণীদ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি রূপে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই শ্রেণীর চরিত্র বিশ্লেষণ বা ইতিহাসে শ্রেণীর উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেননি। এক কথায়, ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তিটি কি, মানব ইতিহাসের প্রকৃত রূপকার কে, সামাজিক বিবর্তনের মূল অর্থই বা কি, এ সব প্রশ্নের কোন সুস্পষ্ট, বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রাক্-মার্কসীয় চিন্তাবিদরা দিতে পারেননি। উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমিক আন্দোলনের উত্থান ও প্রসার, একাধিক প্রগতিশীল মতবাদের উন্মেষ, অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তিটি প্রস্তুত করেছিল।

॥ ১ ॥

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মূলে ছিল সমাজ পরিবর্তনের বাস্তব ভিত্তির অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ। মার্কসের রচনায় এই আলোচনার প্রাথমিক সূত্রপাত হয়েছিল বিচ্ছিন্নতার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ১৮৪৪ সালের "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে। এই "পাণ্ডুলিপি"র অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নের সামাজিক ভিত্তিটিকে চিহ্নিত করা, যদিও সেই বিশ্লেষণ ছিল অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ। "প্যারিস পাণ্ডুলিপি" রচনার অব্যবহিত পরেই ১৮৪৫ সালে মার্কস-এঙ্গেলস্ তাঁদের যুগ্ম রচনা The Holy Family-তে ও তার পরে ১৮৪৬ সালে তাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণা গ্রন্থ The German Ideology-তে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল বক্তব্যটিকে উপস্থাপিত করেন। তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমরা পাই মার্কস-এঙ্গেলসের পরবর্তী রচনা "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো"তে (১৮৪৮), মার্কসের একক রচনা Grundrisse

(১৮৫৭-৫৮), Preface to the Contribution to the Critique of Political Economy (১৮৫৯), "ক্যাপিটাল" (১৮৬৭) ও পঞ্চাশের দশকে রচিত মার্কসের একাধিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে। অধ্যাপক ওইজারমান (Oizerman) দেখিয়েছেন যে, German Ideology-তে মার্কস-এঙ্গেলস্ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল বক্তব্যকে প্রথম সুনির্দিষ্ট রূপ দেখার চেষ্টা করেন। "প্যারিস পাণ্ডুলিপি"তে যে ধারণা-মৌলগুলি (Categories) ছিল অনুপস্থিত, প্রথমে Holy Family ও পরে German Ideology-তে তাদের উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ধারণা-মৌলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদন সম্পর্ক প্রভৃতি। সমাজবিকাশের ইতিহাস সৃষ্ট হয়েছে কোন অতিপ্রাকৃত ঐশ্বরিক শক্তির ইচ্ছায় নয়, বা কোন ব্যক্তির একক স্বাধীন চেষ্টাতেও নয়; ইতিহাস হল উৎপাদনব্যবস্থায় ব্যক্তি ও তার বিষয়গত পরিস্থিতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিকাশের ফলশ্রুতি। এই ধারণাটির বিশ্লেষণের মধ্যেই নিহিত আছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল বক্তব্য ও সূত্রাবলী।

প্রথমতঃ, মানবের উদ্ভবের অন্যতম পরিণতি হল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা। এই সমাজজীবনকে মানুষ সৃষ্টি করে তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে ও সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের পূর্বশর্তগুলিকে বাস্তবায়িত করে, যার অর্থ আহার, বাসস্থান ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে প্রতিকূল পরিবেশকে আয়ত্তাধীন করা। জীবজগতের সঙ্গে মানবজগতের এখানেই অন্যতম প্রভেদ, কারণ অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে কোন সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। মানুষের পক্ষেই তা করা সম্ভব, কারণ মানুষই একমাত্র প্রাণী যে সৃষ্টিশীল শ্রমক্ষমতার অধিকারী। মার্কসের অবদান এখানেই যে, তিনি দেখালেন, ব্যক্তি তাঁর শ্রমের মাধ্যমে বাস্তব পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে একটি সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। এক কথায়, ব্যক্তি তাঁর শ্রমশক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে দু'টি কাজ একই সঙ্গে সম্পাদিত করে। প্রথমতঃ, শ্রমের মাধ্যমেই ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমের প্রয়োগের মাধ্যমেই ব্যক্তি তার পরিবেশকে পরিবর্তন করে মানুষ হিসেবে তার নিজের ক্ষমতা ও সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে সচেতন হয়। তার অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য প্রাণীদের শ্রমক্ষমতা নেই। কিন্তু মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর শ্রমের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়, যার ওপরে ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মানুষই একমাত্র প্রাণী

যে সচেতনভাবে বাস্তব পরিবেশের পরিবর্তন করে সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারে। অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে তা করা অসম্ভব ও তার ফলে তাদের পক্ষে ইতিহাস সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে শ্রমসংক্রান্ত এই মৌলিক পার্থক্যগুলিকে তাই চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, মানুষই একমাত্র প্রাণী যে তার শ্রমশক্তি প্রয়োগ ও বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম, অন্যান্য প্রাণীরা শ্রমশক্তির মাধ্যমে পরিবেশকে ব্যবহার করতে পারে মাত্র, তার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য প্রাণীরা প্রাকৃতিক পরিবেশকে ব্যবহার করে মূলতঃ তাদের শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে (যেমন, খাদ্য আহরণ, শিকার, জলপান প্রভৃতি)। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে পরিবেশের পরিবর্তনে তার শারীরিক ক্ষমতার ওপরে শুধুমাত্র নির্ভর করে না। সে তার শারীরিক শক্তি ও মেধার যৌথ প্রয়োগে বিভিন্ন উপকরণ সৃষ্টি করে ও তার প্রয়োগ করে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায় তৃতীয়তঃ, অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে শ্রমের ব্যবহার সম্পূর্ণ ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ও জৈবিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। তাই তারা কোন সৃষ্টিশীল শ্রমপ্রক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে না। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে তার শ্রমশক্তির প্রয়োগে পূর্ব হতেই শ্রমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকে, কারণ মানুষের শ্রমপ্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ততা দ্বারা পরিচালিত নয়,—তা সচেতন, পরিকল্পিত প্রক্রিয়া এই প্রশ্নটির আলোচনায় একটি ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। চেসনোকভ (Chesnokov) দেখিয়েছেন,[1] আপাতদৃষ্টিতে এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটি হল যে, মানুষই একমাত্র প্রাণী যার চৈতন্য (Consciousness) আছে, অর্থাৎ, চেতনাবোধই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্যের মূল কারণ। এই জাতীয় চিন্তা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী ও পরোক্ষভাবে ভাববাদী দর্শনের প্রতিফলন। তিনি সঠিকভাবেই বিচার করে দেখিয়েছেন যে, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্যকে চৈতন্যবোধের উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করলেও এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানুষের চৈতন্যের মূলে রয়েছে তার শ্রমের ব্যবহার, যে ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তার নিজের সামাজিক পরিমণ্ডল

1 D. I Chesnokov, *Historical Materialism*, পৃঃ ৪০।

সৃষ্টি করে। এই শ্রমের ব্যবহারে প্রধান অবদান হল মানুষের মস্তিষ্কের, যেখান থেকে সৃষ্টি হয় তার সৃষ্টিশীল ভাবনার ; অর্থাৎ, সচেতনভাবে শ্রমশক্তি ব্যবহারের মূলে রয়েছে মানুষের মস্তিষ্কের গঠনপ্রকৃতি, যেটি মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনে তাকে তার সৃষ্টিশীল শ্রমশক্তি প্রয়োগ করার সুযোগ দেয়। চতুর্থতঃ, মানুষই একমাত্র প্রাণী যে তার শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনার প্রক্রিয়ায় শ্রমকে একটি সামাজিক রূপ দেয়। মানুষের শ্রমশক্তির প্রয়োগের অন্যতম ফলশ্রুতি হল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা ও তা থেকেই জন্ম নেয় সমাজবিকাশের ধারা। অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে শ্রমকে এই সামাজিক চরিত্র দেয়া সম্ভবপর নয় :

মানুষের শ্রমশক্তির সামাজিক চরিত্রটির বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দ্বিতীয় প্রধান সূত্রটিতে উপনীত হতে পারি। মানুষ তার সৃজনশীল শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে উৎপাদনব্যবস্থার সৃষ্টি করে ও তার মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষ তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে। যেহেতু মানুষ সৃজনশীল শ্রমশক্তির অধিকারী, উৎপাদনপ্রক্রিয়া এই সৃষ্টিশীলতার অভিব্যক্তি। তাই সমাজব্যবস্থার রূপান্তরের প্রশ্নটি উৎপাদনব্যবস্থার বিকাশের প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এক কথায়, সভ্যতার অগ্রগতি, সংস্কৃতির বিকাশ, চিন্তার জগতে পরিবর্তন প্রভৃতি সব কিছুই উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তনের ওপরে নির্ভরশীল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্সে যে বৈপ্লবিক যুক্তিনিষ্ঠ বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেটি ছিল সমকালীন ফ্রান্সে বিকাশমান ধনতান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্কের প্রতিফলন।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তৃতীয় সূত্রটি হল, উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধিত হয়। উৎপাদনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উপাদান হল উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী মানুষ ও মানুষের সঞ্চিত শ্রমশক্তি। এই দুই উপাদানের যোগফলটি হল উৎপাদিকা শক্তি (Forces of production)। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় মানুষের ভূমিকাটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষই উৎপাদনব্যবস্থার মূল কর্তা। কিন্তু মানুষ বলতে শুধুমাত্র কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী মানুষরূপী এক জৈবিক সত্তাকে বোঝায় না। মানুষ বলতে আমরা বুঝি শ্রমশক্তির

সক্রিয় প্রয়োগকর্তা মানুষকে। শ্রমশক্তির ব্যবহারে অক্ষম ব্যক্তিকে উৎপাদিকা শক্তি রূপে চিহ্নিত করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সঞ্চিত শ্রম বলতে শারীরিক ক্ষমতাকে শুধু বোঝায় না। উৎপাদিকা শক্তিরূপে পরিচিত হয় বিশেষভাবে সেই শ্রমশক্তি যা বিভিন্ন হাতিয়ার বা যন্ত্রের উদ্ভাবনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে উৎপাদনব্যবস্থাব অগ্রগতিকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। যেহেতু হাতিয়ার বা যন্ত্রের বিকাশেব মাধ্যমে উৎপাদনব্যবস্থা বিকাশ লাভ কবে, সেহেতু যে কোন উৎপাদনপ্রক্রিয়া সমাজবিকাশের একটি বিশেষ স্তরে গঠিত হাতিয়ার বা যন্ত্রেব গুণগত চরিত্রেব ওপরে নির্ভরশীল। তৃতীয়তঃ, সঞ্চিত শ্রমশক্তি বলতে বোঝায় প্রকৃতিদত্ত বিভিন্ন বস্তুকে, যেগুলি উৎপাদনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ও যেগুলিকে ব্যবহারের জন্য শ্রমের প্রয়োগ করা হয়। যেমন, তেল. প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ সঞ্চিত শ্রমের অন্তর্ভুক্ত, কাবণ এগুলিকে শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে উৎপাদনের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়।

উৎপাদিকা শক্তি বলতে প্রধানতঃ মানুষ ও তার সঞ্চিত শ্রমের (=শারীরিক শ্রম + উৎপাদনের হাতিয়ার, যাকে শ্রমই সৃষ্টি করে + প্রকৃতিদত্ত সম্পদ, যা শ্রমশক্তি প্রয়োগের অপেক্ষায় থাকে) যোগফল বোঝালেও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দুই তাত্ত্বিক কুনো (Cunow) ও কাউট্‌সকি (Kautsky) তৃতীয় একটি উপাদানকে উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁদেব মত ছিল যে, প্রকৃতিরাজ্য সামগ্রিকভাবেই উৎপাদিকা শক্তিব আওতায় পড়ে, কারণ প্রকৃতিদত্ত সব কিছুই শ্রমশক্তির প্রয়োগাধীন। এই বক্তব্যের বিরোধিতা কবে চেসনোকভ সঠিকভাবেই বলেছেন[2] যে, প্রকৃতিকেই উৎপাদিকা শক্তির অন্যতম উপাদানরূপে চিহ্নিত করলে উৎপাদিকা শক্তিকে নির্দিষ্ট কবতে যেটি মূল ভূমিকা পালন করে, অর্থাৎ শ্রম, তাকে উপেক্ষা করা হয়। একটি দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট থাকলেও যদি তাকে যথার্থ শ্রম-প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবহার করা না যায়, তবে সেটি উৎপাদিকা শক্তিরূপে পরিগণিত হতে পারে না। তাই একটি সমাজব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদনের স্বার্থে যতটুকু শ্রমপ্রয়োগাধীন, ততটুকুই সেটি সঞ্চিত শ্রমেব ধারণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতিরাজ্যকে সামগ্রিকভাগে উৎপাদিকা শক্তির অন্যতম উপাদানরূপে চিহ্নিত করার অর্থ হবে উৎপাদিকা শক্তিকে শ্রম-

2. Chesnokov, *Historical Materialism*, পৃঃ ৭৪-৭৫।

নিরপেক্ষ একটি ধারণারূপে স্বীকৃতি দেওয়া। সেক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তি যে প্রাকৃতিক ধারণা নয়, এটি যে মানুষের শ্রম থেকেই উৎসারিত মনুষ্যসৃষ্ট একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ধারণা, এই সত্যটিকেই অস্বীকার করা হবে।

উৎপাদনব্যবস্থার একটি উপাদান যেমন উৎপাদিকা শক্তি, অপব উপাদানটি হল উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় মানুষ শুধুমাত্র প্রকৃতির সঙ্গে শ্রমের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করে না ; সে যেহেতু এককভাবে তার প্রয়োজনীয় সব কিছু উৎপাদন করতে অক্ষম, সেহেতু সে অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হতে বাধ্য হয় উৎপাদনকে ফলপ্রসূ করতে এবং তারই ফলে সে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হয়, যেটি উৎপাদন সম্পর্ক (relations of production) নামে পরিচিত ; অর্থাৎ, প্রকৃতিকে ব্যবহারেব জন্য সম্মিলিত শ্রমশক্তির প্রয়োগে মানুষ আবদ্ধ হয় উৎপাদন সম্পর্কে এবং সেই সম্পর্ক বিষয়গতভাবে, ব্যক্তির ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে, উৎপাদনের সামাজিক প্রয়োজনে ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়।

উৎপাদন সম্পর্কের উপাদানগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, উৎপাদনব্যবস্থা যেহেতু প্রধানতঃ নির্ভর করে সেই পবেব উৎপাদনী শক্তির ওপরে, বিশেষতঃ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির ওপরে, সেহেতু উৎপাদন সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে তার উৎপাদনী উপকরণের সম্পর্কের ওপরে নির্ভরশীল ও মূলতঃ তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দ্বিতীয়তঃ, এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উৎপাদনের উপকরণগুলি যদি মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির কুক্ষিগত হয়, তবে উৎপাদন সম্পর্কটি হবে বৈরদ্বান্দ্বিক, কারণ উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে উৎপাদনের উপকরণের যারা মালিক তাদের ও উৎ-পাদনে অংশগ্রহণকারী অর্থাৎ, মালিক নয় যারা, তাদের সঙ্গে। এক কথায়, উৎপাদনী উপকরণের মালিকানার স্বরূপ নির্ধারিত করবে উৎপাদনী সম্পর্কের সামাজিক-অর্থনৈতিক চরিত্রটিকে, যা থেকে জন্ম নেবে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক। তৃতীয়তঃ উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শুধুমাত্র বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সম্পর্কই নয় ; বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সদস্যদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কও উৎপাদন সম্পর্কের ধারণাটির মধ্যে নিহিত। যেমন, পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদন সম্পর্ক বলতে বোঝায় শুধুমাত্র পুঁজিপতি ও শ্রমিকের বৈর দ্বন্দ্বকে নয় ; শ্রমিকদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহযোগিতা ও শোষণের বিরুদ্ধে

তাদের সম্মিলিত সংগ্রামও পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদন সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কস-এঙ্গেলস্ ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের সমাজব্যবস্থাগুলিকে মূলতঃ দুই ধরনের উৎপাদন সম্পর্কের নিরিখে বিশ্লেষণ করে গেছেন। এর একটি রূপ হল বৈর উৎপাদন সম্পর্ক ও অপরটি হল অবৈর উৎপাদন সম্পর্ক। বৈরসম্পর্ক নির্ভর সমাজব্যবস্থার মূলতঃ তিনটি রূপ ইতিহাসে দেখা গেছে। প্রথমটি হল দাসব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদক অর্থাৎ, দাসরা, এবং উৎপাদনী উপকরণগুলি ছিল দাসমালিকদের নিয়ন্ত্রণে, অর্থাৎ, উৎপাদিকা শক্তির মালিকানা একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর করায়ত্ত থাকায় দাস ও দাসমালিকদের মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কটি ছিল চূড়ান্ত বৈষম্য, শোষণ ও অত্যাচারের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় রূপটি হল সামন্ততন্ত্র দাসভিত্তিক সমাজব্যবস্থার পতনের পর পঞ্চম শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইউরোপে ছিল সামন্ততন্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য। ইতিহাসের এই পর্বে উৎপাদিকা শক্তির একটি অংশ, অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি ছিল সামন্তপ্রভুদের নিয়ন্ত্রণে, অপর অংশ, অর্থাৎ কৃষিতে কর্মরত ভূমিদাসরা ছিল আংশিকভাবে ভূস্বামীদের অায়ত্তাধীন উৎপাদনব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই সামন্তপ্রভুদের নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও উৎপাদন সম্পর্কটি ছিল বৈরদ্বান্দ্বিক, অর্থাৎ ভূমিদাস ও ভূস্বামীদের সম্পর্কের ভিত্তিটি গড়ে উঠেছিল অসাম্য ও শোষণকে ভিত্তি করে এর পরবর্তী স্তরটি হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যার উদ্ভব হয়েছিল মধ্যযুগের শেষে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে ও যা আজও পৃথিবীর একটি বড় অংশকে নিয়ন্ত্রণ করছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলি সম্পূর্ণভাবে পুঁজিপতিদের করায়ত্ত হয় ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সেটি এক চূড়ান্ত রূপ নেয়। অপরদিকে উৎপাদনী শক্তির দ্বিতীয় উপাদান, অর্থাৎ শ্রমিক, আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন হলেও প্রকৃতপক্ষে তার জীবিকানির্বাহের জন্য সে সম্পূর্ণভাবে পুঁজিপতির কাছে তার শ্রমক্ষমতাকে মজুরির বিনিময়ে উৎসর্গ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন সম্পর্ক পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে এক চূড়ান্ত বৈরদ্বন্দ্বের পর্যায়ে উপনীত হয়। এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিচারে ইতিহাসে উৎপাদনী

উপাদানের ব্যক্তিগত মালিকানার তিনটি রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে উঠেছে তিন ধরনের বৈরদ্বান্দ্বিক উৎপাদনী সম্পর্ক।

অপরদিকে উৎপাদনী উপকরণের সামাজিক মালিকানার ওপরে নির্ভর করে ইতিহাসে সৃষ্ট হয়েছে দু' ধরনের অবৈর উৎপাদন সম্পর্ক। দাসব্যবস্থা সৃষ্ট হবার পূর্বে মানবসমাজের প্রথম যে রূপটি আমরা দেখি সেটি ছিল এক ধরনের আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা। সেখানে প্রকৃতির বিরুদ্ধে বাঁচার সংগ্রামে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে বাধ্য ছিল ও ফলে উৎপাদনব্যবস্থায় সমাজের সব সদস্যের অংশগ্রহণ ছিল ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয়। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনী উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না বলে উৎপাদন সম্পর্কটি ছিল সংঘাত নয়, সহযোগিতা ও আদিম সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই সম্পর্কের অপর এক অভিব্যক্তি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। পুঁজিবাদ যে অবৈর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তার বিলোপসাধন করে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় আসে ও ফলে লুপ্ত হয় উৎপাদনী উপাদানের ব্যক্তিগত মালিকানা। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সম্পত্তির যে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তারই সূত্র ধরে অবসান হয় অসাম্য ও শোষণের এবং সমগ্র জনগণের সহযোগিতা ও উদ্যমের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক।

উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদনী সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক যোগসূত্রের ভিত্তিতে সমাজে পরিবর্তন আসে ও এইভাবেই ইতিহাসে আসে গতিশীলতা। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রথমতঃ, ইতিহাসের ব্যাখ্যা কোন নৈর্ব্যক্তিক চিন্তায় ভিত্তিতে করা হয় না; তার একমাত্র উৎস উৎপাদন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী মানুষের সৃষ্টিশীল শ্রমক্ষমতা। দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাস গতিময়; উৎপাদনব্যবস্থার গতিশীল রূপান্তর ইতিহাসে সংযোজন করে গতি। তৃতীয়তঃ, ইতিহাসের গতিমুখের পরিবর্তন হয় সরলরেখায় নয়; উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের এক দ্বান্দ্বিক অন্বয়ের মাধ্যমে এই পরিবর্তন সূচিত হয় আর তার ফলে সৃষ্ট হয় বিপ্লব। এভাবেই ইতিহাসের গতি ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এক দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপটে একসূত্রে গ্রথিত হয়ে যায়।

উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়াটিকে কয়েকটি সূত্রের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। এই বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা মার্কস করেছিলেন তাঁর Preface to the Contribution to the Critique of Political Economy (১৮৫৯) ও 'ক্যাপিটাল'-এর

খসড়া পাণ্ডুলিপি Grundrisse (১৮৫৭-৫৮)-তে। প্রথমতঃ, যেহেতু উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ওপরে নির্ভরশীল, যেহেতু উৎপাদিকা শক্তি হল মূলবস্তু (Content) ও উৎপাদন সম্পর্ক হল তার আঙ্গিক (Form), যার মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটে। উভয়ের সমন্বিত অবস্থাকে বলা হয় উৎপাদন পদ্ধতি (mode of production), অর্থাৎ উৎপাদন পদ্ধতি চিহ্নিত করে দেয় উৎপাদন সম্পর্কের স্তরটিকে। সুতরাং উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক দু'টি পৃথক ধারণা হলেও উভয়ে পৃথকভাবে কোন সমাজ-ব্যবস্থায় বিরাজ করতে পারে না; একটি অপরটির সঙ্গে গভীরভাবে অন্বিত বলেই উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে না।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজের প্রয়োজনে মানুষ তার মস্তিস্ক ও শ্রমশক্তির ব্যবহার করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ঘটায় ও তার ফলে উৎপাদিকা শক্তিও দ্রুত হাবে বিকাশলাভ করে। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, সুদূর অতীতে প্রস্তর যুগে উৎপাদিকা শক্তির যে স্তর ছিল সেটি পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়েছিল ধাতব পদার্থের উদ্ভাবনের যুগে। তার পরের যুগে যন্ত্র, বাষ্পশক্তি ও বিদ্যুৎশক্তির আবিভাব ও আধুনিককালে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার প্রমাণ করে যে উৎপাদিকা শক্তির প্রগতি কখনও থেমে থাকে না। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সমাজব্যবস্থায় উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তন ইঙ্গিত দেয় সমাজ পরিবর্তনের, কারণ উৎপাদিকা শক্তির রূপান্তর উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন সূচিত করে ও তার ফলে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

তৃতীয়তঃ, উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের সামঞ্জস্য সাধনের মাধ্যমে মার্কস দেখিয়েছেন, সমাজের আদিপর্বে উৎপাদিকা শক্তির প্রথম আবির্ভাবেই তার চরিত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক না থেকে সমাজকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়ায়, কারণ ব্যক্তি এককভাবে একটি প্রস্তরখণ্ড বা কাষ্ঠখণ্ড ব্যবহার করতে পারলেও সে সম্পূর্ণভাবে নিজের শ্রমশক্তির ওপরে নির্ভর করে তার নিজস্ব প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদনে অক্ষম। তাই উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন দেখা দিল সম্মিলিত শ্রমশক্তি প্রয়োগের ও এভাবেই উৎপাদিকা শক্তি সামাজিক রূপ নিল। তার পরিণতিতে দেখা দিল উদ্বৃত্ত সম্পদের সৃষ্টি, কারণ যৌথভাবে উৎপাদনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে মানুষ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ উৎপাদন করতে সক্ষম হল।

এই উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টির ফলে এক ধরনের মানুষের মধ্যে দেখা দিল ক্ষমতা প্রয়োগ করে বলপূর্বক তাকে আত্মসাৎ করার প্রবণতা এবং এভাবেই আদিম সাম্যবাদী সমাজের অবৈর উৎপাদন সম্পর্কে ফাটল ধরে জন্ম নিল সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণাটি। ফলে বিকাশমান উৎপাদিকা শক্তির চরিত্র সামাজিক হলেও উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র হয়ে দাঁড়াল ব্যক্তিগত মালিকানা-ভিত্তিক এবং উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের একটি অসম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হল। স্বাভাবিকভাবেই উদ্বৃত্ত সম্পদের অধিকারী যাঁরা তাঁরা নিজেদের স্বার্থে উৎপাদন সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে চান, কিন্তু উৎপাদিকা শক্তি সমাজের বাস্তব ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে উৎপাদন সম্পর্কের স্তরকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলে ; অর্থাৎ, একটি স্থিতিশীল উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে গতিশীল উৎপাদিকা শক্তির চরম বিরোধ উপস্থিত হয় যা অচিরেই এক সংঘাতের রূপ নেয়। সেই সংঘাতে পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ে ও তা থেকে জন্ম নেয় নতুন ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক যা অগ্রসরমান উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে। এর ফলে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার মূলোচ্ছেদ হয় না, কিন্তু উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্রের গুণগত পরিবর্তন ঘটে। ইতিহাসে এভাবেই ধ্বংস ও সৃষ্টি হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার। উৎপাদিকা শক্তির সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক উৎপাদন সম্পর্কের যে সংঘাত সৃষ্টি হয় তার নিরসন ঘটে সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে, যার পরিণতিতে পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙ্গে গিয়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্কের জন্ম হয় ; অর্থাৎ, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই বিকাশ-মান উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে নতুন উৎপাদন সম্পর্কের সামঞ্জস্য সাধিত হয়। মার্কস-এঙ্গেলস্ দেখিয়েছেন, ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই একমাত্র উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে উৎপাদনী সম্পর্কের পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে, কারণ সেখানে উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তির কোন বৈর সম্পর্ক থাকে না। সমাজতন্ত্রই প্রথম একটি ব্যবস্থার জন্ম দেয়, যেখানে সম্পত্তির মালিকানা ন্যস্ত হয় শ্রমিকশ্রেণীর, অর্থাৎ প্রকৃত উৎপাদকের হাতে, কোন সংখ্যালঘু ধনিকগোষ্ঠীর হাতে নয়। প্রাক্-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলিতে উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে (social nature of production) উৎপন্ন সম্পদের

ব্যক্তিগত অধিকরণের (private nature of appropriation) যে সংঘাত পরিলক্ষিত হয়, সমাজতন্ত্রে তার অবসান ঘটে, কারণ যে শ্রমিক উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে, সে নিজেই উৎপাদনী উপকরণের মালিক-রূপে স্বীকৃতি পায় ; অর্থাৎ, উৎপাদনী শক্তির বিকাশ ও উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা উভয়েই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকের সৃষ্টিশীল শ্রমের অভিব্যক্তি।

উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক যোগসূত্রের ভিত্তিতে মার্কস-এঙ্গেলস্ ইতিহাসের যে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা সৃষ্টি করেছেন, তার বিরুদ্ধে পশ্চিমী তাত্ত্বিকরা একাধিক যুক্তি ও বিকল্প তত্ত্বকে দাড় করিয়েছে, যেগুলি সুচিন্তিত আলোচনার দাবি করে।[3] প্রথমতঃ, রেমঁ আরোঁ (Raymond Aron), ওয়াল্ট্ রস্টো (Walt Rostow), ড্যানিয়েল বেল (Daniel Bell) প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ইতিহাসের অগ্রগতি ঘটেছে এককভাবে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে, উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নয়, অর্থাৎ, তাঁদের মতে, মানুষের ইতিহাস হল প্রযুক্তিবিদ্যার রূপান্তরের ইতিহাস। এই জাতীয় ব্যাখ্যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, প্রযুক্তিবিদ্যা বা উৎপাদিকা শক্তির অন্যতম উপাদানটি সমাজজীবন নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে। এই যুক্তিটির জের টেনে তাঁরা বলেন, প্রযুক্তিবিদ্যাই যেহেতু এককভাবে ইতিহাসের নিয়ামক শক্তিরূপে কাজ করে, সেহেতু বর্তমানকালের পৃথিবীতে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ও সমাজতান্ত্রিক জগতের মধ্যে পার্থক্য করার কোন প্রয়োজন হবে না, অর্থাৎ, এঁদের যুক্তি হল যে, প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে উভয় দুনিয়াই যেহেতু সমপর্যায়ে পৌঁছেছে এবং প্রযুক্তিবিদ্যাই যেহেতু ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তি, সেহেতু সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যের কোন তাৎপর্য নেই। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই তত্ত্বটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদন সম্পর্কের প্রশ্নটিকে আলোচনার বাইরে রাখা, কারণ তা না হলে ইতিহাসের এই

জাতীয় "প্রযুক্তিবিদ্যাগত নিয়তিবাদের" (technological determinisim) ব্যাখ্যা দিয়ে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মৌল পার্থক্যটির বিলুপ্তি অন্ততঃ তত্ত্বগত-ভাবে ঘটান যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, উইলিয়াম্ শ (William Shaw) জি. এ. কোহেন (G. A. Cohen) প্রমুখ এক শ্রেণীর গবেষকরা মনে করেন[4] যে, মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যায় উৎপাদিকা শক্তিকে উৎপাদন সম্পর্কের চূড়ান্ত নিয়ামক বলে মনে করেছেন, যদিও তাঁরা এই ধারণাকে "প্রযুক্তিবিদ্যাগত নিয়তিবাদ" বলে মনে করেন না। এঁরা মার্কসের Grundrisse, 'ক্যাপিটাল' প্রভৃতি মৌলিক রচনাগুলি বিশেষ দক্ষতাব সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, উৎপাদন সম্পর্ক যেহেতু উৎপাদিকা শক্তিব ওপরে নির্ভরশীল, সেহেতু ইতিহাসের পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় উৎপাদিকা শক্তির প্রাধান্যকেই মার্কস স্বীকার করেছেন; অর্থাৎ, উৎপাদন সম্পর্ক এককভাবে উৎপাদিকা শক্তি নিভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উইলিয়াম শ মার্কসের দু'টি প্রায় অভিন্ন প্রতিবেদনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এক, উৎপাদন সম্পর্কেব পবিবর্তন সর্বদাই উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তনের পরিণতি, অর্থাৎ, উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন হল উৎপাদিকা শক্তিব পরিবর্তন; দুই, উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তন সর্বদাই উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত করে, অর্থাৎ, উৎপাদন সম্পর্কের রূপান্তরের জন্য উৎপাদিকা শক্তিব পরিবর্তনই যথেষ্ট। এ কথা অবশ্যই সত্য যে মার্কসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তি নির্ভর; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, উৎপাদিকা শক্তি যান্ত্রিকভাবে উৎপাদন সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে এবং উৎপাদন সম্পর্কের কোন প্রভাব উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ওপরে পরিলক্ষিত হয় না। মার্কসের ইতিহাস বিশ্লেষণকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাঁর ব্যাখ্যায় উৎপাদিকা শক্তি মূল নিয়ন্ত্রণকর্তা হলেও উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এই সম্ভাবনার কথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতির ফলে সামন্ততন্ত্রের পতনের পর যখন পুঁজিবাদের আবির্ভাব হল, তখন পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ

উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। আবার তারই ফলে সৃষ্ট হয় নতুন উৎপাদিকা শক্তি যা অচিরেই পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ককে অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক সৃষ্টির পরিস্থিতি সূচিত করে সমাজতন্ত্রে দেখা যায়, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত প্রসারকে ত্বরান্বিত করে, কারণ এখানেই উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের সার্থক সামঞ্জস্য সাধিত হয়। খুব সঠিকভাবেই একাধিক মার্কসবাদী গবেষক বলেছেন[5] যে, উৎপাদিকা শক্তির তুলনায় উৎপাদন সম্পর্ককে নিষ্ক্রিয় বলে মনে হওয়ার অন্যতম কারণ হল, প্রাক্-সমাজতান্ত্রিক সব ব্যবস্থাতেই উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতি হলেও উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনকে বাধা দিয়ে তাকে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা করেছেন উৎপাদনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকর্তারা, তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদিকা শক্তির গতিশীলতার তুলনায় উৎপাদন সম্পর্কের আপাতনিশ্চল চরিত্রকে নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে এক করে দেখা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদন সম্পর্ককে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশলাভে এবং সে কারণেই সমাজতন্ত্রে উৎপাদিকা শক্তির ওপরে উৎপাদন সম্পর্কের প্রভাব গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়।

তৃতীয়তঃ, গর্ডন লেফ (Gordon Leff) এর মত পশ্চিমী তাত্ত্বিকরা উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক যে দু'টি ভিন্ন ধারণা সে সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন, উভয়ের মধ্যে কোন মৌলিক তত্ত্বগত পার্থক্য নেই তাঁর মতে, উৎপাদিক শক্তি যেহেতু আমাদের কাছে সংগঠিত আকারে (organised form) প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ সংগঠিত সম্পর্কের অবস্থা নিরপেক্ষভাবে উৎপাদিকা শক্তিকে যেহেতু চিহ্নিত করা যায় না, ও উৎপাদিকা শক্তির প্রকাশের আঙ্গিকটি হল যেহেতু উৎপাদন সম্পর্ক, সেহেতু উৎপাদিক শক্তি উৎপাদন সম্পর্কের নামান্তর মাত্র ও উভয়ের মধ্যে ধারণা-গত কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। তাঁর মতে, এই দু'টি ধারণা যদি পরস্পর সম্পর্কশূন্য হতে পারে, তবেই উৎপাদিকা শক্তিকে একটি স্বতন্ত্র ধারণা বলে গ্রহণ করা সম্ভব। এই জাতীয় চিন্তা উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করার অক্ষমতার প্রকাশ মাত্র। উৎপাদন

5 *Society and Economic Relations*, পৃঃ ৩৮-৩৯।

সম্পর্কের মূলটি যে নিহিত থাকে উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে এবং উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েও যে তাকে প্রভাবিত করতে পারে, গর্ডন লেফ্-এর চিন্তায় সে ভাবনা অনুপস্থিত।

চতুর্থতঃ, পপার (Popper), মের্লো পন্তি (Merleau Ponty), মারু (Marrou) প্রমুখ তাত্ত্বিকদের মতে সমাজবিকাশের কোন ঐতিহাসিক নিয়ম নেই, কারণ ইতিহাসের অর্থ বলে কিছু নেই। এঁরা তাই মার্কস-এঙ্গেলস্ বর্ণিত বস্তুবাদী ইতিহাসব্যাখ্যার তীব্র বিরোধিতা করেন। পপার মার্কস বর্ণিত আদিম সাম্যবাদী সমাজ→দাস সমাজ→সামন্ততন্ত্র→ধনতন্ত্র→ সমাজতন্ত্র এই উত্তরণ প্রক্রিয়াকে ইতিহাসের এক যান্ত্রিক ব্যাখ্যা বলে বর্ণনা করেছেন। পপারের এই সমালোচনার উত্তরে মরিস্ কর্ণফোর্থ (Maurice Cornforth) সঠিকভাবেই বলেছেন যে, মার্কস কখনই সমাজবিকাশের ধারাকে যান্ত্রিকভাবে একটি স্তরের অবশ্যম্ভাবী পতন ও তার পরবর্তী স্তরের আবশ্যিক উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেননি ; অর্থাৎ, মার্কস এ কথা কোথাও বলেননি যে, পৃথিবীতে সব দেশে সব সমাজব্যবস্থাই উল্লেখিত প্রভৃতি স্তরের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করবে। মার্কস ও এঙ্গেলসের একাধিক রচনায় এই সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে যে, একটি স্তর থেকে সমাজবিকাশের ধারা যাত্রা শুরু করে তার অব্যবহিত পরের স্তরকে উপেক্ষা করেও সেটি উন্নত পরবর্তী একটি স্তরে পৌছতে পারে। কর্ণফোর্থ বলেছেন, মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তিনি সমাজবিকাশের একটি পর্বের অপর একটি পর্বে উত্তরণ প্রক্রিয়াকে তথাকথিত কোন যান্ত্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখেননি। তিনি একটি মাত্র নিয়মের কথাই বলেছেন যেটি ঐতিহাসিক তথ্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। সেটি হল উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে সম্পর্কের সামঞ্জস্য সাধনের ধারণা, যার ফলশ্রুতি হল এই যে, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় সমাজের অগ্রগতি এই সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় ও সেই দেশের বিষয়গত পরিস্থিতি নির্ধারণ করে দেয় সেখানে সমাজ-বিকাশ মার্কস বর্ণিত কোন স্তরগুলির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে। মার্কস সমাজবিকাশের যে নিয়মটির কথা বলেছেন তার তাৎপর্য হল এই যে, উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়া ইতিহাসকে গতি দেয়, তাকে অর্থবহ করে তোলে। তার অর্থ একটিই : পুরনো সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে গিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থার জন্ম হয় ; পুরনো ব্যবস্থার মধ্যেই নতুন

সমাজের বীজ নিহিত থাকে এবং পুরনো ও নতুনের দ্বন্দ্বের নিরসন হয় সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে, এবং যে সমাজবিপ্লবকে চালনা করে যুগের প্রয়োজনে উৎসারিত এক একটি শ্রেণী। তাই বস্তুবাদী ইতিহাসব্যাখ্যায় মানুষের ইতিহাস অবশ্যই অর্থবহ, যেটি বাস্তবায়িত হয় সংগ্রামী মানুষের এগিয়ে চলার সাফল্যের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার অর্থ এই নয় যে, মানুষের চলার গতি কোন এক রহস্যজনক, অমোঘ ও দুর্জ্ঞেয় ঐতিহাসিক নিয়তিবাদের দ্বারা পরিচালিত। আলফ্রেড মেয়ারের (Alfred Meyer) মত তাত্ত্বিকরা বস্তুবাদী ইতিহাসব্যাখ্যার এই বিশ্লেষণ করে থাকেন। মার্কস এঙ্গেলস্ যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব রচনা করেছিলেন, তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল সৃজনশীল মানুষ, যে মানুষ তার শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে প্রকৃতিজগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ও উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে; অর্থাৎ, শ্রমজীবী মানুষই ইতিহাসের স্রষ্টা,—তথাকথিত কোন অমোঘ ঐতিহাসিক 'নিয়ম' মানুষকে সৃষ্টি করে না, ইতিহাস মানুষকে সৃষ্টি করে না, মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে মার্কস এঙ্গেলস German Ideology-তে বলেছিলেন, "ইতিহাস কোন কিছুই করে দেয় না, তার স্বতন্ত্র কোন বিপুল ঔজ্জ্বল্য নেই, সে নিজে সংগ্রাম করে না। মানুষ, সত্যিকারের জীবন্ত মানুষই সব কিছু করে, সেই সব কিছুর অধিকারী, সেই সংগ্রাম করে, 'ইতিহাস' মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন এমন সত্তা নয় যা মানুষকে তার নিজের কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ব্যবহার করে, ইতিহাস আর কিছুই নয়; এ হল মানুষেরই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মকাণ্ড।"[6]

॥ ২ ॥

শ্রেণীর উদ্ভব ও সংজ্ঞা

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী বৈর উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী সংখ্যালঘুদের সঙ্গে উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের সংঘাত ও সংকটের সৃষ্টি করে। আদিম

6 Karl Marx, Frederick Engels 'The German Ideology', *Collected Works*, Vol. 4, পৃঃ ৯৩।

সাম্যবাদী সমাজে ভাঙ্গনের পর থেকে ইতিহাস এই ধারাটিকে অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছে। মার্কস একেই বলেছেন শ্রেণীসংগ্রাম, অর্থাৎ, সমাজ-বিকাশের এক একটি পর্যায়ে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয় সমাজের সেই স্তরে শ্রেণীসংগ্রামের অবসান ঘটিয়ে। শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমেই এক একটি সমাজব্যবস্থার উত্থান ও পতন নির্দেশিত হয় এবং এটি হল সমাজবিকাশের অন্যতম চালিকাশক্তি।

শ্রেণী (Class) কথাটির আদি উৎসস্থল প্রাচীন রোম। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সারভিয়াস তুলিয়াস (Servius Tullius) [৫৭৮-৫৩৪ খ্রীঃ পূঃ] নামে জনৈক রোমান নৃপতি অস্ত্রধারণ করতে সক্ষম এমন রোমানদের নিয়ে একটি সেনা-গোষ্ঠী (Classis) গঠন করেন এবং এই সেনাদের তাদের নিজস্ব ধনসম্পত্তি (অর্থাৎ, নিজস্ব অশ্ব, অস্ত্র ইত্যাদি যোগান দেবার ক্ষমতা অনুযায়ী) অনুযায়ী পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তবে ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যে, সমাজজীবনে শ্রেণীর প্রথম আবির্ভাব ঘটে প্রাচীন গ্রীসে ও মেসোপটেমিয়াতে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে, ভারতবর্ষে ও চীনে শ্রেণীর জন্ম হয় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে ; ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীর বিকাশ, শ্রেণীসংঘর্ষ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের তীব্রতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। মার্কসের পূর্বসূরীরা অনেকেই সমাজজীবনে শ্রেণীর উপস্থিতি ও শ্রেণীবিভাজন সম্পর্কে বিশেষ অবহিত ছিলেন ও এঁদের রচনায় সেই বিশ্লেষণও তাঁরা করে গেছেন। মার্কস যোসেফ ভাইডেমাইয়ারকে (Joseph Weydemeyer) লেখা ৫ই মার্চ, ১৮৫২ সালের একটি পত্রে লিখেছিলেন যে, সমাজে শ্রেণীর উপস্থিতিকে চিহ্নিত করার কৃতিত্ব তাঁর ছিল না। পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রবক্তা, অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো সমাজে শ্রেণীর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত : পুঁজিপতি, জমিদার ও শ্রমিক ও তাঁদের মতে সমাজে এই তিন শ্রেণীর পার্থক্যের মূল কারণটি হল যে, তাঁদের আয়ের উৎস বিভিন্ন। পুঁজিপতিরা মুনাফা অর্জন করে, জমিদার সংগ্রহ করে খাজনা ও শ্রমিকের আয়ের উৎসটি হল মজুরি। শ্রেণী সম্পর্কে তাঁদের চিন্তার অসম্পূর্ণতাটি তাঁদের প্রদত্ত ব্যাখ্যার দু'টি দিকের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে। এক, তাঁদের কাছে সমাজের এই শ্রেণীবিভাজন ও তার পরিণতিরূপে সামাজিক অসাম্য ছিল যুক্তিসম্মত। তাঁরা এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কোন অন্যায় খুঁজে পাননি। দুই, তাঁদের মতে শ্রেণীর উৎস হল অসম

আয়বণ্টন ব্যবস্থা।

স্মিথ ও রিকার্ডোর পাশাপাশি 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা' (Restoration) পর্বের একাধিক ফরাসী ঐতিহাসিক তিয়েরি (Thierry), গিজো (Guizot), মিনিয়ে (Mignet) সমাজে শ্রেণীর অবস্থিতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। তাঁরা ফরাসী বিপ্লবকে বিশ্লেষণ করেছিলেন ভূসম্পত্তিকে কেন্দ্র করে শ্রেণীসংগ্রামের মাপকাঠিতে। তাঁদের এই অবদান নিঃসন্দেহে মূল্যবান হলেও এই আলোচনার দু'টি প্রধান ত্রুটি লক্ষণীয়। এক, তাঁদের মতে শ্রেণীসংগ্রামের ধারণা শুধুমাত্র অতীত ইতিহাসের পক্ষে, অর্থাৎ, ফরাসী বিপ্লবের পক্ষে প্রযোজ্য। দুই, তাঁদের মতে এই শ্রেণীসংঘর্ষের ধারণাটি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রামে প্রযোজ্য নয়।

মার্কসই প্রথম সমাজে শ্রেণীর উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন। উল্লেখিত পত্রে ভাইডেমাইয়ারকে মার্কস লিখেছিলেন যে, তাঁর পূর্বসূরীরা সমাজে শ্রেণীর অবস্থিতির প্রতি প্রথম দিক নির্দেশ করেন। তিনি যে নতুন অবদানটি রেখেছিলেন তা হল যে, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপাদনব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে যে শ্রেণীর অবস্থিতির প্রশ্নটি সম্পৃক্ত সেই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করা। শ্রেণীর আলোচনাতে মার্কস বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে দেখালেন যে, সমাজজীবনে শ্রেণী চিরকাল ছিল না, উৎপাদনব্যবস্থার বিকাশের একটি স্তরে ঐতিহাসিক কারণে শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। মার্কস-এঙ্গেলস German Ideology-তে, মার্কস Poverty of Philosophy তে (১৮৪৭) শ্রেণী সম্পর্কে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করলেও শ্রেণী সম্পর্কে তিনি একটি সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিলেন 'ক্যাপিটাল', তৃতীয় খণ্ডে, ৫২ অধ্যায়টিতে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি শ্রেণী সম্পর্কে ধারণার ভূমিকা মাত্র, কারণ মার্কস এই আলোচনাটিকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেখে গেছেন। শ্রেণী সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণার একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা আমরা পাই ১৯১৯ সালে রচিত ভি. আই. লেনিনের A Great Beginning-এ, যেখানে তিনি চারটি মাত্রার মাধ্যমে শ্রেণীর সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। লেনিন বলেছেন, "শ্রেণী বলতে বোঝায় সমাজের বৃহৎ গোষ্ঠীগুলি, যাদের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি হল এক ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদনব্যবস্থায় তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান, উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনে নির্দিষ্ট ও

সূত্রায়িত) তাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক, সামাজিক শ্রমসংগঠনে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা, এবং তদনুযায়ী সামাজিক সম্পর্কে তাদের অংশ এবং এই অংশ আহরণ পদ্ধতির মধ্যে। শ্রেণী বলতে বোঝায় সেই সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে যাদের মধ্যে এক গোষ্ঠী অর্থনীতিতে নিজ অবস্থানের জোরে অপর কোন গোষ্ঠীর শ্রম আত্মসাৎ করতে সক্ষম।"[7] এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শ্রেণীর চারটি মাত্রা লক্ষণীয়।

প্রথমতঃ, শ্রেণী হল ইতিহাসগতভাবে নিরূপিত একটি বর্গ, যেটি উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশের একটি নির্দিষ্ট ফলশ্রুতি। স্বভাবতই উৎপাদন সম্পর্ক যে সমাজব্যবস্থায় সংখ্যালঘুর আধিপত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত, সেখানে শ্রেণী সম্পর্কটিও বিরোধিতা ও সংঘাতের রূপ নেয়। দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণীর অবস্থানটি নির্ণীত হয় উৎপাদনের হাতিযারগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বৈরসম্পর্ককেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের হাতিয়ারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘুরা, যারা শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদিত সম্পদকে আত্মসাৎ করে ও এইভাবেই জন্ম নেয় উৎপাদনের হাতিয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করে যে সেই শোষক শ্রেণী। উৎপাদনের হাতিয়ারগুলিকে করায়ত্ত করে শোষক শ্রেণীর অবস্থানকে নিশ্চিত করার জন্য তাই প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রশক্তির ও রাষ্ট্রীয় আইনকানুনের। উদাহরণস্বরূপ, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সব দেশের সংবিধানেই সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যার ফলে শোষক পুঁজিপতিদের শ্রেণী অবস্থানকে সুরক্ষিত করা যায়। তৃতীয়তঃ, উৎপাদনের হাতিয়ারের সঙ্গে শ্রেণী সম্পর্ক শ্রমের সামাজিক সংগঠনে শ্রেণীর ভূমিকাকে নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমের ভূমিকাকে নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদনের হাতিয়ারের নিয়ন্ত্রণকর্তা পুঁজিপতিরা ও তার ফলে সমাজে শ্রমের সংগঠনে শ্রমিকের কোন স্বাধীন ভূমিকা থাকে না। পশ্চিমী দুনিয়ার একচেটিয়া পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বড় বড় কর্পোরেশন, ট্রাস্ট প্রভৃতির মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই যে শুধু বাঁচিয়ে রাখা হয় তাই নয়, গোটা সমাজব্যবস্থায় শ্রেণী সম্পর্ককে বিন্যস্ত করে উৎপাদনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকর্তা মালিক পুঁজিপতিরা। চতুর্থতঃ, সামাজিক সম্পদ করায়ত্ত করার

7. V. I. Lenin, 'A Great Beginning', *Collected Works*, Vol. 29, পৃঃ ৪২১।

পদ্ধতি ও পরিমাণ সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীর চরিত্রকে নির্দিষ্ট করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, দাসব্যবস্থায় দাসদের উদ্বৃত্ত শ্রমকে আত্মসাৎ করত দাস-মালিকেরা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে; মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রে ভূস্বামীরা ভূমিদাসদের শোষণ করত Corv'ee প্রথার মাধ্যমে সামাজিক সম্পদের ওপরে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে। ধনতন্ত্রে পুঁজিপতিরা মুনাফার মাধ্যমে শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্যকে আত্মসাৎ করে তাদের শোষণকে অব্যাহত রাখতে। সব কটি ক্ষেত্রেই শোষক ও শোষিত শ্রেণীর চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে সামাজিক সম্পদকে করায়ত্ত করার পদ্ধতি ও তার পরিমাণ দিয়ে। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৈর উৎপাদন সম্পর্ক যে সমাজে বিদ্যমান, সেখানে একটি শ্রেণী অপর শ্রেণীকে পরাভূত করে শোষণব্যবস্থাকে কায়েম রেখে উৎপাদন সম্পর্কের স্তরটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। তারই প্রতিক্রিয়া হল শ্রেণীসংগ্রাম।

লেনিন প্রদত্ত শ্রেণীর সংজ্ঞার ভিত্তিতে সমাজজীবনে উৎপাদনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের সূত্রগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতির ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন যখন থেকে সম্ভব হল, তা থেকে জন্ম নিল শ্রমবিভাজন প্রক্রিয়া। এর দু'টি দিক লক্ষণীয়। এক, শ্রম-বিভাজনের কৌশলগত (technical) দিক, অর্থাৎ, শ্রমবিভাজন প্রক্রিয়া উৎপাদনব্যবস্থায় বিনৈপুণ্যের (specialisation) জন্ম দেয়, যা থেকে সূত্রপাত হয় বিভিন্ন পেশার ও বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনী প্রক্রিয়ার। দুই, শ্রমবিভা-জনের সমাজিক দিক, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী যা থেকে সৃষ্টি হয় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও অসাম্য। এঙ্গেলস্ তাঁর Anti-Duehring-এ যে আলোচনা করেছেন, তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, শ্রম-বিভাজন প্রক্রিয়া দু'ভাবে শ্রেণীর উদ্ভবের কারণ হয়েছিল। প্রথমতঃ, উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি ও শ্রমবিভাজনের ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা জনজীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আহরণের কাজে সচেষ্ট হলেন,—যা থেকে জন্ম নিল সমাজে প্রথম শ্রেণী-বিভাজন। বিভিন্ন কৌশলে সমাজের মুষ্টিমেয় কুলপতিরা নিজেদের ক্ষমতার কেন্দ্রগুলিকে চিরস্থায়ী করতে মনস্থ হলেন ও এভাবেই নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার স্বার্থে তাঁরা শ্রেণীবিভেদের সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের চহিদাও বৃদ্ধি পেল ও তার ফলে নতুন শ্রমশক্তি নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। তার ফলে দেখা দিল যুদ্ধ, সংঘর্ষ

ও অন্যান্য হিংসাত্মক বলপ্রয়োগের ঘটনা, যেগুলির মাধ্যমে পরাভূত যুদ্ধ-বন্দীদের দাসশ্রেণীতে পরিণত করে তাদের শ্রমকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা শুরু হল। অনেকে মনে করেন যে, হিংসাত্মক সংঘর্ষই শ্রেণীর উদ্ভাবনের মূল কারণ। এই ধারণা এক অর্থে ভুল, কারণ শ্রেণীর উত্থানের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ, যার ফলশ্রুতি হল হিংসাত্মক সংঘর্ষের মাধ্যমে শ্রেণীদ্বন্দ্বের আত্মপ্রকাশ। শ্রেণী সম্পর্কে এই ধারণা থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় সেটি হল এই যে, শ্রেণীকে শুধুমাত্র উৎপাদনপ্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে অবস্থানরত বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্থাননির্ণয়ের মাপকাঠিতে বিচার করাটাই যথেষ্ট নয়। ড্রেপার (Draper) সঠিকভাবেই বলেছেন, শ্রেণীর উন্মেষের পিছনে মূল কারণটি হল উদ্বৃত্ত উৎপাদন এবং সেই উদ্বৃত্ত সম্পদকে করায়ত্ত করে তার ওপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই শ্রেণীব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

শ্রেণী সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণার বিরুদ্ধে যাঁরা বিকল্প মতামত দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন প্রখ্যাত জার্মান সমাজতাত্ত্বিক মাক্স ভেবার (Max Weber)। তাই শ্রেণী প্রসঙ্গে ভেবার ও মার্কসের চিন্তার পার্থক্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভেবারের মতে, সামাজিক বিভাজনের (Stratification) প্রশ্নটিকে এককভাবে শ্রেণীর (Klasse বা Class) মাপ-কাঠিতে বিচার করা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারন শ্রেণী শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উপাদানের মানদণ্ডে সমাজবিভাজনকে বিশ্লেষণ করে। শ্রেণীর ধারণাটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করেও ভেবার এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে সামাজিক বিভাজনের প্রশ্নটিকে আর্থনীতিক উপাদানের সংকীর্ণ পবিসরে আবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে বিচার করা প্রয়োজন এবং এই বিকল্প বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক ভিত্তিটি হল, ভেবারের ধারণানুযায়ী, পদমর্যাদানুসারী গোষ্ঠী (Staende বা status group)। ভেবারের মতে, সামাজিক স্তর-বিন্যাস শ্রেণীনিরপেক্ষভাবেও ঘটতে পারে, অর্থাৎ, অর্থনীতিকভাবে একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও, শিক্ষাগত যোগ্যতা, মূল্যবোধ, অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে জাত সচেতনতা প্রভৃতি উপাদানের প্রভাবে সমশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরাও একজন নিজেকে অপরের থেকে সামাজিক পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট মনে করতে পারেন ও তার ফলে সম্পূর্ণ আত্মিক (subjective) কারণে সামাজিক স্তরায়নকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এক কথায়, মার্কস আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বাস্তব (objective) ভিত্তিকে কেন্দ্র করে শ্রেণীর যে ধারণা দিয়েছিলেন,

ভেবার তার বিকল্প হিসেবে যে ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত করেন, তার ভিত্তিটি হল উৎপাদনব্যবস্থা নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তির নিজস্ব পদমর্যাদাকেন্দ্রিক আত্মিক সচেতনতা।

ভেবারের এই ধারণার সঙ্গে মার্কসের ব্যাখ্যার তুলনা করলে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। প্রথমতঃ, মার্কসের চিন্তানুযায়ী, আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি সামাজিক স্তরায়নকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূলবিচার্য, এবং সামাজিক পার্থক্যকে চিহ্নিত করে এমন অন্যান্য উপাদানগুলি প্রধানতঃ উৎপাদন সম্পর্কের নির্দিষ্ট স্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অন্বিত। পক্ষান্তরে ভেবারের মতে, পদমর্যাদানুসারী গোষ্ঠীর উৎসারণ ও প্রতিষ্ঠা উৎপাদন সম্পর্ক নিরপেক্ষ এবং তার ফলে সামাজিক স্তরবিভাজনকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে শ্রেণীর ভূমিকা গৌণ এবং সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, মার্কসের মতে উৎপাদন ব্যবস্থায় সংকটের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের মেরুভবন (polarisation) প্রক্রিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চরম আকার ধারণ করবে এবং বিপ্লবের বাস্তব ভিত্তি রচনা করবে। অপরদিকে ভেবারের মতানুযায়ী সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার জটিলতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে ও ফলে পদমর্যাদাসূচক (status determining) নতুন নতুন উপাদান সামাজিক কাঠামোতে সংযোজিত হবে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পদমর্যাদাভিত্তিক আত্মিক সচেতনতা প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপ্তি লাভ করবে ও তার ফলে শ্রেণীগতভাবে একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও একে অপরের থেকে অনেক বেশী বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ, শ্রেণীঐক্যের বদলে সৃষ্ট হবে পদমর্যাদাভিত্তিক সামাজিক বিভক্তিকরণ এবং এই প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী মেরুভবনের প্রক্রিয়াটি খর্ব হবে ও সেই সঙ্গে অবলুপ্ত হবে বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টির বাস্তব সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্যের সমাজতাত্ত্বিকরা শ্রেণী সম্পর্কে যে একাধিক বিকল্প ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন, তার মূল উৎসটি হল উৎপাদন সম্পর্ক নিরপেক্ষভাবে সামাজিক স্তরায়নের ভেবারীয় বিশ্লেষণপদ্ধতি। যেমন, সমাজে স্তরবিন্যাসকে ব্রিটেনের জর্জ কোল (George Cole) পেশার মাপকাঠিতে বিচার করেছেন। মার্কিন তাত্ত্বিক রেমণ্ড ম্যাক (Raymond Mack), নরম্যান এস. হেনার (Norman S. Hayner) প্রমুখেরা জীবন-

যাপনের ধারার পার্থক্যকরণের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাজন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ণার (Warner), ব্রিটেনের বার্চ (Birch) ও ক্যাম্পবেল (Campbell) আয়ের সূত্র, বাসস্থান প্রভৃতি উপাদানের প্রেক্ষাপটে সমাজে শ্রেণীভেদকে বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কিন তাত্ত্বিক রিচার্ড সেণ্টারস (Richard Centres) মনে করেন, শ্রেণীর ধারণা একান্তভাবেই ব্যক্তির বিষয়ীগত মানসিক চেতনার অভিব্যক্তি, অর্থাৎ, ব্যক্তির নিজস্ব সত্তার বাইরে যখন কোন বৃহত্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলনের চেতনাবোধ তাকে পীড়িত করে তখনই জন্মায় তার শ্রেণীসচেতনতা। বারনার্ড হার্বার্ট (Bernard Herbert), আন্দ্রে ফিলিপ (Andre Phillip), রাল্‌ফ ডাহ্‌রেনডর্ফ (Ralf Dahrendorf) প্রমুখেরা মনে করেন যে, পশ্চিমী দুনিয়ায় মার্কসের শ্রেণী সম্পর্কে ধারণা বর্তমানে অচল, কারণ এ সব দেশে পুঁজিবাদও বর্তমানে এক মানবিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাঁদের মতে, এই "জনগণের পুঁজিবাদে" (people's capitalism) শ্রমিকরাও বিভিন্ন শেয়ার ক্রয় করে ব্যবসায়ে অংশীদার হচ্ছে, অর্থাৎ, পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে শ্রেণীবিরোধিতা হ্রাস পেয়ে শ্রেণীসমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। নিকোস পুলানৎজাস্ (Nicos Poulantzas) মনে করেন যে, শ্রেণী কোন অর্থনৈতিক ধারণা নয়, কারণ শ্রেণী সমাজব্যবস্থার গোটা কাঠামোটির বিভিন্ন স্তরের (রাজনৈতিক, মতাদর্শগত) সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। তাঁর মতে, শ্রেণীর ধারণাটি অত্যন্ত জটিল এবং উৎপাদনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটিকে না দেখে সমাজব্যবস্থার সামগ্রিকতার ও জটিলতার মাপকাঠিতে বিচার করা উচিত।

এই তত্ত্বগুলির কোনটিই প্রকৃত অর্থে শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম সংক্রান্ত মার্কসের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করতে পারেনি। একচেটিয়া পুঁজিপতি নিয়ন্ত্রিত সমাজে শ্রমিকদের মধ্যে শেয়ার বণ্টন করলেও শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদন-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার আদৌ কোন সুযোগ পায় না; বরং পুঁজিপতি ধনকুবেরদের ধনবৃদ্ধি হয়েই চলে। সে কারণেই দেখা যায়, আজকের পশ্চিমী দুনিয়ায় ধর্মঘট ও অন্যান্য আন্দোলন ধাবিত হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজি-পতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত অর্থব্যবস্থার দিকে। উৎপাদন সম্পর্কের বৈর চরিত্র থেকেই যে শ্রেণীর উদ্ভব হয়, মার্কসের এই যুগান্তকারী চিন্তা তাই আজও গ্রহণযোগ্য। পশ্চিমী তাত্ত্বিকরা শ্রেণীকে উৎপাদন সম্পর্ক বহির্ভূত একটি অ-অর্থনৈতিক ধারণা রূপে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। তার

অর্থ দাঁড়ায় এই যে, শ্রেণীসংগ্রামই সমাজ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি এবং সমাজজীবনের অসাম্য ও শোষণের মূল কারণও যে নিহিত আছে শ্রেণী-বিভাজনের প্রক্রিয়ার মধ্যে এই সত্যটিকে অস্বীকার করা হয়। তার অর্থ এই নয় যে, মার্কসবাদ শ্রেণী ভিন্ন অন্য ধারণাকে সমাজবিশ্লেষণের ব্যাখ্যায় অস্বীকার করে। আয় বা পেশার ভিত্তিতে সমাজে যে স্তরবিভাজন আছে, মার্কসবাদ অবশ্যই তাকে স্বীকার করে ও গুরুত্ব দেয়। কিন্তু মার্কসীয় শ্রেণী-বিশ্লেষণের সঙ্গে অমার্কসীয় শ্রেণীবিশ্লেষণের তফাৎটি প্রধানতঃ দু'টি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, সমাজের বিভিন্ন অংশের পার্থক্যের মূল কারণ হিসেবে মার্কসবাদ চিহ্নিত করে শ্রেণীবিভাজনকে; অর্থাৎ সামাজিক স্তর-বিভাজনের মূল উৎস রূপে চিহ্নিত করা হয় শ্রেণীকে, যা থেকে উৎসারিত হয় অন্যান্য পার্থক্য, যেগুলি আপেক্ষিকভাবে গৌণ। দ্বিতীয়তঃ, মার্কসীয় শ্রেণীবিশ্লেষণ বস্তুতঃ বিষয়বাদী (objective), কারণ সমাজজীবনের যেটি মূল ভিত্তি, অর্থাৎ উৎপাদনব্যবস্থা, সেটির ভিত্তিতেই শ্রেণীর অবস্থানকে নির্দিষ্ট করা হয়। অমার্কসীয় বিশ্লেষণে শ্রেণীকে বিভিন্ন ধরনের বিষয়ীগত (subjective) ধারণার মাপকাঠিতে বিচার করা হয়ে থাকে ও ফলে এই জাতীয় চিন্তার ভিত্তিতে বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ ভ্রান্ত হতে বাধ্য। শ্রেণী সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণার গুরুত্ব তাই হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমগ্র পশ্চিমী দুনিয়ায় আজ শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিক অসন্তোষ যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার তাৎপর্য এখানেই যে, এই সংগ্রামের মূল লক্ষ্য হল পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ককে, অর্থাৎ, ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী সম্পর্ককে বদলে দেওয়া।

॥ ৩ ॥

সমাজবিপ্লব

সমাজবিপ্লব সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণাটি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অন্যতম বক্তব্য হল যে, বিকাশমান উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে অপস্রয়মান উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বে পুরনো সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে গিয়ে নতুন উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। মার্কস একেই বলেছেন সমাজবিপ্লব। এই ব্যাখ্যা থেকে সমাজবিপ্লব সম্পর্কে কয়েকটি

ধারণা আমরা করতে পারি। প্রথমতঃ, সমাজবিপ্লব কোন অবস্থাতেই আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয় না। সমাজবিপ্লব ঐতিহাসিক প্রয়োজনে উৎসারিত হয় একটি সমাজব্যবস্থার রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিপ্লব কোন বিশেষ ব্যক্তির বা নেতার পছন্দ বা খেয়াল মত ঘটে না। সঠিক বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেই একমাত্র সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব। তৃতীয়তঃ, যে কোন সমাজবিপ্লবের নির্দিষ্ট, বিষয়গত সামাজিক-অর্থনৈতিক অন্তর্বস্তু (Content) থাকে, যা ব্যক্তির ইচ্ছা ও চেতনা নিরপেক্ষ।

সমাজবিপ্লবের এই ধারণা থেকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছনো যায়। প্রথমতঃ, সমাজবিপ্লব যেহেতু পুরনো উৎপাদন সম্পর্ককে উচ্ছেদ করে নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে, সেহেতু এর অন্যতম প্রধান তাৎপর্য হল ক্ষমতায় আসীন পুরনো শ্রেণীব্যবস্থার বিলোপ করে নতুন শ্রেণীর ক্ষমতায় আসাকে স্বীকৃতি দেওয়া; অর্থাৎ, পুরনো শাসকশ্রেণীকে, যা নিয়ন্ত্রিত করত গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে, উচ্ছেদ করে যখন নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে সমাজবিপ্লবের সার্থকতা। আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বের মীমাংসা যেহেতু শেষ পর্যায়ে সম্পন্ন হয় রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতা দখলের মধ্যে, সেহেতু সমাজবিপ্লবের মূল কথা হল পুরনো রাষ্ট্রশক্তিকে উচ্ছেদ করে নতুন রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠা করা; এক কথায়, এর অর্থ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। প্রাক্ সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবগুলিতে দেখা যায় যে, সমাজবিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে এক শোষক শ্রেণীর উচ্ছেদ ও অপর এক শোষক শ্রেণীর উত্থানের মাধ্যমে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দাসব্যবস্থার উচ্ছেদ হয়ে যখন দেখা দিল সামন্ততন্ত্র, তখন দাস মালিকদের বদলে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হল সামন্তপ্রভুরা; আবার সামন্ত-তন্ত্রকে উচ্ছেদ করে বুর্জোয়া বিপ্লবের মাধ্যমে আবির্ভূত হল পুঁজিবাদ ও সৃষ্ট হল এক নতুন শোষক শ্রেণী। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই ক্ষমতায় আসীন হয় শোষিত শ্রেণী, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী, যা ইতিহাসে সব শোষণের চিরকালের মত নিষ্পত্তি ঘটায়। দ্বিতীয়তঃ, পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে নতুন উৎপাদিকা শক্তির সংঘাতে পুরনো শ্রেণীকে পর্যুদস্ত ও পরাভূত করে নতুন যে শ্রেণী সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, সেই শ্রেণীই সেই বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে হয়ে দাঁড়ায় সমাজবিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি এবং সমাজবিপ্লবের শ্রেণীগত চরিত্রও সেইমত নির্ধারিত হয়ে যায়।

সমাজবিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে একাধিক শর্তের ওপরে। এই শর্তগুলির সামগ্রিক অবস্থিতিকে বলা হয় বিপ্লবী পরিস্থিতি, অর্থাৎ, পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে বিপ্লবের জন্ম হয় না। এই শর্তগুলিকে মূলতঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, সমাজবিপ্লবের বিষয়গত শর্তাবলী, যে প্রসঙ্গে লেনিনের বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য, ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। শর্ত এক: সমাজে প্রতিষ্ঠিত শাসকশ্রেণীর সঙ্কট বৃদ্ধি, যেটি প্রতিফলিত হয় পুরনো কায়দায় সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার অক্ষমতায়। এর ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে ও তাকে উচ্ছেদ করার পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। শর্ত দুই: শোষিত শ্রেণীর পক্ষেও তাদের পুরনো জীবনধারা পরিচালনা করা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ প্রতিদিনের শোষণ ও অত্যাচারের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গোটা ব্যবস্থাটি তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। তারা তখন তীব্রভাবে অনুভব করে সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজন, যা সূচিত করে সমাজ পরিবর্তনের মূল শর্ত। শর্ত তিন: দেশের শ্রমজীবী সব মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামী মানসিকতা যে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য জনগণ তখন উন্মুখ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ প্রতিপক্ষের চূড়ান্ত নিষ্পেষণও তাদের সংগ্রামী প্রত্যয়কে টলাতে পারে না। এর একটি দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিককালের এল সালভাদরে চূড়ান্ত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সে দেশের নির্ভীক মানুষের অকুতোভয় সংগ্রাম, যা প্রমাণ করে যে সে দেশের শ্রমজীবী মানুষ সমাজবিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল কিছুকাল আগে মধ্য আমেরিকার নিকারাগুয়াতে, যেখানে জনগণের তীব্র অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ-সংগ্রামের বিস্ফোরণের সামনে পড়ে স্বৈরাচারী শাসক সোমোজাকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল।

সমাজবিপ্লবের বিষয়গত শর্তগুলির আলোচনা করার অর্থ এই নয় যে, এগুলির উপস্থিতি ঘটলে সে দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। মার্কসবাদ এই ধরনের নিয়তিবাদী ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিপ্লবের প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করে না। যেমন, রাশিয়াতে ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। একই ঘটনা ঘটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানীতে বিশের দশকে। কিন্তু কোন দেশেই সমাজবিপ্লব সংঘটিত হয়নি। এটি না হওয়ার প্রধান কারণ বিষয়ীগত শর্তপূরণের অভাব। সমাজ-বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার এটি হল অন্যতম প্রধান শর্ত। মার্কস, এঙ্গেলস্

ও লেনিন একাধিকবার সমাজবিপ্লবের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য এই বিষয়ীগত শর্তগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এগুলি হল সঠিকপথে বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সংগঠিত করা ও বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া, যার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠনের তথা পার্টির নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন। রাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য সম্ভবপর হয়েছিল শুধুমাত্র বিষয়গত পরিস্থিতির উদ্ভবের জন্য নয়; লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি রুশ বিপ্লবকে যে সঠিক পথে পরিচালনা করেছিল, সেটিও ছিল রুশ বিপ্লবের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটেনে পুঁজিবাদবিরোধী লাড্ডাইট্ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত যে ব্যর্থ হয়েছিল, তার অন্যতম কারণ ছিল সুযোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সঠিক মতাদর্শের অভাব।

মার্কসীয় সমাজবিপ্লবের ধারণার বিরুদ্ধে পশ্চিমী তাত্ত্বিকরা একাধিক বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, যার যোগফলকে "বিপ্লবের সমাজতত্ত্ব" (Sociology of Revolution) আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই বিকল্প ধারণাগুলি আলোচনা করলে পশ্চিমী তত্ত্বগুলির মতাদর্শগত তাৎপর্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জনসন্ (Johnson)-এর মতে, কৃষক অভ্যুত্থানকে বিপ্লবী মনে করা সম্ভব নয়, কারণ কৃষকরা পুরনো কায়দায় চিন্তা করে। আবার জ্যাকোবিন ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত বিপ্লবী প্রচেষ্টাও তাঁর মতে কোন বৈপ্লবিক ঘটনা নয়; তা নিছক 'ক্যু'র সমগোত্রীয়। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব তাঁর দৃষ্টিতে ১৯২০ সালের জার্মানীতে কাপ্ (Kapp) পরিচালিত প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের সমতুল্য। সর্বোপরি কিউবার বিপ্লব তাঁর বিচারে রোমে ফ্যাসিস্তদের পদযাত্রার সঙ্গে তুলনীয়। জনসনের কাছে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব সমার্থক, কারণ তাঁর মতে সমাজজীবনে স্থিতাবস্থা (equilibrium) বজায় রাখাই সর্বাধিক শ্রেয়। জনসনের মত সমাজবিপ্লবের বিরোধিতা সবাই করেননি। কিন্তু তাঁদের চিন্তাও চূড়ান্ত রকমের অবৈজ্ঞানিক। যেমন, ক্রেন্ ব্রিনটন (Crane Brinton)-এর মতে, বিপ্লব বলতে বোঝায় যে কোন সরকারের অবৈধ ও হিংসাত্মক উপায়ে উচ্ছেদসাধন। তার অর্থ, বিপ্লব একটি সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক ঘটনামাত্র, যেটি সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি প্রক্রিয়া ও যেটি সরকারকে উচ্ছেদ করার মধ্যেই নিজের উদ্দেশ্যকে সীমাবদ্ধ রাখে। পিটার আমান (Peter Amann)-এর ধারণা হল যে, বিপ্লবের

ফলে রাষ্ট্রের একচেটিয়া ক্ষমতার পতন হয় ও যার পরিণতিতে দেখা যায় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের সংকোচন। এখানেও বিপ্লবের অর্থ হল রাষ্ট্রশক্তির উচ্ছেদ। অপব এক তাত্ত্বিক, সিগ্‌মুণ্ড্ নয়মান্ (Sigmund Neumann), মনে কবেন যে, বিপ্লব হল ঝটিকাবর্তের মত একটি প্রক্রিয়া, যার ফলে সমাজব্যবস্থার একটি মৌলিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটে ও যার পরিণতিতে পুবনো পথে সমাজেব বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই বিশ্লেষণেবও ক্রটি হল যে, বিপ্লবেব ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। সর্বোপরি তিনি বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নির্দেশ করেননি। তাঁর ব্যাখ্যানুযায়ী, বিপ্লবী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যখন প্রতিবিপ্লবী শক্তি উচ্ছেদ করে, তখন তাব রূপটিও হয় ঝটিকাসদৃশ এবং প্রতিবিপ্লবেব ফলেও পূর্বেব বিপ্লবী নীতিগুলিব পবিবর্তন ঘটিয়ে বিপ্লববিরোধী পথে সমাজেব রূপান্তর ঘটান হয়। এমন ঘটনা ঘটেছিল চিলিতে আলেন্দে সরকাবকে উচ্ছেদের সময়ে। পশ্চিমী তাত্ত্বিকদের সমস্যাটি হল যে তাঁরা বিপ্লবকে বিচাব করেন সমাজেব অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন কবে মূলতঃ একটি রাজনৈতিক ঘটনারূপে ও তার ফলে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধাবণা একই বিন্দুতে পর্যবসিত হয়।

সমাজবিপ্লবের ধাবণাটি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা অবশ্য মনে বাখা প্রয়োজন যে, মার্কসবাদ যেহেতু কোন ধবনের নিয়তিবাদকে স্বীকাব করে না, সেহেতু উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিক্রিযাব অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল বিপ্লব,—এমন ধবনের কোন যান্ত্রিক তত্ত্ব মার্কসবাদেব চিন্তারাজ্যে সম্পূর্ণ অচল। এই প্রক্রিয়াটি সমাজবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতটি রচনা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজবিপ্লবের প্রস্ফুটন, তার বিকাশ ও সাফল্য নির্ভর করে শ্রেণীসংগ্রামের গতিপথের ওপরে; সেই সংগ্রামের মূল কর্তা হল শ্রমজীবী মানুষ, কোন অদৃশ্য তথাকথিক 'নিয়ম' নয়। মার্কস-এঙ্গেলস্ বর্ণিত সমাজবিপ্লবের ধারণাটির মূল ভিত্তি হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান দ্বান্দ্বিক সূত্রটি যে, ব্যক্তির একক ইচ্ছায় যেমন ইতিহাস সৃষ্টি হয় না, ইতিহাসের অগ্রগতি, বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশ যেমন ব্যক্তির ইচ্ছা নিরপেক্ষ, তেমনি ইতিহাসও মানুষের উৎপাদনশক্তিকে ত্বরান্বিত করার ও পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করার সক্রিয় অভীপ্সার ফলশ্রুতি। এক সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদের এই ধরনের যান্ত্রিক অপপ্রয়োগ

হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে অ্যাকাডেমিশিয়ান ভারগা (Varga) যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন[৪] সেটির প্রাসঙ্গিকতা আজও অম্লান রয়ে গেছে। ভারগা বলেছিলেন, সমাজবিকাশের নিয়মগুলি মানুষের সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপেরই ফলশ্রুতি, যদিও মানুষ তার সামগ্রিক কার্যকলাপকে সচেতনভাবে পরিচালনা করতে পাবে না ; অর্থাৎ, সমাজের নিয়মগুলির বিকাশ ব্যক্তির একক ইচ্ছা নিরপেক্ষ ; কিন্তু সেগুলি ব্যক্তির কার্যকলাপ বহির্ভূত ত নয়ই, বরং সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির কার্যকলাপের পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার পরিণতি। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দ্বান্দ্বিক চরিত্রের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে সমাজবিপ্লব সম্পর্কিত মার্কসীয় ব্যাখ্যা ও সে কারণেই এই বিশ্লেষণে বিষয়গত অর্থাৎ নিয়মগত দিকটির মত বিষয়ীগত দিকটিও, অর্থাৎ, শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত শ্রমজীবী মানুষের সক্রিয় ভূমিকাটিও প্রাধান্য পেয়েছে।

---

৪. Y. Varga, *Politico-Economic Problems of Capitalism*, পৃঃ ২২-২৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (২)

॥ ১ ॥

ভিত্তি ও উপরিসৌধ

উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা-করণের মধ্যেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ নয়। উৎপাদিকা শক্তির অবিরাম গতিশীলতা যে উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি (Base) প্রস্তুত করে, তার ওপরে নির্ভর করে গড়ে ওঠে সমাজজীবনের বিভিন্ন উপাদান, অর্থাৎ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, মতাদর্শ, চিন্তারাজ্যের বিভিন্ন ধারণা ও মতবাদ; মার্কসীয় পরিভাষায় এর নাম উপরিসৌধ বা উপরিকাঠামো (Superstructure)। ভিত্তি ও উপরিসৌধের পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অন্যতম বিষয়বস্তু।

সাধারণ বিচারে বলা যায় যে, উপরিকাঠামো সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি অর্থাৎ, উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রথম স্তরে উৎপাদিকা শক্তি উৎপাদন সম্পর্ককে নির্দিষ্ট করে দেয়; দ্বিতীয় স্তরে উৎপাদন সম্পর্ক বা সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি উপরিসৌধের চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উপরিকাঠামো উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত; কিন্তু উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে উপরিসৌধের যোগাযোগ একান্তই পরোক্ষ। উপরিকাঠামোর সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির সম্পর্কটিকে বিশ্লেষণ করে এঙ্গেলস্ তাঁর Anti-Duehring-এ বলেছেন যে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটিই হল মূল ভিত্তি, যেখান থেকে উৎসারিত হয় ইতিহাসের এক একটি বিশেষ পর্যায়ে উপরিসৌধের বিভিন্ন উপাদান, যেমন রাজনৈতিক ও বিধিব্যবস্থাবিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ধর্মীয় ও দার্শনিক বিভিন্ন ধারণা। অতএব, সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্ক সৃষ্টি করে যে অর্থনৈতিক ভিত্তি, উপরিকাঠামোকে ব্যাখ্যা করার সেটি হল মূল সূত্র। কিন্তু উৎপাদিকা শক্তি যেহেতু উৎপাদন সম্পর্কের নিয়ামক, সেহেতু উপরিসৌধের

সঙ্গে এর সম্পর্ক পরোক্ষ মাত্র। উৎপাদন সম্পর্ক উপরিকাঠামো ও উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে সংযোগের সেতু; ফলে উপরিকাঠামোর ওপরে উৎপাদিকা শক্তি সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে না। এই সূত্রের ভিত্তিতে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই। প্রথমতঃ, উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন, যা সৃষ্টি করে শ্রেণীসম্পর্ক, উপরিকাঠামোতে পরিবর্তন সূচিত করে; এই কারণেই বলা হয়ে থাকে যে, সমাজজীবনের বিভিন্ন ধারণা, মতাদর্শ, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা অর্থাৎ, সমগ্র উপরিকাঠামোর বিভিন্ন উপাদান, সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীসম্পর্কের প্রতিফলন। এর ফলে দেখা যায়, সমাজজীবনে উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বগুলি উপরিকাঠামোর বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত হয়, যেমন ভাবাদর্শ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রম ও পুঁজির বৈরদ্বন্দ্বের সম্পর্ক প্রতিফলিত হয় পুঁজিবাদী সমাজের সাহিত্যে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে অর্থাৎ, পুঁজিবাদ সৃষ্টি করে পরস্পরবিরোধী দ্বান্দ্বিক চরিত্রবিশিষ্ট মতাদর্শ। তাই দেখা যায় যে, একই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের সমর্থনে যেমন মতামত গড়ে ওঠে, তেমনই আবার সৃষ্টি হয় পুঁজিবাদবিরোধী ভাবনাচিন্তা। পুঁজিবাদকে সরাসরি সমর্থন করে যেমন গড়ে উঠেছে ম্যালথাস (Malthus) প্রমুখের তত্ত্ব, তেমনই পুঁজিবাদের সমালোচনাধর্মী দর্শন রূপে গড়ে উঠেছে ম্যানডেভিল (Mandeville), রুশোর চিন্তা। পুঁজিবাদের পরস্পরবিরোধী দ্বান্দ্বিক চরিত্রের এমনইভাবে প্রতিফলন ঘটেছে ওয়ার্ডসওয়ার্থের (Wordsworth) রচনায়, যিনি প্রথম পর্বে ফরাসী বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েও দ্বিতীয় পর্যায়ে তার বিরোধিতা করেন। এর পিছনে ঐতিহাসিক কারণটি ছিল এই যে, ফরাসী বিপ্লবকে তার সামন্ততন্ত্রবিরোধী চরিত্রের জন্য একাধিক চিন্তাবিদ্ স্বাগত জানালেও তার ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী চরিত্রটি পরবর্তীকালে অনেকের কাছেই আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদিকা শক্তি যেহেতু উপরিকাঠামোর চরিত্রকে সরাসরি নির্ধারণ করে না, সেহেতু উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তনের ফলে উপরিসৌধের ক্ষেত্রে সমানুপাতিক পরিবর্তন সূচিত হয় না। এর কারণ হল যে, উৎপাদিকা শক্তির চরিত্র শ্রেণী নিরপেক্ষ, যেহেতু উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ প্রত্যক্ষভাবে প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের সঙ্গে জড়িত। ফলে দেখা যায় যে, উৎপাদিকা শক্তির স্তর মূলতঃ এক হলেও, উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্রগত পার্থক্যের ফলে

দুটি ভিন্ন সমাজব্যবস্থার উপরিকাঠামোর চেহারাও পরস্পরবিরোধী। ১৮৪৬ সালের ২৮ ডিসেম্বরের একটি চিঠিতে মার্কস পি. ভি. আনেনকভ (P. V. Annenkov)-কে যথার্থই লিখেছিলেন যে, অর্থনৈতিক ধারণা-মৌল (Category) হিসেবে একটি যন্ত্র হাল চাষ করে যে বলদ তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। কিন্তু যন্ত্রের ব্যবহার মূল যন্ত্রের অস্তিত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় দেশেই প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিকাশের ক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তির চরিত্র মূলতঃ অভিন্ন, কিন্তু উভয় সমাজব্যবস্থার উপরিকাঠামোর চরিত্র পরস্পরবিরোধী, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজের উপরিসৌধ সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিফলন, অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে উপরি-কাঠামো সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কেই ওপরে প্রতিষ্ঠিত। দু'টি ব্যবস্থার উপরিকাঠামোগত পার্থক্যের মূলে রয়েছে উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্রের তফাৎ, যদিও উভয় ব্যবস্থাতেই উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের স্তরটি মোটামুটি অভিন্ন বলা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক কাঠামো হল মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ, যা মানুষের সামাজিক অগ্রগতির ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ঘটে, পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কের ধ্বংসসাধন ও নতুন উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করে, কিন্তু উপরিকাঠামোর বিভিন্ন উপাদান যান্ত্রিকভাবে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি দ্বারা নির্ধারিত হয় না। মার্কস এ কথাই বলেছেন যে, মানুষ সচেতনভাবে তার আত্মিক প্রয়োজনে উপরিসৌধের বিভিন্ন উপাদানকে বিভিন্ন আঙ্গিকের (form) মাধ্যমে প্রকাশ করে, যদিও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বিষয়গতভাবে উপরিসৌধের বিভিন্ন উপাদানের মৌল চরিত্রটিকে নির্দিষ্ট করে দেয়। হব্‌স যখন তাঁর বস্তুবাদ-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রতত্ত্ব রচনা করেছিলেন, সেই প্রক্রিয়ায় তাঁর অংশগ্রহণ ঘটেছিল সচেতনভাবেই। কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার সামাজিক চরিত্র তৎকালীন ব্রিটেনের সপ্তদশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ভিত্তি দ্বারা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, যা ছিল হব্‌সের চিন্তা নিরপেক্ষ।

চতুর্থতঃ, যেহেতু প্রত্যেক সমাজে উপরিসৌধ তার প্রাতিষঙ্গিক (corresponding) অর্থনৈতিক ভিত্তি দ্বারা নির্দিষ্ট হয়, সেহেতু যতদিন পুরনো ভিত্তিটি অপরিবর্তনীয় থাকে, ততদিন উপরিকাঠামোতেও কোন পরিবর্তন সূচিত হয়

না। সমাজের পুরনো অর্থনৈতিক কাঠামোটি ভেঙে গিয়ে নতুন ভিত্তি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় নতুন উপরিকাঠামোর বিকাশ শুরু হয়। এই কারণে দেখা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অভিজাততান্ত্রিক সংস্কৃতির বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বজনীন ভোটাধিকারের উপস্থিতি সম্ভবপর নয়।

ভিত্তি ও উপরিসৌধের এই পারস্পবিক সম্পর্ক থেকে বোঝা যায় যে, সমাজে আদর্শগত ধ্যানধারণা, মতাদর্শ, রাজনৈতিক সংগঠন প্রভৃতি উপরিকাঠামোর বিভিন্ন উপাদান আকস্মিকভাবে সৃষ্ট হয় না বা কোন মহাপুরুষের ইচ্ছায় কিংবা কোন অলৌকিক কারণেও উৎসাবিত হয় না। সমাজজীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি, যা নির্দিষ্ট করে দেয় সেই সমাজের শ্রেণীসম্পর্ক, সেটিই প্রতিষ্ঠা করে উপরিসৌধকে, অর্থাৎ, ভিত্তি ও উপরিসৌধ শ্রেণীগতভাবে সম্পৃক্ত এবং মোটামুটিভাবে কাযকারণ সূত্রে বাঁধা।

উপরিকাঠামো সৃষ্টির পিছনে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির সামগ্রিক প্রভাবের কথাটি চিন্তা করলে এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ভিত্তি উপবিকাঠামোকে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ, উপরিকাঠামোর উদ্ভব ও বিকাশ সম্পূর্ণভাবে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপরে নির্ভরশীল। উপবিকাঠামোর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই ও ভিত্তি এবং উপরিসৌধেব পারস্পরিক সম্পর্ক যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। এইচ্. বি. এ্যাকটন (H. B. Acton), মার্টিন সেলিগার (Martin Seliger) প্রমুখেরা এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উপরিসৌধ ও ভিত্তির সম্পর্কটিকে ব্যাখ্যা কবেন, যেটি সাধারণতঃ অর্থনৈতিক নিয়তিবাদ (economic determinism) নামে খ্যাত। এই তত্ত্বের তাৎপর্যটি হল এই যে, উপরিকাঠামোর বিভিন্ন উপাদান, যেমন, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, মতাদর্শ ইত্যাদি সব কিছুই অবধারিতভাবে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রতিফলন মাত্র। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কিন্তু এই জাতীয় যান্ত্রিক নিয়তিবাদের তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এ কথাই বলে যে, উপরিকাঠামো সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয় ও সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিটি হল উপরিকাঠামো সৃষ্টির মূল উৎস। কিন্তু এই প্রভাব কোন অবস্থাতেই সার্বিক বা চূড়ান্ত নয়। ভিত্তি দ্বারা প্রভাবিত হলে ও ভিত্তি থেকে উৎসারিত হলেও উপরিকাঠামো তার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী উপরিকাঠামোর আপেক্ষিক

স্বাতন্ত্রের ধারণাটিকে কয়েকটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, মার্কস-এঙ্গেলস ভিত্তি ও উপরিসৌধের পারস্পরিক সম্পর্কটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভিত্তির প্রাধান্যকে গুরুত্ব দিলেও একথা বলেননি যে, ভিত্তি এককভাবে উপরিকাঠামোর গঠন ও চরিত্রকে নির্ধারণ (determines) করে। মার্কস তাঁর বহুল পরিচিত Preface to the Contribution to the Critique of Political Economy (১৮৫৯)-তে এই প্রশ্নটির আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "বাস্তব জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবাদী জীবন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে" ("The mode of production of material life conditions the social, political and intellectual life process in general")। সাম্প্রতিককালের একটি গবেষণায় মেলভিন র‍্যাডার (Melvin Rader) সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন যে, এখানে মার্কসের "conditions" (মূল জার্মান 'bedingen') কথাটির প্রয়োগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যার অর্থ দাঁড়ায় যে, বাস্তব জীবনের উৎপাদনপদ্ধতি, অর্থাৎ, সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি, উপরিকাঠামোকে "সাধারণভাবে প্রভাবিত" করে। "প্রভাবিত করা" ও "নির্ধারণ করা" সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করে এবং মার্কস এই দু'টি শব্দের পার্থক্য সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন ছিলেন বলেই তিনি "নির্ধারণ" (determines , মূল জার্মান 'bestimmen') কথাটি ব্যবহার করেননি। "প্রভাবিত করা" কথাটি ব্যবহার করলে তার অর্থ দাঁড়ায় যে, উপরিকাঠামো অর্থনৈতিক ভিত্তি দ্বারা এককভাবে ও যান্ত্রিক উপায়ে নির্দিষ্ট হয় না , উপরিকাঠামো অর্থনৈতিক ভিত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে, কারণ প্রভাবিত করার অর্থ সামগ্রিকভাবে নির্ধারণ করা নয়। তাঁর শেষ পর্বের একাধিক পত্রে এঙ্গেলস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের যান্ত্রিক নিয়তিবাদী ব্যাখ্যার তীব্র বিরোধিতা করে ভিত্তি ও উপরিসৌধের সম্পর্কের সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করে গেছেন। ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লেখা জে. ব্লখ্ (J. Bloch)-এর কাছে একটি চিঠিতে এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী বাস্তব জীবনের ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক উপাদান শেষ পর্যন্ত নিয়ামক ভূমিকা পালন করে ঠিকই , কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অর্থনৈতিক উপাদানই একমাত্র উপাদান। এ কথা বলার অর্থ হবে অর্থশূন্য মতান্ধতার শিকার হওয়া। এঙ্গেলস খুব স্পষ্টভাবেই এ কথা বলেছিলেন যে, অর্থনৈতিক কাঠামো অবশ্যই সমাজের মূল ভিত্তি,

কিন্তু উপরিকাঠামোর বিভিন্ন উপাদানও যথেষ্ট সক্রিয়ভাবে ঐতিহাসিক সংগ্রামের গতিপথের ওপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে ও অনেক ক্ষেত্রেই সংগ্রামের নির্দিষ্ট রূপকে নির্ধারণ করে দেয়। পরবর্তীকালে ১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে লিখিত এইচ্. স্টারকেনবুর্গের (H. Starkenburg) কাছে একটি পত্রে এঙ্গেলস লেখেন যে, কথাটা এই নয় যে অর্থনৈতিক উপাদানই হল সবকিছুর মূল ও একমাত্র কারণ ও বাকি সব কিছুর ভূমিকা হল নিষ্ক্রিয়।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজের পরিবর্তনশীল উৎপাদন সম্পর্ক যে অর্থনৈতিক ভিত্তির জন্ম দেয় তার ফলে সমাজের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে প্রাতিষঙ্গিক (Corresponding) উপরিসৌধ উৎসারিত হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলেও তা থেকে এই জাতীয় সিদ্ধান্তে পৌছনো যায় না যে, উপরিকাঠামোর বিভিন্ন উপাদান আবশ্যিকভাবে অর্থনৈতিক ভিত্তির যান্ত্রিক প্রতিফলন মাত্র। লেনিন ও প্লেখানভ্ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এই সরলীকৃত ব্যাখ্যার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত The Justification of Capitalism in West European Phhlosophy গ্রন্থে রুশ তাত্ত্বিক ভি. শুলিয়াতিকভ্ (V. Shulyatikov) এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন যেহেতু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সেহেতু এই দর্শনও বস্তুতঃপক্ষে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, ও তার ফলে পুঁজিবাদের মত এই দর্শনও সামগ্রিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল। লেনিন ও প্লেখানভ্ এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কখনই উপরিকাঠামোকে একপেশেভাবে অর্থনৈতিক ভিত্তি দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করে না। এই প্রসঙ্গে ওইজারমান্ (Oizerman) সঠিকভাবেই বলেছেন যে, শুলিয়াতিকভের বক্তব্য দাঁড়িয়েছিল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণার ওপরে। তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না যে, কোন তত্ত্ব বা ধারণা চিন্তার ইতিহাসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে সৃষ্ট হলেও তার চরিত্রগত এবং পদ্ধতিগত স্বরূপ অনেকাংশেই নির্ণীত হয় তার পূর্ববর্তী চিন্তাধারার সঙ্গে যৌক্তিক (logical) প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে।[1] উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, গালিলেওর বৈজ্ঞানিক চিন্তা একাধারে যেমন

1. Theodor Oizerman, *Problems of the History of Philosophy*, পৃঃ ৩৮১-৩৮৩।

ছিল সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রামের বিষয়গত প্রতিফলন, অপরদিকে তাঁর চিন্তা ছিল বিজ্ঞানজগতের একান্ত নিজস্ব বিকাশধারার যৌক্তিক পরিণতি। সমাজচিন্তার ইতিহাসে মার্কসবাদের জন্মকেই এভাবে দেখা যেতে পারে। মার্কসবাদ শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই সৃষ্ট হয়নি। মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশের পিছনে বিশেষ অবদান ছিল জার্মান ভাববাদী দর্শনের। সেই দর্শনের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থের সম্পর্ক ত ছিলই না, বরং ছিল বিরোধিতার সম্পর্ক। এক কথায়, উপরিকাঠামো ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সামাজিক ভিত্তির দ্বারা প্রভাবিত হলেও, সে তার নিজস্ব বিষয়-বস্তুর তাত্ত্বিক বিকাশের পরিণতিও বটে ও এই অর্থে উপরিকাঠামো তার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। উপরিকাঠামোকে অর্থনৈতিক ভিত্তির নিষ্ক্রিয় প্রতিফলন মনে করলে একটি প্রশ্নই বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়: একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক তত্ত্ব ইতিহাসের কোন সামাজিক প্রয়োজনের ধারক? কিন্তু যে প্রশ্নটি অনুচ্চারিত থেকে যায় সেটি হল, বিভিন্ন মতবাদ বা ধ্যানধারণার পদ্ধতিগত রকমফের হয় কেন? দৃষ্টান্তস্বরূপ, অর্থনৈতিক নিয়তি-বাদের ভিত্তিতে এ কথা বলা সম্ভব যে, হব্‌স ও হেগেল উভয়েই ইতিহাসের দু'টি ভিন্ন পর্যায়ে ব্রিটেন ও জার্মানীতে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ও সে অর্থে উভয়েই ছিলেন বুর্জোয়া দার্শনিক। কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে হব্‌স কেন বস্তুবাদী ও হেগেল কেন ভাববাদী পথ অনুসরণ করেছিলেন, তার ব্যাখ্যা এককভাবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভবপর নয়। তার জন্য প্রয়োজন হব্‌সের চিন্তার ওপরে তাঁর পূর্বসূরী বস্তুবাদী দার্শনিকদের প্রভাব সংক্রান্ত আলোচনা এবং জার্মানীতে প্রাক্-হেগেলীয় ভাববাদী দার্শনিক চিন্তার ঐতিহ্যের বিশ্লেষণ।

তৃতীয়তঃ, উপরিকাঠামো শুধুমাত্র ভিত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয় না। উপরিকাঠামো নিজেও ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে ভিত্তির ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। একইভাবে বলা যায় যে, উপরিকাঠামো বিপ্লবাত্মক উপায়ে ও বিপ্লবের বিরোধিতা করে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সূচনা করতে পারে। এই প্রসঙ্গে কনরাড্ স্মিট্‌কে (Conrad Schmidt) লেখা ১৮৯০ সালের অক্টোবর মাসের একটি পত্রে এঙ্গেলস রাষ্ট্রশক্তির আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে, রাষ্ট্র তার প্রাতিষঙ্গিক (corresponding) উৎপাদন সম্পর্কের ওপরে

প্রতিষ্ঠিত হয়েও অচিরেই আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এঙ্গেলসের এই বিশ্লেষণ সামগ্রিকভাবে উপরিকাঠামোর বিভিন্ন উপাদানের পক্ষেই প্রযোজ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গভীর সংকট যেমন প্রবুদ্ধকরণ (Enlighten-ment) দর্শনের জন্ম দিয়েছিল, তেমনি এই দর্শন ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম সহায়ক শক্তিরূপে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনে ও পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। একই-ভাবে বলা যায় যে, ত্রিশের দশকে জার্মান পুঁজিবাদ যে ফ্যাসীবাদী ভাবাদর্শের ঐতিহাসিক ভিত্তি রচনা করেছিল, সেই ফ্যাসীবাদী আদর্শের বিকাশই পরবর্তীকালে জার্মান পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উপরিকাঠামোর আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য থাকে বলেই অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপরে এর সক্রিয় প্রভাব বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই প্রসঙ্গে উপরিকাঠামোর অন্যতম উপাদান, ব্যক্তির চেতনা (consciousness) সম্পর্কে কোলাকোভ্‌সকি (Kolakowski)-র মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি এই উপাদানটির ওপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থায়। তাঁর মতে মানুষের চেতনা সক্রিয় ও স্বাধীন ভূমিকা পালন করবে তখনই যখন তা হবে শোষণের শৃঙ্খলমুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই এই যুক্তি অনুযায়ী শোষণহীন সমাজব্যবস্থায় উপরিকাঠামোর আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য আরও গভীরভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত হবে; এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি স্বাধীন মানবমনের চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজ ও জীবনের বিকাশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[২]

চতুর্থতঃ, ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, উপরিকাঠামো একাধিক ক্ষেত্রে ইতিহাসের যে স্তরের ফলশ্রুতি, তাকে অতিক্রম করে যায়। অর্থাৎ, সর্বক্ষেত্রে যে ভিত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপরিকাঠামোর স্থান নির্ণীত হয়, তা নয়। যে সামাজিক ভিত্তি একটি বিশেষ উপরিসৌধের জন্ম দেয়, সেই সামাজিক ভিত্তির অবলুপ্তি হলেও উপরিকাঠামো অনেক ক্ষেত্রে সেই ভিত্তিকে অতিক্রম করে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। যেমন, এ্যারিস্টটলের চিন্তা সমকালীন গ্রীক সমাজব্যবস্থা থেকে উৎসারিত হলেও গ্রীকব্যবস্থার

2. Leszek Kolakowski, *Main Currents of Marxism*, Vol. I, পৃঃ ৩৪৫-৪৬।

পতনের পর বহু শতাব্দী জুড়ে তার প্রভাব ইউরোপের দার্শনিক চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী, সাহিত্যিকের রচনা ও শিল্পকর্মের প্রভাব উপরিকাঠামোর এই আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের ফলেই আজও অম্লান রয়ে গেছে। আবার এ কথাও অবশ্যই স্বীকার্য যে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মও যুগ বা কাল, অর্থাৎ, সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি নিরপেক্ষ নয়, কারণ এই সৃষ্টির প্রয়োজন হয় যুগের প্রয়োজনে, ইতিহাসের দাবিতে। এই অর্থেই বলা হয়ে থাকে যে, উপরিকাঠামোকে ভিত্তি প্রভাবিত করে; আবার ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কে উপরিকাঠামো আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন।

উপরিসৌধের এই আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের তত্ত্বটির বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়। প্রথমতঃ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যেহেতু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সার্থক প্রয়োগ, সেহেতু এই তত্ত্বে ব্যক্তির চেতনাবোধকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, যার মধ্যে সমাজব্যবস্থার ভিত্তিকে পরিবর্তন করার স্বীকৃতি আছে। দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ভিত্তি ও উপরিসৌধের মধ্যে কোন যান্ত্রিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে, কারণ মার্কসবাদ কোন ধারণা বা ভাবনাকেই এককভাবে একটি বিশেষ উৎপাদনব্যবস্থার অর্থনৈতিক চরিত্রের প্রকাশ বলে মনে করে না। মানুষের চিন্তার ইতিহাসে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যে তত্ত্ব বা ধারণাই সমাজের প্রগতিশীলতার পক্ষে সহায়ক, উপরি-কাঠামোর সেই সব উপাদানকেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ গুরুত্ব সহকারে স্বীকৃতি দেয়। তৃতীয়তঃ, চিন্তা ও দর্শনের জগতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যে কোন তত্ত্বের মতাদর্শগত চরিত্র ও তার প্রগ্রাহ্য ধর্মের (cognitive function) মধ্যে পার্থক্য করে। ওইজারমান্ সঠিকভাবেই বলেছেন যে, প্লেটো, এ্যারিস্টটল প্রমুখ দার্শনিকের চিন্তা বিষয়গতভাবে দাস সমাজব্যবস্থা থেকে উৎসারিত হলেও তাঁদের দার্শনিক চিন্তাকে দাসব্যবস্থার মতাদর্শগত সমর্থন মনে করাটা হবে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক চিন্তা, কারণ চিন্তার জগতে যুক্তির বিকাশ তার নিজস্ব নিয়মে ঘটে, যার ওপরে সামাজিক ভিত্তির প্রভাব একান্তই পরোক্ষ। অর্থাৎ, যে কোন তত্ত্বের বিকাশকে শুধুমাত্র একটি শ্রেণীর মতাদর্শগত রক্ষাকবচরূপে চিহ্নিত করাটা হবে নিকৃষ্ট বস্তুবাদের (vulgar materialism) নামান্তর মাত্র।[৪]

3. Theodor Oizerman, *Problems of the History of Philosophy*, পৃ: ৪০১-৪০৫।

ভিত্তি ও উপরিসৌধের এই জটিল যোগসূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বহুল আলোচিত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপরিকাঠামোগত ধারণা বিস্তারিত বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তার মধ্যে একটি হল স্বাধীনতা ও অপরটি হল রাষ্ট্র বিষয়ক তত্ত্ব।

॥ ২ ॥

স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যা

প্রাত্যহিক জীবনে "স্বাধীনতা" কথাটির ব্যবহার আমরা যত্রতত্র করে থাকি। সাধারণ বুদ্ধিতে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় অপরেব ইচ্ছার অধীনে না থাকা ও নিজের যে কোন ইচ্ছাকে পূর্ণ ও চূড়ান্ত রূপ দান করা। স্বাধীনতাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয় বলেই সাধারণতঃ এ কথা মনে করা হয়ে থাকে যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেহেতু কোন ব্যক্তি যথেচ্ছভাবে স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করতে পারে না, সেহেতু সেই সমাজে স্বাধীনতা একটি মূল্যহীন ধারণা মাত্র। পুঁজিবাদী সমাজের তাত্ত্বিকরা স্বাধীনতাকে সাধারণতঃ অবাধ অভীপ্সার (Free Will) সঙ্গে সমার্থক বলে মনে করেন। পশ্চিম জার্মানীর তাত্ত্বিকরা তাঁদের বহুল প্রচারিত "দার্শনিক অভিধানে" স্বাধীনতা বলতে বুঝিয়েছেন ইচ্ছার স্বাধীনতা, কারণ প্রকৃতিগত কারণে ইচ্ছা সব সময়েই মুক্ত। এঁদের মতে, স্বাধীনতার অর্থ হল ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার সম্ভাব্যতা; বাস্তব জীবনে কিন্তু স্বাধীনতা সম্পর্কে এই তথাকথিত ধারণা সম্পূর্ণই অচল। বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণায় উপনীত হতে গেলে দেখা যাবে যে, প্রাত্যহিক জীবনে স্বাধীনতা বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে এই জাতীয় তত্ত্বের আদৌ কোন মিল নেই ও ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে এই তত্ত্ব নিদারুণ ক্ষতিকারক।

সর্বাগ্রে এ কথাটি বলে নেওয়া প্রয়োজন যে স্বাধীনতার অর্থ ইচ্ছার বা অভীপ্সার যথেচ্ছ প্রয়োগকে বোঝায় না। এর অন্যতম কারণ হল, যে কোন ধরনের ইচ্ছার চরিতার্থতার মাধ্যমেই ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষিত হয় না। কোন ব্যক্তি যদি বল্গাহীনভাবে তার স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করে, অর্থাৎ, সে যদি তার ইচ্ছা, আবেগ প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে অবাধভাবে ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে শুরু করে, তবে অচিরেই সে তার নিজের ইচ্ছার অধীন

হয়ে পড়বে। আরও স্পষ্ট কথায় বললে এর অর্থটি দাঁড়ায় এই যে, আমাদের অভীপ্সা ততক্ষণ পর্যন্তই স্বাধীনতার সহায়ক, যতক্ষণ আমরা আমাদের অভীপ্সাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, অভীপ্সা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যক্তি যখন অবাধভাবে তার আবেগ ও ইচ্ছার প্রয়োগ করে, কোন এক স্তরে তা ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থেরই পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় ও তার স্বাধীনতা হয় শৃঙ্খলিত। আজকের পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবশ্যই নিউট্রন বোমা ব্যবহার করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু মার্কিন যুদ্ধবাজ প্রশাসন এ কথাও জানে যে, সেই ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে গেলে অচিরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপরেও তার প্রত্যাঘাত এসে পড়বে এবং তা হয়ে দাঁড়াবে মার্কিন প্রশাসনের স্বাধীন ইচ্ছার পরিপন্থী। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, স্বাধীনতা বলতে অবশ্যই বোঝায় ব্যক্তির ইচ্ছার চরিতার্থতা, কিন্তু তার অবাধ ব্যবহার মানুষের স্বাধীনতাকে করে শৃঙ্খলবদ্ধ। স্বাধীনতার সার্থক রূপায়ণ হয় তখনই যখন তা নিয়ন্ত্রিত হয় যুক্তিসিদ্ধভাবে।

এবারে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, অবাধ অভীপ্সা যদি স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়, তবে কোন মাপকাঠিতে এই অভীপ্সাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন? এই প্রশ্নের উত্তর প্রথম দেবার চেষ্টা করেন ডাচ দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza); তাঁর মতে, মানুষকে তখনই বলা যায় স্বাধীন যখন সে তার প্রয়োজনে যুক্তির মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে তার ক্রিয়াকর্মকে পরিচালিত করে। স্পিনোজা বলেন, মানুষের যুক্তি প্রকৃতি-বিরোধী কোন দাবি করে না ও তার ফলে যেহেতু পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে ধ্যারণা ও জ্ঞানলাভের প্রয়োজনে যুক্তি উৎসারিত হয়, সেহেতু যুক্তিনির্ভর ইচ্ছা স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়। অতএব, স্পিনোজার মতে স্বাধীনতা হল প্রগ্রাহ্য অপরিহার্যতা (cognised necessity)। স্পিনোজার এই তত্ত্ব সমাজচিন্তার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি দেখিয়েছেন যে, মানুষ যদি তার প্রয়োজনে বাস্তব জগতের নিয়মগুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের ভিত্তিতে তার ইচ্ছাকে পরিচালিত করে, তবে তা অবশ্যই স্বাধীনতার সহায়ক অর্থাৎ, স্পিনোজা স্বাধীনতাকে প্রয়োজনীয়তাকেন্দ্রিক ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। যে ইচ্ছাবৃত্তি প্রকৃত প্রয়োজনে লাগে না, তা স্বাধীনতার পরিপন্থী। স্পিনোজার দৃষ্টিতে স্বাধীনতার সীমানা নির্ধারণ করে প্রয়ো-

জনীয়তা। খানিকটা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বস্তুজগৎ সম্পর্কে ব্যক্তির জ্ঞানলাভই স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণা করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। তৎকালীন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতার জন্য স্পিনোজার পক্ষে এর চেয়ে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ করা সম্ভব ছিল না।

স্পিনোজা যে পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার প্রশ্নটি বিবেচনা করেছেন, তার চেয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে এই আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন জার্মান ভাববাদী দার্শনিক হেগেল। তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে বিচার করেছিলেন "পরম ধারণার" (Absolute Idea) আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী মানুষের সমাজের বিকাশ হল স্বাধীনতা সম্পর্কে চেতনার বিকাশেরই নামান্তর,—যে চেতনা আত্মপ্রকাশ করে "আত্মার" (Spirit) সৃষ্ট ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে। হেগেলই প্রথম স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার করেন, যদিও সে ব্যাখ্যা ছিল ভাববাদী চিন্তায় রঞ্জিত। তবে স্পিনোজার মত হেগেলও স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে বিচার করেছিলেন "পরম আত্মার" আত্মজ্ঞানের আবশ্যিকতার প্রেক্ষাপটে। উভয়ের ক্ষেত্রেই আবশ্যিকতার গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আবার উভয়েই জ্ঞানলাভের প্রশ্নটিকে গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত বলে মনে করেছেন; স্পিনোজার ক্ষেত্রে জ্ঞানলাভ মূলতঃ একটি বিষয়ীবাদী (subjective) প্রক্রিয়া; হেগেলের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া বিষয়বাদী (objective)। এই প্রসঙ্গে হেগেল তাঁর Science of Logic-এ যে মন্তব্যটি করেছেন, সেটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "মানুষ তখনই সর্বাধিক স্বাধীন যখন সে জানে যে সে সম্পূর্ণভাবে 'পরম আত্মা' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।"

স্পিনোজা ও হেগেল উভয়েই ভাববাদী আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হলেও স্বাধীনতা সংক্রান্ত আলোচনায় এই দুই দার্শনিকের অবদান মার্কসবাদী বিশ্লেষণের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, তাঁরা স্বাধীনতাকে কখনই চূড়ান্ত বলে মনে করেননি। নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বাধীনতা যে কখনই অর্থবহ হতে পারে না, ও তা যে স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়, তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় স্পিনোজায় ও হেগেলে। দ্বিতীয়তঃ, এই দুই দার্শনিকই স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে বিবেচনা করেছেন প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে; অর্থাৎ, স্বাধীনতা স্থান কাল নিরপেক্ষ কোন অব্যক্ত ধারণা নয় বা তা সম্পূর্ণভাবে বিষয়ীগত স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে উৎসারিত হয় না। স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে বিচার

করতে হলে তার যে একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট প্রয়োজন, সে ইঙ্গিতও আমরা প্রথম পাই স্পিনোজায় ও হেগেলে। তৃতীয়তঃ, উভয় দার্শনিকের মতবাদ ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হলেও স্বাধীনতার প্রশ্নটির আলোচনায় জ্ঞানলাভের তাৎপর্যকে গুরুত্ব দিয়ে স্বাধীনতা প্রসঙ্গে মার্কসীয় ব্যাখ্যার বিকাশ ঘটাতে তাঁরা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভই যে ব্যক্তিকে স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, অর্থাৎ, বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তাই যে সৃষ্টি করে স্বাধীনতার পূর্বশর্ত, যার তাৎপর্য এই যে, জ্ঞানলাভ ও স্বাধীনতা পরস্পর গভীরভাবে সম্পৃক্ত,—উভয় দার্শনিকই এই বিষয়টি সম্পর্কে প্রগাঢ় সচেতন ছিলেন।

স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্কসীয় বিশ্লেষণের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সূত্রপাত করেন এঙ্গেলস তাঁর Anti-Duehring-এ; তাকে পরিবর্ধন করে লেনিন তাঁর Materialism and Empirio-Criticism গ্রন্থে স্বাধীনতার ধারণাটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে গিয়ে চারটি মৌল সূত্রের ভিত্তিতে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমতঃ, স্বাধীনতা বস্তুজগতের নিয়মগুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভে যদি আমরা অপারগ বা অক্ষম হই, তবে কোন অবস্থাতেই বস্তু-জগৎকে নিয়ন্ত্রণে আনা বা পারিপার্শ্বিককে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভবপর হবে না। এর ফলে স্বাধীনতার পরিপন্থী দু'টি সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। এক, ব্যক্তির মনে হবে যে সে বস্তুজগতের নিয়মের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন অর্থাৎ, বস্তুজগতের নিয়মের অমোঘতাকে অতিক্রম করে স্বাধীন ইচ্ছা বা কার্যের প্রকাশ ঘটা সম্ভবপর নয়। দুই, এও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বস্তুজগৎ আদৌ কোন নিয়ম মেনে চলে না; বস্তুজগতের সঙ্গে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ব্যক্তির জগৎ সম্পর্কে বিষয়ীগত ধারণার ওপরে; অর্থাৎ, বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এক ধরনের অনির্দিষ্টতা থেকে যায়; তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বস্তুজগতের পরিবর্তন বা রূপান্তরের ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ যেহেতু কোন নিয়ম মেনে চলে না, সেহেতু বস্তুজগৎ সম্পর্কে কোন আগাম পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। বাস্তবে এই চিন্তাও স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়, কারণ ব্যক্তির পক্ষে যদি পারিপার্শ্বিকের রূপান্তর সম্পর্কে কোন ধারণা করা সম্ভব না হয়, তবে স্বাভাবিকভাবেই বস্তুজগতের ওপরে কোন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না ও এর ফলে ব্যক্তি-

নিজেই বস্তুজগতের রূপান্তর প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই মানুষ তখনই নিজেকে স্বাধীন বলে দাবি করতে পারে যখন সে বস্তুজগৎকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে সমর্থ হয় ও সেটি সম্ভব হয় বস্তুজগতের রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তার তাগিদে।

লেনিনের দ্বিতীয় সূত্রটি হল এই যে, ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা গৌণ, বস্তু-জগতের প্রয়োজনীয়তা মুখ্য ও স্বাধীন ইচ্ছা বস্তুজগতের ওপরে নির্ভরশীল। বস্তুজগৎ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা নির্ভর নয় বলেই মানুষ বস্তুজগৎকে পরিবর্তন করার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করতে উৎসাহী হয় ও স্বাধীনতার স্বাদ পায়। বস্তুজগৎ যদি ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছানির্ভর হত, তবে বস্তুজগৎকে পরিবর্তন করার তাগিদ ব্যক্তির থাকত না। বস্তুজগৎ ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার তুলনায় অনেক বেশী বিস্তৃত ও অজ্ঞেয় বলেই তাকে জানার ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করে বস্তুজগতের ওপরে ব্যক্তির নির্ভরতা হ্রাস করার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তি অনুভব করে।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তির পারিপার্শ্বিকের যে ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা নেই, সেই অবস্থায় ব্যক্তির কাছে স্বাধীনতার তাৎপর্য মূল্য-হীন। আমার চারপাশের দৃশ্যমান বস্তুজগৎকে যদি আমার অনুসন্ধান বা ব্যাখ্যার বিষয় বলে মনে না করি, তবে স্বাভাবিকভাবেই তাকে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তাও আমি অনুভব করব না ও ফলে স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন হবারও কোন অবকাশ থাকবে না। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত জ্ঞানের প্রগতি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রশ্নটি, যার ফলেই মানুষ বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের প্রয়ো-জনীয়তা অনুভব করে স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন হয়। স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণার স্তরটি তাই একান্তভাবে নির্ভরশীল বিজ্ঞানের প্রগতির স্তরের ওপরে, অর্থাৎ, বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সম্পর্কে চেতনারও বিকাশ ঘটে। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশলাভের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রগতি ও সমাজ-ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ স্বাধীনতা সংক্রান্ত ধারণাটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়। সমাজ-বিকাশের প্রতিটি স্তর তাই স্বাধীনতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, কারণ সামাজিক স্তরগুলির বিকাশ ঘটেছে উৎপাদিকা শক্তির ক্রমোন্নতির

ফলে। সেই অর্থে বলা যায় যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল স্বাধীনতার বাস্তব রূপায়ণের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম রূপ।

চতুর্থতঃ, বস্তুজগৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তার তাগিদে সার্থক জ্ঞানান্বেষণই শুধুমাত্র স্বাধীনতাকে সৃষ্টি করে না। অর্থাৎ, স্বাধীনতা বলতে শুধুমাত্র প্রগ্রাহ্য অপরিহার্যতাকেই বোঝায় না। বিজ্ঞানের প্রগতি অবশ্যই স্বাধীনতাব ধারণাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করে; কিন্তু স্বাধীনতার ধাবণাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয় মানুষের সচেতন কর্মপ্রক্রিয়া। বিজ্ঞান মানুষকে বস্তুজগৎ সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞানলাভের সুযোগ দেয়। সেই জ্ঞানকে বাস্তবে রূপ দিয়ে বাস্তবজগৎকে নিজেব প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করে মানুষের সচেতন অনুশীলন প্রক্রিয়া (practice)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায় যে, তত্ত্বগতভাবে অনেক বিজ্ঞানী বিভিন্ন বৈপ্লবিক ধারণার জন্ম দিলেও পাবিপার্শ্বিক ও মানুষের কর্মপদ্ধতির সীমাবদ্ধতার জন্য তাব বাস্তব রূপায়ণে দীর্ঘ সময় লেগেছে। প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী কন্‌স্তান্‌তিন সিকলকভ্‌সকি (১৮৫৭-১৯৩৫) তত্ত্বগতভাবে মহাজাগতিক উড্ডয়নের মূল সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করে গেলেও তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয় তখনই যখন প্রগ্রাহ্য অপরিহার্যতা সামাজিক কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে তত্ত্বগত জ্ঞানকে বাস্তবায়িত করে; অর্থাৎ প্রগ্রাহ্য অপরিহার্যতা তখনই স্বাধীনতার রূপ নেয় যখন তা সামাজিক তথা মানবিক অপরিহার্যতায় রূপান্তরিত হয়। তত্ত্বগতভাবে অসাম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতের এক শোষণহীন, সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কথা একাধিক ইউটোপীয় চিন্তাবিদ্‌ কল্পনা করে গেছেন। কিন্তু শোষণের জোয়াল থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ প্রকৃত অর্থে সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর প্রথমে রাশিয়াতে ও পরবর্তীকালে এশিয়া, ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। অর্থাৎ, স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হিসেবে প্রগ্রাহ্য অপরিহার্যতাকে বাস্তব রূপদান করে যে বিপ্লবী কর্ম-প্রক্রিয়া, তার সঠিক ও সার্থক প্রয়োগের ফলেই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পায়। স্বাধীনতার প্রশ্নটি তাই সচেতন কর্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে স্বাধীনতার ধর্ম হিসেবে কয়েকটি উপাদান লক্ষণীয়। এক, সম্ভাব্যতা (Chance) থেকে অপরিহার্যতায় (Necessity)

উত্তরণ সম্পর্কে সচেতনতা ; বাস্তব জগৎকে সচেতনভাবে রূপান্তরের তাগিদ সৃষ্টি করে অপরিহার্যতা। দুই, এই প্রয়োজন সৃষ্টি করে সচেতন অনুশীলন প্রক্রিয়াকে। অনুশীলনের মাধ্যমেই ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিকের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের স্বাধীন সত্তাকে আবিষ্কার করে। তিন, বাস্তব জগৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করার ক্ষমতা ব্যক্তিকে বস্তুজগৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করতে সাহায্য করে। চার, মানুষ যে উপাদানটির সার্থক প্রয়োগ করে পারিপার্শ্বিকের ওপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় স্বাধীনতাকে অনেক বেশী পরিমাণে উপভোগ করে, সেই শ্রম (labour) হবে যত বেশী স্বতঃস্ফূর্ত, শোষণমুক্ত ও অপর মানুষের নিয়ন্ত্রণমুক্ত, স্বাধীনতাও হবে তত বেশী পরিমাণে অর্থবহ। এক কথায়, স্বাধীনতার প্রশ্নটি শ্রমের মুক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মার্কসীয় দর্শনে স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে সাধারণতঃ তিনটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। প্রথমতঃ, শ্রমের মুক্তি যেহেতু স্বাধীনতার অন্যতম পূর্বশর্ত, অর্থাৎ, শ্রমমুক্তির ব্যাপকতা ও স্বাধীনতার ব্যাপ্তি যেহেতু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেহেতু উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে মানুষ যে মুহূর্তে প্রকৃতিজগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বস্তুজগতের ওপরে শ্রমের মাধ্যমে তার প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, সেই মুহূর্তে জন্ম নেয় স্বাধীনতার ধারণা। অর্থাৎ, স্বাধীনতা সম্পর্কে চেতনাবোধ প্রকৃতিরাজ্যে মানুষেব শ্রমক্ষমতাব মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বিকাশ সমাজের বুকে জন্ম দেয় যে শ্রেণী ও শ্রেণীবিভাজনের, তার ফলে শ্রমকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার ক্রমবিকাশে এক জটিলতা দেখা দেয়। একাধারে উৎপাদিকা শক্তির প্রগতি ও সমাজ-বিকাশের অগ্রগতির ফলে ব্যক্তি যেমন তার শ্রমক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ন্ত্রণের কবলমুক্ত হয়ে নিজের সৃষ্টিশীল স্বাধীন সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করে ও সে অর্থে সমাজজীবনের প্রগতি স্বাধীনতার ধারণার বিকাশের সঙ্গে সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি আবার সমাজজীবনে শ্রেণীদ্বন্দ্বের উপস্থিতি ও তার তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে অধিকাংশ মানুষেব পক্ষেই তাদের সামাজিক শ্রমের মুক্তি ঘটান সম্ভবপর হয় না। দাসসমাজে মানুষের সামাজিক শ্রমকে নিয়ন্ত্রিত করেছে দাসমালিকরা, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ভূমিদাসদের নিয়ন্ত্রিত

করেছে সামন্তপ্রভুরা এবং পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমক্ষমতা আবদ্ধ হয় পুঁজিপতিদের শৃংখলে। যেহেতু উৎপাদিকা শক্তির প্রগতির ফলে প্রকৃতি-জগতের নিয়ন্ত্রণ থেকে মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির উৎসারণ প্রক্রিয়া ক্রমাগত এগিয়ে গেছে, সেই কারণে মানুষের সামাজিক মুক্তি ও সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃত বাস্তবায়ন হয় তখনই যখন অবসান হয় সব শোষণের ও যখন মানুষের সৃষ্টিশীল শ্রম অপরের স্বার্থে নিয়োজিত হয় না।

তৃতীয়তঃ, প্রাকৃতিক নিয়মের অমোঘতা থেকে মুক্তি ও অপরদিকে সমস্ত রকমের শোষণ থেকে মুক্তি,—এই উভয় প্রক্রিয়ার সার্থক যোগফল মানুষকে দিতে পারে তার আত্মিক মুক্তি। এই আত্মিক মুক্তি বলতে বোঝায় সমস্ত রকমের সংস্কার, অন্যায় ও পাপকার্যের উর্ধ্বে মানুষ যখন নিজেকে তার নৈতিক আত্মোপলব্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই মুক্তিই মানুষকে করে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন, কারণ এই স্বাধীনতা শ্রেষ্ঠতম মানবিক মূল্যবোধগুলির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতাকে এই অর্থেই কল্পনা করেছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্‌রা আর এভাবেই মানুষ স্বাধীনতাকে এক চূড়ান্ত সৃষ্টিশীল রূপ দিতে সক্ষম। একদিকে বস্তুজগতের ওপরে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, অপরদিকে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজজীবনকে আরও সুসংবদ্ধ করে গড়ে তোলা ও সবশেষে মানুষের শ্রমের আত্মিক মুক্তিকে সুনিশ্চিত করে স্বাধীনতার চূড়ান্ত স্বাদ গ্রহণ, যার প্রকাশ ঘটে মানুষের নান্দনিক সৃষ্টির প্রকাশে,—ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছে স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে।

॥ ৩ ॥

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব ও সাম্প্রতিককালের বিতর্ক

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা বা মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্র সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পাই, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গী তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রশ্নটিকে একাধিক তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। সেন্ট্ টমাস্ এ্যাকুয়িনাস দেখাতে চেয়েছেন যে, রাষ্ট্র হল ঈশ্বরের সৃষ্টি,—অর্থাৎ, রাষ্ট্রের উৎপত্তির পিছনে সমাজজীবন বা সমাজ-

ব্যবস্থার কোন ভূমিকা ছিল না। হব্‌স, লক্‌, রুশো প্রমুখেরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, রাষ্ট্র মূলতঃ সমাজের সমষ্টিগত ইচ্ছার ফলশ্রুতি,—অর্থাৎ, রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রয়োজন হয়েছিল সামাজিক জীবনকে একটি সুষ্ঠু ও বাস্তবসম্মত রূপ দেবার স্বার্থে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ রষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত এই ধারণাগুলিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে। মার্কসীয় তত্ত্বে রাষ্ট্র কোন ঐশ্বরিক ইচ্ছা প্রসূত সংগঠন নয় বা রাষ্ট্র সমাজের সামগ্রিক স্বার্থেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও তার চরিত্র সংক্রান্ত ব্যাখ্যা মার্কস-এঙ্গেলসের একাধিক রচনায় বিধৃত রয়েছে। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মার্কস-এঙ্গেলসের যুগ্ম রচনা The Communist Manifesto (১৮৪৮), এঙ্গেলসের The Origin of the Family, Private Property and the State (১৮৮৪) প্রভৃতি। পরবর্তীকালে লেনিন তাঁর The State and Revolution (১৯১৭), সভ্‌দেরদ্‌লাভ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ The State (১৯১৯) প্রভৃতি রচনার মাধ্যমে রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যাকে আরও দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্র হল একটি বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন, যার প্রাধিকার (authority) সমাজজীবনে অন্যান্য সব সংগঠনের কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল যে, রাষ্ট্রীয় প্রাধিকার একান্তভাবে পীড়ন ও বলপ্রয়োগের যন্ত্রবিশেষ, যা উৎপীড়নের মাধ্যমে নিজের কর্তৃত্বকে বজায় রাখে। এই বলপ্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত থাকে দমনপীড়নের জন্য সৃষ্ট একাধিক সংস্থা, যথা পুলিশ, সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র, গোয়েন্দাবাহিনী প্রভৃতি। রাষ্ট্রের এই কর্তৃত্ব সার্বভৌম ও চূড়ান্ত, যা ব্যক্তি নির্বিশেষে গোটা সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিটি সদস্যের প্রতি প্রযোজ্য। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, মার্কসীয় তত্ত্বে রাষ্ট্রকে কেন নিপীড়ন ও দমনের যন্ত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রের এই চরিত্রচিত্রণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রশ্নটি। আদিম সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ-লাভের ফলে যে শ্রেণীভিত্তিক উৎপাদন সম্পর্কের জন্ম হয়েছিল, তা থেকে সৃষ্ট হয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কারণ, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে দেখা গেল যে, সামাজিক প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত সম্পদ মানুষ তার শ্রমশক্তির প্রয়োগে সৃষ্টি করতে সক্ষম। এই উদ্বৃত্ত সামাজিক সম্পদ সৃষ্টির পূর্বে উৎপাদিত ভোগ্যবস্তুর মালিকানা ছিল সামগ্রিকভাবে সমাজের হাতে। কিন্তু

উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টির ফলে জন্ম নিল এই সম্পদকে করায়ত্ত করে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা ও তার জন্য প্রয়োজন দেখা দিল উৎপাদন উপকরণের ওপরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার। এইভাবেই আদিম সাম্যবাদী সমাজের সংহতি ভেঙ্গে গিয়ে জন্ম নিল সংঘাত। আদিম সাম্যবাদী সমাজে যাঁরা মোটামুটিভাবে নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পুরোহিত বা সর্দার শ্রেণীর ব্যক্তি, সংখ্যায় সীমিত হলেও এঁরাই স্বাভাবিকভাবে চাইলেন সম্পত্তির ওপরে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে, যাতে গোটা সমাজের উৎপাদনব্যবস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে সামাজিক সম্পদকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা যায়। শ্রেণীবিভাজনের পূর্বে সমাজব্যবস্থায় যে সামগ্রিক ঐক্যটি ছিল, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভাবনের ফলে সে ঐক্য বজায় রইল ঠিকই; কিন্তু তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন দেখা দিল বলপ্রয়োগের। অর্থাৎ, পূর্বে যেখানে সামগ্রিক প্রয়োজনে সমাজ-ব্যবস্থার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখন মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি উৎপাদনব্যবস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠের শ্রমশক্তিকে নিজেদের স্বার্থে নিয়োজিত করার জন্য ভীতি প্রদর্শন, উৎপীড়ন ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন উপকরণের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট হল। তার ফলশ্রুতিরূপে দেখা দিল প্রথমতঃ, রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা, যে সম্পর্ক সৃষ্ট হল সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে; দ্বিতীয়তঃ, দমনপীড়নের যন্ত্র-রূপে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হল। এই অসম, বৈর সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন দেখা দিল রাজনৈতিক প্রাধিকারের, যার নিয়ন্ত্রণবিন্দুরূপে সৃষ্টি হল রাষ্ট্রের। রাজনীতিকে তাই বলা হয় শোষকশ্রেণীর অর্থনৈতিক লিপ্সা চরিতার্থ করার ও সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার প্রয়োজনে দমন-পীড়নের প্রয়োজনের ফলশ্রুতি।

এ থেকে বোঝা যায় যে, সমাজে শ্রেণীসম্পর্কের উদ্ভব, রাজনীতির বিকাশ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমাজব্যবস্থায় বৈর উৎপাদন সম্পর্কের আবির্ভাবের ফলে সৃষ্টি হয় যে সংঘাতমূলক শ্রেণীদ্বন্দ্বের, তা জন্ম দেয় উদ্বৃত্ত সম্পদের ওপরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিরোধমূলক সম্পর্ককে যার অপর নাম রাজনৈতিক সম্পর্ক, ও এই সংখ্যালঘুর শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় এক দমনমূলক যন্ত্রের, যার নাম রাষ্ট্র। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে নয়; রাষ্ট্রের আবির্ভাব

হয়েছে সমাজে মুষ্টিমেয় শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য। সুতরাং রাষ্ট্র আবহমান কাল থেকে ছিল না। রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে সমাজবিকাশের একটি বিশেষ পর্বে ও শোষক শ্রেণীর স্বার্থে। অতএব, সমাজে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর বৈর সম্পর্ক যতদিন বজায় থাকবে, অর্থাৎ, উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র যতদিন সংঘাতধর্মী হবে, ততদিন শোষক শ্রেণীর স্বার্থে রাষ্ট্রের অস্তিত্বও বজায় থাকবে। ম্যাকমারটুরির (McMurty) বক্তব্যকে অনুসরণ করে একথা তাই বলা যেতে পারে যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র দু'ভাবে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ সিদ্ধ করে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রযন্ত্র তার আপাতনিরপেক্ষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের (যেমন আইন, আমলাতন্ত্র, বিভিন্ন সরকারী নির্দেশ ইত্যাদি) মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে রাষ্ট্র সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের স্বার্থের প্রতিনিধি, যদিও রাষ্ট্রের এই প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যগুলি শাসকশ্রেণীর স্বার্থেই সৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রযন্ত্র শাসকশ্রেণীর সামগ্রিক নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে, এবং যখনই এই নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকা দেখা দেয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের দমনমূলক চেহারাটিও তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সমাজে শোষকশ্রেণীর আধিপত্য বজায় রাখার জন্য শোষিত শ্রেণীকে দমনপীড়ন করার স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্রের দু'টি মূল বৈশিষ্ট্যকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ চিহ্নিত করেছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রীয় প্রাধিকার সংগঠিত হয় স্থানিক নীতির (territorial principle) ভিত্তিতে। যে নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের ওপরে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বজায় থাকে, সেই অঞ্চলের ওপরে রাষ্ট্রব্যবস্থা যে শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করে তার আধিপত্য চূড়ান্তভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে যে শোষণব্যবস্থা পরিচালিত হয়, সেটি সেই স্থানিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাষ্ট্রব্যবস্থা সৃষ্টির পূর্বেও গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজে এই নীতি যে ছিল না তা নয়। কিন্তু আদিম সাম্যবাদী সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বাসস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকলেও সমাজজীবন সংগঠিত ছিল প্রধানতঃ জ্ঞাতিসম্পর্কের (Kinship) ভিত্তিতে। রাষ্ট্রব্যবস্থার শ্রেণীভিত্তি রাষ্ট্রকে স্থানিক নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে।

রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারের অস্তিত্ব। আদিম সাম্যবাদী সমাজে অবশ্যই এক ধরনের সামাজিক প্রাধিকারের উপস্থিতি ছিল, যার ভিত্তিতে আদিম গোষ্ঠীজীবন বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতির

ভিত্তিতে পরিচালিত হত। কিন্তু রাষ্ট্র যেহেতু সমাজজীবন থেকে পৃথক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, দমনমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সেহেতু শোষক শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়। রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারের মূলতঃ তিনটি কর্মধারা লক্ষণীয়। এক, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ ধরনের ব্যক্তিদের, যাদের হাতে ন্যস্ত থাকে রাষ্ট্রব্যবস্থার সামগ্রিক পরিচালনার দায়িত্ব ও ভার। এই সংস্থাটিকে বলা হয় (Government)। দুই, রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারের অন্যতম কাজ হল অস্ত্রধারী বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের মাধ্যমে দমনমূলক ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা, যেমন, পুলিশ, মিলিটারি, গোয়েন্দাবাহিনী ইত্যাদি। তিন, রাষ্ট্রযন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন হয় জনসাধারণের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে কর আদায় করে অর্থ সংগ্রহ করা।

রাষ্ট্রশক্তির এই দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের মাধ্যমেই শোষক শ্রেণী তার অর্থনৈতিক শ্রেণীস্বার্থকে রাজনৈতিক রূপ ও আইনগত স্বীকৃতি দিতে সক্ষম, কারণ রাষ্ট্রই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেটি একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর রাজনৈতিক আধিপত্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে আইনগতভাবে সমর্থন যোগায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলিব ভিত্তিতে রাষ্ট্রের দু'টি প্রধান কার্যাবলী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ অনুযায়ী বিশেষ এক ধরনের ব্যবস্থাকে প্রয়োজনে, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, জনসাধারণের কাছে গ্রহণীয় করে তুলে শোষক শ্রেণীর আধিপত্য বজায় রাখে। বহির্বিষয়ক ক্ষেত্রে, সামরিক বাহিনীর শক্তি, কূটনৈতিক চাল প্রভৃতির ওপরে ভিত্তি করে রাষ্ট্র তার নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে অপর রাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাঁচিয়ে রাখে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র একটি বিশেষ আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকারী শ্রেণীর প্রতিনিধি মাত্র। দাসব্যবস্থায় রাষ্ট্র দাসমালিকদের স্বার্থকে রক্ষা করত। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র সামন্তপ্রভুদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষাকারী। এই ব্যাখ্যা থেকে খুব সহজেই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, প্রতিটি রাষ্ট্রই সমাজে শাসকশ্রেণীর হাতের যন্ত্রবিশেষ, অর্থাৎ, রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পূর্ণভাবেই সমাজের শাসকশ্রেণীর ওপরে নির্ভরশীল ও রাষ্ট্রশক্তির

নিজস্ব কোন আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য নেই; ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কিন্তু রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণাকে এই জাতীয় একপেশে দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে না। সাধারণভাবে যে কোন রাষ্ট্রযন্ত্রই সমাজের শাসকশ্রেণীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন মনে হলেও মার্কস তাঁর The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (১৮৫২) ও আরও একাধিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে এ কথাটিও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন যে, সব সমাজব্যবস্থাতেই শাসকশ্রেণী সম্পূর্ণ এককভাবে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না; অর্থাৎ শাসকশ্রেণী যেখানে উৎপাদনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করতে সক্ষম নয়, যার ফলে শাসকশ্রেণীর দুর্বল চরিত্রের জন্য তার মধ্যে একতার পরিবর্তে দেখা যায় তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও অন্তর্কলহ, সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপরে শাসকশ্রেণীর একচ্ছত্র আধিপত্যের অভাবের ফলে শাসকশ্রেণী ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্র এক ধরনের আপেক্ষিক রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় (যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের ফ্রান্সে লুই নেপোলিয়নের রাজত্বে বা বিসমার্কের জার্মানীতে) যে, শাসকশ্রেণীর দুর্বলতার ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রত্যক্ষ পরিচালনভার যাদের হাতে ন্যস্ত, তারা নিজেদের গোষ্ঠী-স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে ক্ষমতায় টিঁকে থাকার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র সামগ্রিকভাবে গোটা শাসকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীনে যন্ত্র হিসেবে কাজ না করে কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরূপে আবির্ভূত হয়, যার ফলে সমগ্র শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তি এই পরিস্থিতিতে এক ধরনের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। মার্কসের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ অনুযায়ী বলা যায়, যে সব দেশে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছে সে সব ক্ষেত্রে শক্তিশালী পুঁজিপতিশ্রেণীর উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠার ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপরে শাসকশ্রেণীর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব (যেমন, ব্রিটেন)। সেখানে রাষ্ট্রশক্তি শাসকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে এককভাবে কোন স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। পক্ষান্তরে, যে সব দেশে শাসকশ্রেণী যথেষ্ট শক্তিশালী ও উন্নত নয়, সে সব স্থানে রাষ্ট্রযন্ত্রের কোন একটি বিভাগ প্রাধান্য অর্জন করে যার পরিণতিতে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রশক্তির আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড্রেপার (Draper) সঠিকভাবেই কয়েকটি কারণ নির্দেশ করেছেন, যেগুলি উল্লেখের

দাবী রাখে। প্রথমতঃ, সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে গেলে রাষ্ট্রশক্তি ভারসাম্য রক্ষার ভূমিকায় আবির্ভূত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়ে শাসকশ্রেণী যখন নিজস্ব ক্ষয়প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং যেখানে অন্য কোন শ্রেণীও বিকল্প নেতৃত্ব দিতে অক্ষম, সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। তৃতীয়তঃ, যেখানে নিজস্ব রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সমাজব্যবস্থার আধুনিকী-করণ প্রক্রিয়াকে সুনিশ্চিত করতে সব শ্রেণীই ব্যর্থ, সেখানে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক পশ্চিমী মার্কস গবেষকদের মধ্যে রাল্‌ফ মিলিব্যাণ্ড (Ralph Miliband), জন প্ল্যামেনাৎস (John Plamenatz), শ্লোমো আভিনেরি (Shlomo Avineri), জে. বি. স্যাণ্ডারসন (J. B. Sanderson) প্রমুখেরা মনে করেন যে মার্কস রাষ্ট্র সম্পর্কে মূলতঃ দু'টি মডেল আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে' রাষ্ট্রকে বর্ণনা করা হয়েছে শাসকশ্রেণীর হাতে শোষণের হাতিয়ার রূপে। Eighteenth Brumaire-এ মার্কস রাষ্ট্রর আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ, মার্কস 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে' বর্ণিত মডেল-টিকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করেননি। দ্বিতীয় মডেলটির গুরুত্ব সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সেই সঙ্গে মিলিব্যাণ্ড, আভিনেরি প্রমুখেরা এ কথা বলে থাকেন যে, এই দুটি মডেলের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলসের মধ্যে বিরোধিতা ছিল, কারণ এঙ্গেলস প্রথম মডেলটিকেই চূড়ান্ত বলে স্বীকার করেছিলেন ও দ্বিতীয় মডেলটিকে তিনি আদৌ কোন গুরুত্ব দেননি। রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের দুই মডেলের তত্ত্ব আজ সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু এই প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলসের মধ্যে যে তথাকথিত বিরোধিতার প্রশ্নটি তোলা হয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত। অনেক পশ্চিমী তাত্ত্বিকও এই অভিযোগকে অস্বীকার করেছেন। যেমন, লেস্‌লি ম্যাক্‌ফারলেন (Leslie Macfarlane) দেখিয়েছেন[4] যে, এঙ্গেলস তাঁর The Origin of Family-তে প্রথম মডেলটিকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে এ কথাও স্পষ্টই বলেছেন যে,

---

4 Leslie Macfarlane, 'Marxist Critiques of the State', in Bhiku Parekh (ed.), *The Concept of Socialism*, পৃঃ ১৬৭-১৭০।

ব্যতিক্রম হিসেবে বিবাদমান শক্তিগুলির সংঘাত অনেক সময় এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যখন রাষ্ট্র সেই বিরোধ মীমাংসা করার ছলে এক ধরনের স্বাধীনতা অর্জন করে ("Exceptional periods, however, occur when the warring classes are so nearly equal in forces that the state power, as apparent mediator, acquires for the moment a certain independence in relation to both")। এ ছাড়া এঙ্গেলস একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পত্রে দ্বিতীয় মডেলটির তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করে গেছেন। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেপ্টেম্বর ১৮৯০ সালে জে. ব্লখ্ (J. Bloch)-এর কাছে ও জানুয়ারী ১৮৯৪ সালে এইচ. স্টারকেনবুর্গের কাছে লেখা তাঁর একাধিক পত্রাবলী।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে পশ্চিমের আধুনিক শিল্পোন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্র বিশ্লেষণের প্রশ্নে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। সাম্প্রতিককালের মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কে বিতর্ক মূলতঃ এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। আজকের দিনে এই বিতর্ক একাধিক ধারার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। এক, ব্রিটিশ তাত্ত্বিক রাল্‌ফ মিলিব্যাণ্ড ও ফরাসী তাত্ত্বিক নিকোস্ পুলানৎজাস্ (Nicos Poulantzas)-এর বিতর্ক। দ্বিতীয়তঃ, মুফে (Mouffe) ও লাকলাউ (Laclau)-এর নয়া-গ্রাম্‌শচিয় তত্ত্ব। তৃতীয়তঃ, পশ্চিম জার্মানীর এক শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের এই প্রশ্নে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ ও তাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক, যেটি "জার্মান বিতর্ক" (German Debate) নামে খ্যাত। চতুর্থতঃ, হাবেরমাস (Habermas) প্রমুখের রাষ্ট্র প্রসঙ্গে বিকল্প ব্যাখ্যা।

মিলিব্যাণ্ড-পুলানৎজাস্ বিতর্ককে সাধারণতঃ যন্ত্রবাদ (instrumentalism) বনাম অবয়ববাদ (structuralism) তর্ক আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে, যদিও পরবর্তীকালে পুলানৎজাস্ তাঁর তাত্ত্বিক অবস্থানকে অবয়ববাদ নামে অভিহিত করার বিরুদ্ধে মত পোষণ করেছেন। মিলিব্যাণ্ড তাঁর The State in Capitalist Society (১৯৬৯) গ্রন্থে আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পাশ্চাত্যের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রাষ্ট্র হল প্রধানতঃ শাসক পুঁজিপতি শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি হাতিয়ার। তথ্য-সহযোগে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, প্রথমতঃ, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ (যথা পুলিশ, আমলাবাহিনী, সামরিক বাহিনী প্রভৃতি) যাঁদের

কর্তৃত্বাধীন, তারা প্রায় সকলেই অর্থনৈতিক স্তরের বিচারে পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিনিধি। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেন, মিলিব্যাণ্ডের মতে অচিরেই ব্যক্তিগত প্রভাব, পদমর্যাদা ও কর্মস্থলের পরিবেশের গুণে তাঁদের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর এমন এক সম্পর্কের গ্রন্থিবন্ধন হয় যে রাষ্ট্রযন্ত্র বিষয়গতভাবে শাসকশ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থরক্ষাকারী একটি শোষণ-যন্ত্ররূপে আবির্ভূত হতে বাধ্য হয়। তাই মিলিব্যাণ্ডের মত অনুযায়ী, এই দেশগুলিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের শ্রেণীচরিত্র রাষ্ট্রশক্তির পরিচালকমণ্ডলীর শ্রেণী অবস্থান-অনুযায়ী নির্ণীত হয়, অর্থাৎ, রাষ্ট্রযন্ত্র একান্তভাবেই শাসকশ্রেণীর অবস্থান-নির্ভর। মিলিব্যাণ্ডের এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় উইলিয়াম ডোমহফ্ (William Domhoff)-এর রচনায়। মিলিব্যাণ্ডের মত তিনিও রাষ্ট্রশক্তি ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকারী শ্রেণীর পারস্পরিক প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে তাঁর বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু মনে করেন।

পুলানৎজাসের তত্ত্বটি মিলিব্যাণ্ডের বক্তব্যের প্রায় বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে রাষ্ট্র সম্পর্কে পুলানৎজাসের ব্যাখ্যা বহুলাংশেই ইতালীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামশ্‌চি ও যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক লুই আলতুশের (Louis Althusser) ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। সেই কারণে পুলানৎজাসের তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করতে হলে প্রথমে গ্রামশ্‌চি ও আলতুসের চিন্তা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায় উপরি কাঠামোর তাত্ত্বিক গুরুত্বকে প্রথম সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেন গ্রামশ্‌চি। রাষ্ট্রীয় উপরিকাঠামো একান্তভাবেই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের এই প্রচলিত সরল ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করে তিনি দেখান যে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকট আবশ্যিকভাবে রাষ্ট্রের সংকট সূচিত করে না। ধনতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও যখন আমরা দেখি যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রতন্ত্র রাজনৈতিক সংকট ও রাষ্ট্রশক্তির পতনের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করতে সক্ষম, তখন স্বভাবতই প্রশ্নে ওঠে, এই প্রতি-রোধের উৎসটি কোথায়। গ্রামশ্‌চির মতানুসারে একটি সংহত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শক্তির অন্যতম প্রধান উৎসটি হল তার সামগ্রিক পুর-সামাজিক ব্যবস্থা (civil society), অর্থাৎ, তার সাংস্কৃতিক—মতাদর্শগত পরিমণ্ডল এবং তার প্রতিনিধিত্ব করে যে প্রতিষ্ঠানসমূহ সেগুলি। এই উপরিকাঠামো-

গত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি দীর্ঘদিন ধরে জনসাধারণের চিন্তা-ভাবনাকে প্রচলিত ব্যবস্থা ও স্থায়িত্বের পক্ষে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয় ও তার ফলে এই উপরিকাঠামোগত প্রভাব চরম সংকটের মুখেও রাষ্ট্রশক্তিকে পরিখার মত বেষ্টন করে রাখতে পারে। পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার প্রসঙ্গে গ্রামশ্‌চি তাই বলেছিলেন যে, এই সব দেশে সর্বাগ্রে প্রয়োজন চিন্তাজগতের স্তরে ভাঙ্গন ধরিয়ে উপরিকাঠামোয় প্রলেতারিয়েতের বিকল্প আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা এবং এটিই হবে রাষ্ট্রশক্তি দখলের অন্যতম শর্ত। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির গভীর সংকটমুহূর্তেও রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সামরিক কায়দায় সরাসরি আঘাত হেনে শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতাকে করায়ত্ত করাকে সুনিশ্চিত করতে পারে না, যদি না উপরি-কাঠামোর স্তরে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্নটিকে প্রলেতারিয়েত তার বিপ্লবের অন্যতম রণকৌশলরূপে গণ্য না করে।

লুই আলতুসে বহুলাংশে গ্রামশ্‌চিকে অনুসরণ করলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয়তাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তিনি দাবি করেন যে, মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রাষ্ট্র প্রসঙ্গে আলোচনার একটি আপেক্ষিক রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য আছে এবং এটিকে কোনমতেই নিছক অর্থনৈতিক স্তরের যান্ত্রিক প্রতিফলন হিসেবে দেখা যায় না। তাঁর মতে, উন্নত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রশক্তি তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় মতাদর্শগত রাষ্ট্রকাঠামোকে (Ideological State Apparatus বা ISA) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, অর্থাৎ, মানুষের মননপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এমন যে সব প্রতিষ্ঠান (অর্থাৎ, পরিবার, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, প্রচারমাধ্যম প্রভৃতি) সেগুলিকে করায়ত্ত করেই প্রধানতঃ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তি সমাজে তার প্রাধান্যকে সুনিশ্চিত করে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে আলতুসে রাষ্ট্রশক্তির আলোচনাকে অর্থনৈতিক কাঠামোর আলোচনা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখতে প্রয়াসী এবং এই যুক্তিতে মার্কসবাদে রাষ্ট্রবিষয়ক আলোচনা মূলতঃ একটি উপরি-কাঠামোগত প্রশ্ন, এবং সেটি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে যান্ত্রিকভাবে সম্পৃক্ত নয়। তাঁর আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায় নিছক অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিশ্লেষণ রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে যে শ্রেণীশক্তি তার আধিপত্যের রাজনৈতিক চরিত্রকে ব্যাখ্যা করে না। সেখানে প্রয়োজন হল উপরিকাঠামোর স্তরে রাষ্ট্রযন্ত্র

কোন্ পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করে তার বিশ্লেষণ এবং এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বিচারের প্রশ্নটি অর্থবহ হয়ে ওঠে।

গ্রামশ্‌চি ও আলতুসের চিন্তা পুলানৎজাসকে গভীর অনুপ্রেরণা যোগায় এবং সে কারণে দেখা যায় যে বিভিন্ন রচনায় তিনি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রশ্নটিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিছক প্রতিফলনরূপে বিচার করেননি। শাসকশ্রেণীর অর্থনৈতিক শ্রেণীঅবস্থান তাদের রাজনৈতিক অবস্থানকেও আবশ্যিকভাবে নির্ণয় করে,—মিলিব্যাণ্ডের এই প্রতিবেদনের সঙ্গে পুলানৎজাস তাই একমত হতে পারেননি। তিনি রাষ্ট্রশক্তির প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করেছেন রাষ্ট্রকাঠামোর উপরিসৌধগত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং এখানেই নিহিত আছে তাঁর অভিনবত্ব। তাঁর এই অভিনব প্রয়াসই পুলানৎজাসকে সাম্প্রতিককালের অন্যতম বিতর্কিত তাত্ত্বিকরূপে চিহ্নিত করেছে।

পুলানৎজাস মিলিব্যাণ্ডের বক্তব্যের প্রথম সমালোচনা করেন The State in Capitalist Society-এর পর্যালোচনা প্রসঙ্গে সত্তরের দশকে New Left Review-তে ও পরবর্তীকালে এই বক্তব্যকে আরও বিস্তৃত রূপ দেন তাঁর Political Power and Social Classes (১৯৭৩) গ্রন্থে। তাঁর মতে, আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব তীব্রতম আকার ধারণ করার ফলে পুঁজিপতিশ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এক চূড়ান্ত সঙ্কটের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে ও তার ফলে পুঁজিপতিদের শ্রেণীঐক্য বিনষ্ট হয়ে পুঁজিপতিশ্রেণী একাধিক উপদলে (faction) বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে রাষ্ট্রশক্তি সামগ্রিকভাবে পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে একথা মনে হলেও পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপরে পুঁজিপতি-শ্রেণীর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করে দিয়েছে ও তার পরিণতিতে এই দেশগুলিতে রাষ্ট্রশক্তির আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। পুলানৎজাসের মতে, পুঁজিপতিশ্রেণী আজ একাধিক ক্ষমতা-গোষ্ঠীতে (power bloc) বিভক্ত হয়ে যাবার ফলে রাষ্ট্র এই ক্ষমতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে ও তার ফলে বিভিন্ন সময়ে এই গোষ্ঠীর পক্ষে এক একটি উপদল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। পুলানৎজাস্ আবার এ কথাও মনে করেন যে, পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রের কাঠামো বিষয়গতভাবে পুঁজিবাদী শ্রেণী-চরিত্র অর্জন করে, কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণীসংগ্রাম, যা সমাজের

অসম বণ্টনব্যবস্থা থেকে উৎসারিত হয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে মধ্যস্থিত (mediated) হয়ে সমাজব্যবস্থায় সামগ্রিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র উপরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বলে শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিফলন যেমন ঘটায়, তেমনি আবার পুঁজিবাদী শ্রেণীসম্পর্কপ্রসূত বলে এই রাষ্ট্রশক্তি পুঁজিবাদী সমাজের স্থিতিশীলতাকে বজায় রেখে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গতিশীলতাকে সুনিশ্চিত করে। মিলিব্যাণ্ডের যন্ত্রবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে পুলানৎজাস্ তাই বলেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রশক্তির বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃত্ব যাদের হাতে ন্যস্ত, তারা পুঁজিবাদের প্রতিনিধি বলে রাষ্ট্রও পুঁজিবাদী চরিত্র অর্জন করে এ কথা ঠিক নয়। তাঁর মতে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বিষয়গতভাবে ও কাঠামোগত গুণে রাষ্ট্র এমনই এক প্রতিষ্ঠান যে তার চরিত্র রাষ্ট্রযন্ত্রে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের শ্রেণী অবস্থানের ওপরে নির্ভর করে না। বরং তারা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে অংশগ্রহণ করার ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান বিষয়গতভাবে পুঁজিবাদের স্বপক্ষে নির্ধারিত হয়ে যেতে বাধ্য হয়, যা তাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষ ও যার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। অর্থাৎ, পুলানৎজাসের ভাষ্য অনুযায়ী, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা তার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের জন্য যে আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে, তারই প্রভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রে অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক অবস্থান নির্ণীত হয়; রাষ্ট্রের চরিত্র রাষ্ট্রব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক অবস্থান দ্বারা নিরূপিত হয় না; এক কথায়, পুলানৎজাসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রকাঠামোর অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগের প্রাধান্য অর্জন পুঁজিবাদী সমাজের দ্বন্দ্বমূলক শ্রেণীবিন্যাসেরই ফলশ্রুতি। অর্থাৎ, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাঠোমোগত চরিত্র পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরীণ শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিণতি হওয়ায় তার চরিত্রেও এই দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে ও যার ফলে দেখা যায় যে, একটি সংগঠিত রাষ্ট্রযন্ত্রের বদলে সমগ্র রাষ্ট্র-কাঠামোটিতে বিশেষ কোন গোষ্ঠী বা বিভাগ প্রাধান্য অর্জন করে। বিষয়-গতভাবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামো যে গোষ্ঠী বা বিভাগের আধিপত্যকে নির্দিষ্ট করে দেয়, তার ফলেই সমগ্র শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র এক ধরনের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পুলানৎজাসের ভাষ্যের দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে পুঁজিবাদী শ্রেণীর

রাজনৈতিক আধিপত্যের উৎসটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রের মধ্যেই নিহিত আছে। দ্বিতীয়তঃ, এই বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে পুলানৎজাস তাঁর একাধিক রচনায় বিভিন্ন শ্রেণীগোষ্ঠী কোন্ ধরনের রাজনৈতিক ও আদর্শগত পদ্ধতি অনুসরণ করে রাষ্ট্রীয় উপরিকাঠামোর স্তরে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষিত করতে সচেষ্ট হয়, তার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর এই উপরিকাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গীকে বব জেসপ (Bob Jessop), পেরী এ্যাণ্ডারসন (Perry Anderson), ই. লাক্লাউ (E. Laclau) প্রমুখেরা সমালোচনা করেছেন। এঁদের বক্তব্যের মূল কথা হল, পুলানৎজাস এবং আলতুসে উভয়েই রাষ্ট্রশক্তির স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে উপরিকাঠামোর কোন পরোক্ষ অর্থনৈতিক যোগসূত্রকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন ও তার পরিণতিতে এই মতবাদ বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এক ধরনের বিমূর্ত রাষ্ট্রতত্ত্বে পরিণত হয়েছে। পুলানৎজাসের সমালোচকরা এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তি যে সব উপরিকাঠামোগত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সেগুলির কোনটিই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হল বিভিন্ন ধরনের প্রচারমাধ্যম। তত্ত্বগতভাবে সেগুলির অবস্থান উপরিকাঠামোগত হলেও প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিষ্ঠানগুলি হল সরকারী ও বেসরকারী পুঁজি নিয়োগের অতি বৃহৎ এক একটি সংস্থা এবং সেই কারণে এদের চরিত্রকে উৎপাদনসম্পর্ক নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে না।

পুলানৎজাস্ যেমন প্রধানতঃ রাষ্ট্রশক্তির কাঠামোগত প্রশ্নটিকেই মূল বিচার্য বিষয়রূপে গণ্য করেছেন, নয়া গ্রামশিয় দুই তাত্ত্বিক মুফে (Mouffe) ও লাক্লাউ (Laclau) মতাদর্শ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রশক্তির চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রামশ্চি তাঁর "জেলখানার নোটবুক"-এ (Prison Notebooks) রাষ্ট্রশক্তি দখলের প্রশ্নে বিকল্প প্রলেতারীয় মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকে যেভাবে চিহ্নিত করেছিলেন, এঁদের কাছে সেটিই প্রধান বিচার্য বিষয়। এঁরা গ্রামশ্চির চিন্তাকে মূলতঃ অর্থনীতিবাদ (economism) বিরোধী বলে মনে করেন এবং এঁরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রশক্তিকে বিচার করার প্রশ্নে গ্রামশ্চি মতাদর্শগত প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে যে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেটিই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। গ্রামশ্চির একাধিক রচনায়

স্ত্রকে অনুসরণ করে এঁরা দেখাতে চেয়েছেন যে মতাদর্শ নিছকই একটি শ্রেণীগত ধারণা নয়; মতাদর্শগত উপাদানগুলি ইতিহাসগত কারণে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন চেহারায় অবস্থান করে; অর্থাৎ, মতাদর্শগত জগৎ এককভাবে কোন বিশেষ শ্রেণীর অর্থনীতিক ভিত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। মতাদর্শ গঠিত হয় যে উপাদানগুলি দিয়ে, সমাজে তাদের অবস্থান একান্তই বাস্তব ইতিহাসনির্ভর। বিভিন্ন শ্রেণী এই উপাদানগুলিকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে বিভিন্ন মতাদর্শগত কাঠামো প্রস্তুত করে। প্রলেতারিয়েতের পক্ষে রাষ্ট্রশক্তি দখলের প্রশ্নে মতাদর্শগত প্রাধান্য বিস্তারের বিষয়টি তাই এই অর্থেই জরুরি যে পুঁজিবাদী সমাজেও প্রলেতারীয় মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা দেয় সেই উপাদানগুলি যেগুলো পুরোমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এই উপাদানগুলিকে ব্যবহার করে পুঁজিবাদের বিকল্প মতাদর্শগত জগৎ গঠন করা ও রাষ্ট্রশক্তি দখলে প্রয়াসী হওয়া,—প্রলেতারিয়েতের পক্ষে এই দু'টি বিষয় তাই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। পুঁজিবাদী শ্রেণী যেমন তার নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থে বুর্জোয়া মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তিকে করায়ত্ত করতে আগ্রহী, সঠিক নেতৃত্বে পরিচালিত হলে প্রলেতারিয়েতও এক বিকল্প সম্ভাবনার কথা চিন্তা করতে পারে।

এই ধারাগুলির পাশাপাশি পশ্চিম জার্মানীর মার্কস তাত্ত্বিকদের মধ্যেও রাষ্ট্র প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক দেখা দিয়েছে, সাধারণভাবে যেটি "জার্মান বিতর্ক" নামে পরিচিত।[5] এই বিশ্লেষণের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে পুলানৎজাসের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল থাকলেও, পুলানৎজাসের তুলনায় এঁদের আলোচনাপদ্ধতি অনেকটাই ভিন্ন। পুলানৎজাসের মত এঁরাও স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্র পুঁজিবাদী সমাজের শ্রেণীদ্বন্দ্বের কাঠামোগত রূপ। কিন্তু পুলানৎজাস্ যেমন মূলতঃ রাষ্ট্রকাঠামোর গঠনপ্রকৃতি ও রাষ্ট্রকাঠামোর অন্তর্দ্বন্দ্বকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, জার্মান তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (ক) ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের অর্থনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণের ওপরে ও (খ) পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব কিভাবে রাষ্ট্রকাঠামোকে প্রভাবিত করে তার

---

5. বিস্তৃত আলোচনার জন্য উল্লেখযোগ্য John Holloway and Sol Picciotto (ed) *State and Capital: A Marxist Debate*. বিশেষতঃ প্রয়োজনীয় সম্পাদকদ্বয়ের ভূমিকা, 'Introduction : Towards a Materialist Theory of the State', পৃঃ ১-৩১।

ওপরে। পুলানৎজাস্ প্রমুখ অবয়ববাদীদের সম্পর্কে জার্মান তাত্ত্বিকদের অভিযোগ হল যে, তাঁরা রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে এই স্বাতন্ত্র্য যে বিষয়গতভাবে পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিব দ্বারা পরিচালিত সেই মূল প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করেছেন। জার্মান তাত্ত্বিকবা মার্কসের Capital-কে তাঁদের আলোচনার প্রধান ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে বাষ্ট্রেব আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের তত্ত্বটি যে চূড়ান্ত নয়, তার ভিত্তি যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্কটপ্রসূত শ্রেণীদ্বন্দ্ব, সেটি প্রমাণ করার চেষ্টা কবেছেন। তাই জার্মান তাত্ত্বিকদের এই বিশ্লেষণ গবেষকমহলে "রাষ্ট্র উৎসারণ তত্ত্ব" (State derivative debate) নামে পরিচিত। এই তত্ত্বের যাঁরা ধারক বাহক, তাঁদেব প্রধানতঃ তিনটি ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে।

প্রধানতঃ, ম্যুলার (Mueller) ও নয়সয়েস্ (Neuseuss), আলটফাটের (Altvater), ব্লান্‌কে (Blanke), ইউরগেনস্ (Juergens), কাসটেন্‌ডিক্ (Kastendick) প্রমুখ গবেষকেরা সাধারণভাবে মনে করেন যে, রাষ্ট্রের আকাব (form)-এর প্রয়োজনীয়তা নির্ধারিত হয় বিভিন্ন পুঁজির পারস্পবিক সম্পর্কবিন্যাস দ্বারা। অর্থাৎ, পুঁজিবাদী সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বার্থে যেহেতু বিভিন্ন ধরনেব পুঁজির সম্পর্কের সহাবস্থান প্রয়োজন, ও যেহেতু এই সম্পর্ককে সুসমঞ্জস উপায়ে প্রতিষ্ঠিত কবা এককভাবে কোন পুঁজিপতির পক্ষে সম্ভব নয়, সে কারণেই এই সামগ্রিক অন্তর্দ্বন্দ্বের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে স্বতন্ত্র এমন এক শক্তির, অর্থাৎ, রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়, যে শক্তি এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে ও যার পরিণতিতে সমাজে পুঁজির স্বার্থ সামগ্রিকভাবে সুরক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় ধারণাটির প্রবক্তা হলেন ফ্লাটোভ্ (Flatow) ও হুইসকেন (Huisken)। এঁদের মতে, পুঁজিবাদী সমাজে বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তির মালিকানার যে প্রতিযোগিতামূলক দ্বন্দ্ব দেখা যায় ও তার ফলে সমাজে যে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হয়, যার পরিণতিতে প্রতিটি মালিকানাই নিজেকে এই অনিশ্চয়তার শিকার বলে মনে করে, তার নিরসনেই প্রয়োজন দেখা দেয় রাষ্ট্রের, কারণ এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমেই ব্যক্তিগত মালিকানা-কেন্দ্রিক পুঁজিবাদী স্বার্থ সামগ্রিকভাবে সংরক্ষিত হয়।

তৃতীয় ধারাটির প্রবক্তা হির্‌ষ (Hirsch)-এর মতে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন হয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার জন্য। তাঁর

মতে পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষার ভূমিকায় রাষ্ট্রশক্তি সরাসরিভাবে অবতীর্ণ হয় না। উৎপাদনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়গতভাবে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুঁজিবাদী সম্পর্ককে সুরক্ষিত করে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করে উন্নত পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে একটি ভিন্ন চরিত্রের রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন পশ্চিম জার্মানীর বিশিষ্ট তাত্ত্বিক হাবেরমাস (Habermas)। সার্বিক বিচারে হাবেরমাসের তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল ও যথেষ্ট বিস্তৃত। স্বল্প পরিসরে যে আলোচনা সম্ভবপর না হলেও অত্যাধুনিক ধনবাদী রাষ্ট্র প্রসঙ্গে হাবেরমাসের বক্তব্যের মূলবস্তুকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আজকের পশ্চিমী রাষ্ট্রব্যবস্থা যে সংকটের সম্মুখীন, সেটি প্রধানতঃ পশ্চিমী পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান সংকটেরই বহিঃপ্রকাশ এবং এর মূলে রয়েছে উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে উৎপাদিত বস্তুকে আত্মসাৎ করার ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঝোঁকের সংঘাত—মার্কস প্রদত্ত এই মৌলিক সূত্রটিকে গ্রহণ করে হাবেরমাস পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সংকটের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব অগ্রগতির পরিণতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের চাহিদা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাকে পূরণ করা এককভাবে কিছু মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে এই দায়িত্ব পালন করতে রাষ্ট্রকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হচ্ছে এবং তার ফলে ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারের অনুপ্রবেশ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে যেমন ধনতন্ত্রের স্থায়িত্ব বজার রাখতে মানুষের চাহিদাবৃদ্ধির সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রশক্তির প্রাবল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, অপরদিকে ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তির এই অনুপ্রবেশ ধনতন্ত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ভাবমূর্ত্তিকে বিপন্ন করে তুলেছে। রাষ্ট্রক্ষমতা বৃদ্ধির পরিণতি হিসেবে পরস্পরবিরোধী এই দু'টি ধারার দ্বন্দ্ব বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংকটের সূচনা করেছে। একদিকে যেমন ঘটছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ব্যাপক প্রসার, অপরদিকে দ্রুত লয়প্রাপ্ত হচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতা। ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্রমশঃ শৃংখলিত হবার ফলে পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি যে নীতি সেটিই আজ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সর্বাধিক সংঘটিত হচ্ছে। হাবেরমাসের মতে, এর ফলে ব্যক্তির মুক্তির প্রশ্নটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আজ সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রশক্তির

এই পাম্পরিকর বৈর সম্পর্কের পরিণতিতে সামগ্রিকভাবে ধনতন্ত্রের অগ্রগতি খর্ব হচ্ছে ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তি এক গভীর সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত মূল্যের উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে; প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যুক্তিসিদ্ধ নীতি গ্রহণেব ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিচ্ছে, বাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার যৌক্তিকতাকে উপযুক্ত বৈধতার মাপকাঠিতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দেখা দিচ্ছে রাষ্ট্রশক্তির বৈধতার সংকট (legitimation crisis)। সেই সঙ্গে পরিলক্ষিত হচ্ছে ব্যক্তির কর্মজীবনে উদ্দেশ্যহীনতার সংকট (motivational crisis), কারণ রাষ্ট্রশক্তির বন্ধনে শৃংখলিত ব্যক্তির কাছে জীবন অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন হতে বাধ্য। এক কথায়, হাবেরমাসের মতে, আজকের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র জটিল থেকে জটিলতর সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত।

উপসংহারে বলা যায় যে, মিলিব্যাণ্ড-পুলানৎজাস্ বা সাম্প্রতিককালের বিতর্কের চরিত্র যাই হোক না কেন, এই বিতর্ক মার্কসের মূল রাষ্ট্রতত্ত্বের বৈধতাকে প্রতিষ্ঠিত করতেই সাহায্য করেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অতি উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক এক অতি সূক্ষ্ম ও জটিল রূপ নিয়েছে, যার ফলে পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রকে শুধু-মাত্র শাসকশ্রেণীর করায়ত্ত একটি যন্ত্ররূপে বর্ণনা করাটাই শেষ কথা নয়। এই সম্পর্কটির প্রকৃত চরিত্রকে অনুধাবন করার জন্য মার্কস বর্ণিত রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের তত্ত্বটি তাই অনস্বীকার্য।

সপ্তম অধ্যায়

লেনিনবাদের উদ্ভব ও বিকাশ

॥ ১ ॥

লেনিনবাদ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রচলিত ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ

মার্কস ও এঙ্গেলস ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্যে নিয়োজিত যে বিপ্লবী তত্ত্বের সৃষ্টি করেছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে তার সার্থক বিকাশ ঘটান ও বাস্তব রূপায়ণ করেন ভি. আই. লেনিন। রাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লবের নায়ক লেনিন মার্কসবাদের যে সার্থক সৃজনশীল উত্তরণ ঘটান, সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইতিহাসে সেটি লেনিনবাদ নামে খ্যাত। মার্কসীয় দর্শন ও রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে লেনিনের অবদান এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত যে, আধুনিক-কালে মার্কসবাদ শুধুমাত্র মার্কসবাদই নয়; মার্কসবাদ আজ লেনিনবাদের সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পৃক্ত ও তাই আজকের দিনে মার্কসবাদ হল মার্কসবাদ লেনিনবাদ। লেনিনের অবদান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করার জন্য তাই স্বাভাবিকভাবেই লেনিনবাদের উদ্ভব ও বিকাশের স্তরগুলির বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। লেনিনবাদের উদ্ভব ও বিকাশের প্রশ্নটির আলোচনা আরও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, সাম্প্রতিককালের একাধিক পশ্চিমী "মার্কস বিশেষজ্ঞ" কতকগুলি যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ পরস্পরবিরোধী বা মার্কস এঙ্গেলস যে "বিশুদ্ধ" মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার সঙ্গে লেনিনবাদের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ।[1] এই যুক্তিগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, ই. উইলসন (E. Wilson). আর. এন. ক্যারিউ হান্ট্ (R. N. Carew Hunt), স্টেফান পোসোনি (Stefan Possony), এ. মেয়ার (A. Meyer),

1. বিস্তৃত আলোচনার জন্য Y. Modrzhinskaya, *Leninism and the Battle of Ideas*, Chapter 4, Section 1, পৃঃ ১২৩-১৫৩ এবং G. Ezrin, 'Critique of the Present-Day Bourgeois Interpretations of Leninism', *Social Sciences*, XIII (3), 1982 দ্রষ্টব্য।

ই. বখেন্‌সকি (E. Bochenski), স্ট্যানলি. ডব্লু. পেজ (Stanley W. Page) প্রমুখের মতে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ পরস্পরবিরোধী ; কারণ মার্কস ছিলেন প্রধানতঃ একজন তাত্ত্বিক, যিনি মার্কসবাদকে একটি তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। অপরদিকে লেনিন ছিলেন মূলতঃ একজন প্রায়োগিক, যিনি স্বচালনবাদের (voluntarism) ওপরে নির্ভর করে মার্কসবাদকে তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার বদলে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রচেষ্টায় যে কোন পন্থা অনুসরণ করতে ইতঃস্তত করেননি। অতএব স্বচালনবাদী লেনিন হলেন একজন উদ্দেশ্যবাদী (conspirator), যিনি মার্কসবাদের তাত্ত্বিক বিকাশের প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করে, মার্কসবাদকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং মার্কসবাদের প্রয়োগের প্রশ্নটিকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থাপন করে মার্কসবাদের বিকৃতি ঘটিয়েছেন। সুতরাং এই তাত্ত্বিকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ চরিত্রগতভাবে পরস্পরবিরোধী। দ্বিতীয়তঃ, আর. ভি. ড্যানিয়েলস্ (R. V. Daniels), এস. আর. টম্‌পকিনস্ (S. R. Tompkins), কারেল ও ইরিনা হুলিকা (Karel and Irina Hulicka) প্রভৃতি "লেনিন বিশেষজ্ঞরা" মনে করেন যে, মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উদ্গাতারূপে মূলতঃ সমাজবিকাশের নিয়মগুলিকে সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, অর্থাৎ, মার্কসের কাছে সমাজবিপ্লব ছিল এক ধরনেব ঐতিহাসিক নিয়তিবাদের ফলশ্রুতি। এই তাত্ত্বিকদের ধারণা অনুযায়ী, ইতিহাসের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিশ্লেষণে মার্কস ব্যক্তির বিষয়ীগত ভূমিকাকে তেমন কিছু গুরুত্ব দেননি ও মার্কসবাদ সে অর্থে এক ধরনের যান্ত্রিক ইতিহাসবাদ। পক্ষান্তরে লেনিন বিপ্লবকে সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে সম্পন্ন করে তোলার প্রশ্নে শ্রমজীবী পার্টির ও গণসংগঠনের সক্রিয় ভূমিকাকে নিয়ামক শক্তিরূপে চিহ্নিত করে মার্কসবাদের বিকৃতি ঘটিয়েছেন। অতএব, লেনিনবাদ মার্কসবাদের বিরোধী। তৃতীয়তঃ, সিড্‌নি হুকের (Sidney Hook)-এর মত তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, মার্কস ছিলেন মূলতঃ গণতন্ত্রপ্রেমী ; কিন্তু লেনিন "প্রলেতারীয় একনায়কত্বে"র প্রশ্নটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রকৃতপক্ষে স্বৈরতন্ত্রের জয়ধ্বনি করেছেন। এই যুক্তি অনুসারে লেনিন মার্কস স্বীকৃত গণতন্ত্রের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে কার্যতঃ গণতন্ত্র বিরোধী ধারণাকেই পুষ্ট করেছেন। চতুর্থতঃ, জেমস্. ই. কনর (James E. Connor)-এর মত কোন কোন তাত্ত্বিক এই ধারণাও পোষণ করেন যে, লেনিনবাদ যেহেতু রাশিয়ার

মত অনুন্নত একটি সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত, সেহেতু এই মতবাদ শুধুমাত্র পৃথিবীর অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া দেশগুলির পক্ষে প্রযোজ্য এবং পাশ্চাত্যের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিশ্লেষণে লেনিনবাদ সম্পূর্ণ অচল। এক কথায়, "বিশুদ্ধ" মার্কসবাদ যেখানে উন্নত, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অর্থবহ, লেনিনবাদের তাৎপর্য সে সব দেশের কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক। যুক্তিগুলির সার কথাটি হল এই যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জাতীয় কোন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা আদৌ সম্ভব নয়, কারণ লেনিনবাদের মূল সুর "বিশুদ্ধ" মার্কসবাদের বিরোধী। এই জাতীয় তত্ত্ব যে কতটা অসার ও ভ্রান্ত, সেটি লেনিনবাদের উদ্ভব ও বিকাশের গতিপ্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

লেনিনবাদের উদ্ভব ও বিকাশের প্রশ্নটির একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট আছে। সমকালীন রাশিয়ার তীব্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের ফলে জন্ম নিয়েছিল লেনিনবাদ। লেনিনবাদ সে অর্থে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির নিছক বিষয়ীগত চিন্তার তাত্ত্বিক প্রতিফলন মাত্র নয়। রুশ জারতন্ত্র যে চূড়ান্ত অত্যাচারের জীবন্ত প্রতীকরূপে রুশ জনগণের সামনে নিজেকে হাজির করেছিল, লেনিনবাদের উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য। সেই প্রতিবাদ তার সার্থকতম রূপ নিয়েছিল ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে; এই বিপ্লব শুধু যে জারতন্ত্রের ও সমস্ত প্রকার শোষণের অবসান ঘটিয়েছিল তাই নয়, এই ঘটনা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস প্রবর্তিত তাত্ত্বিক ধারণার সার্বিক বিকাশ সাধন করেছিল। লেনিনবাদের জন্মের পটভূমিকাটিকে স্মরণ না রাখলে লেনিনবাদ সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তিকর তত্ত্বের শিকার হতে হয়।[2] যেমন, রিচার্ড পাইপ্‌স (Richard Pipes), এ. বি. উলাম (A. B. Ulam), এস. ভি. উটেচিন্‌ (S. V. Utechin), রবার্ট পেইন্‌ (Robert Payne) প্রমুখের বক্তব্য হল যে, লেনিনবাদ হল লেনিনের ওপরে জ্যাকোবিন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রভাবের পরিণত ফসল। লেনিন তাঁর তরুণ বয়সে

---

2. বিস্তৃত আলোচনার জন্য Neil Harding, *Lenin's Political Thought*, Vol. I, -এর Introductionটি দ্রষ্টব্য।

তৎকালীন রুশ সন্ত্রাসবাদীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন ও তার প্রভাবে তিনি গোপনীয়তা, ষড়যন্ত্র, রক্তপাত ও হিংসার ওপরে ভিত্তি করে ফরাসী জ্যাকোবিনদের মত এক অতি সংকীর্ণ বিপ্লবী তত্ত্ব উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্টি করেছিলেন, যার নাম লেনিনবাদ। এই যুক্তি অনুযায়ী লেনিনবাদ যদি জ্যাকোবিন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ সন্ত্রাসবাদের ফলন হয়ে থাকে, তবে স্বভাবতঃই তা ছিল রুশ জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। রবার্ট কন্‌কোয়েস্ট (Robert Conquest), আর. এইচ. ডব্লু. থীন্ (R. H. W. Theen) প্রমুখেরা এই যুক্তিটিকে আরও খানিকটা প্রসারিত করে বলবার চেষ্টা করেছেন যে লেনিনবাদ হল মূলতঃ মার্কসের প্রথম পর্বের অপরিণত বিপ্লবী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত একটি তত্ত্ব। এঁদের বিচারে, ১৮৪৮-৫১ সালে মার্কস ফরাসী বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জ্যাকোবিনদের ভূমিকাকে যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছিলেন, লেনিনবাদের উন্মেষের পিছনে এই দৃষ্টিভঙ্গীই প্রধান প্রেরণা যুগিয়েছিল। তাই এই তাত্ত্বিকদের মতে লেনিন "বিশুদ্ধ" মার্কসবাদী ছিলেন না। তাঁর পরিচয় হল যে তিনি একজন অপরিণত জ্যাকোবিন মার্কসবাদী,—যে মার্কসবাদ জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। মোটামুটিভাবে এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি করে আরও কয়েকজন পশ্চিমী বিশেষজ্ঞ, যেমন, ই. ভি. উলফেনষ্টাইন্ (E. V. Wolfenstein), এল. এস. ফেনার (L. S. Fener) দাবি করেন যে, লেনিনবাদ হল লেনিনের এক মানসিক বিকারের ফলশ্রুতি। এই যুক্তিটির মর্মার্থ হল যে, জারকে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে লেনিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সন্ত্রাসবাদী আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা কিশোর লেনিনের মনে এক তীব্র প্রতিহিংসা ও সন্ত্রাসবাদী মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিল, যার তাত্ত্বিক ফলশ্রুতি হল লেনিনবাদ। এই জাতীয় বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও ধারণার মূলে রয়েছে লেনিনবাদের উন্মেষের প্রশ্নটিকে তার সামগ্রিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার প্রবণতা।

॥ ২ ॥

লেনিনবাদের সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

লেনিনবাদের উদ্ভব ও বিকাশের সামাজিক-ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে প্রধানতঃ চারটি পর্বে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম পর্ব: ১৮৬১-১৯০৫

সালের রুশ বিপ্লব; দ্বিতীয় পর্ব: ১৯০৬-১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব; তৃতীয় পর্ব: মার্চ ১৯১৭-১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব; চতুর্থ পর্ব: নভেম্বর ১৯১৭-১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুকাল।

প্রথম পর্ব: ১৮৬১-১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব

লেনিনের তরুণতম বয়সের রচনাকাল ১৮৯৩ সাল। ১৮৯৩ থেকে ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবের সময় পর্যন্ত লেনিনের সব রচনাই ছিল তৎকালীন রাশিয়ার বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রুশ সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এক চরম আকার ধারণ করে। একদিকে জারতন্ত্রের নির্মম শাসন ও অপরদিকে জারতন্ত্রবিরোধী বিপ্লবী চিন্তাধারা,—এই দুই ধারার সংঘাতে রাশিয়াতে যে পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে, লেনিনবাদের উন্মেষ তারই ফলশ্রুতি। বহু শতাব্দী ধরে রাশিয়াতে জারতন্ত্র যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছিল, তার মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয় ১৮৬১ সালে। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ১৮৬১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী আইন জারী করে রুশ সমাজে প্রচলিত বহু শতাব্দীর পুরনো ভূমিদাসপ্রথার অবসান ঘোষণা করলেন ও সেই সঙ্গে ঘোষিত হল এক নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী যার মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ অর্থনীতিতে সর্বপ্রথম পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটল ও অচিরেই তার ব্যাপক প্রসার ত্বরান্বিত হল। জার প্রবর্তিত এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি রাশিয়াতে পুঁজিবাদের বিকাশের সূচনা করে পরোক্ষভাবে সামন্ততন্ত্রকে দুর্বল করতে সাহায্য করেছিল। ইউরোপের অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় রাশিয়াতে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব তখনও পর্যন্ত খুব সামান্যই পরিলক্ষিত হয়েছিল, কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মানদণ্ডে রাশিয়া ছিল তৎকালীন ইউরোপের অন্যতম পিছিয়ে পড়া দেশ। জার আলেকজাণ্ডার মূলতঃ তিনটি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন। এক, ব্যাংকগুলিকে উদারভাবে সুযোগ-সুবিধা দান, যার ফলে দেশে অর্থনৈতিক লেনদেনের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়ে পুঁজিবাদ প্রসারের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দিল; দুই, বিদেশী পুঁজিকে লগ্নীর সুযোগদান, যার ফলে দেশে বিদেশী বাণিজ্যিক সংস্থার সহায়তায় শিল্প পুঁজির ক্রমবিকাশ ত্বরান্বিত হল; তিন, রেলব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নতিসাধন, যার ফলে পুঁজির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। জার অনুসৃত এই ব্যবস্থাগুলির ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে

পুঁজিবাদের দ্রুত অনুপ্রবেশ ও ব্যাপক প্রসার ঘটতে শুরু করে এবং রুশ সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রভাব অনুভূত হয়।

প্রথমতঃ, রুশ অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে দেশের শহরাঞ্চল-গুলিতে ফ্যাক্টরীকেন্দ্রিক ভারী শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করে ও তার পরিণতিতে রাশিয়ার জনজীবনে ফ্যাক্টরী শ্রমিকের আবির্ভাব সূচিত হয়। অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ১৮৬০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে রাশিয়াতে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ৭ গুণেরও বেশী, যেখানে ব্রিটেনে ও ফ্রান্সে এই সময়তে বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২½ ও ২ গুণের কিছু বেশী। ১৮৯০ সালের মধ্যে রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষের প্রায় অর্ধেকের মত শ্রমিক ছিল শিল্পে চাকুরীরত এবং বেশীর ভাগ শিল্পই ছিল ফ্যাক্টরীকেন্দ্রিক, যেগুলি ৫০০ ও তার বেশী শ্রমিককে নিয়ে গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়তঃ, মূলতঃ কৃষিপ্রধান দেশ রাশিয়াতে কৃষির ক্ষেত্রেও পুঁজির দ্রুত অনুপ্রবেশের ফলে ধনী ও দরিদ্র কৃষকের মধ্যে ফারাক বাড়তে থাকে ও ফলে দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের আগুন ক্রমশঃ ধূমায়িত হতে শুরু করে। ১৮৬১ সালে কৃষকদের অসন্তোষ বিদ্রোহের আকার নিয়ে এক চূড়ান্ত রূপে আত্ম-প্রকাশ করে। এক বছরের মধ্যে এই সময়ে এক হাজারেরও বেশী কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই বিদ্রোহগুলিকে দমন করতে সৈন্য তলব করা হয়েছিল। এই বিদ্রোহগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য বেজ্‌দনা (Bezdna) গ্রামে আন্তন পেত্রভ (Anton Petrov)-এর নেতৃত্বে কৃষক অভ্যুত্থান ও কান্‌দিয়েভ্‌কা (Kandeyevka) গ্রামে রক্তপতাকা নিয়ে জারের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধের ঘটনা। তৃতীয়তঃ, কৃষিতে পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে শুরু করে ও জমি থেকে উৎখাত হয়ে এরা রুটি রোজগারের আশায় শহরগুলিতে চলে আসতে শুরু করে বিভিন্ন কারখানায় কাজ নেবার জন্য। তার ফলে গ্রামের ভূমিহীন গরীব কৃষকদের একটা বড় অংশ অল্পদিনের মধ্যেই প্রলেতারিয়েতে পরিণত হয়। রুশ বিপ্লব সংঘটিত হবার পিছনে রাশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব এবং কৃষিতে পুঁজির বিকাশের ফলে দরিদ্র কৃষকদের ও শিল্পশ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধির ঘটনা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

লেনিনবাদের উন্মেষের পিছনে জারতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে পুঁজিবাদী শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি ও তার প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিও ছিল বিশেষ অর্থবহ।

জারের নির্মম শোষণ ও অত্যাচার, কৃষকদের অবর্ণনীয় দুরবস্থা, পরবর্তীকালে শিল্পাঞ্চলগুলিতে শ্রমিকশোষণের মর্মন্তুদ চিত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ বুদ্ধিজীবী মহলে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পুশকিন, লেরমনতভ, গোগলের মানবতাবাদী সাহিত্যের মহান ঐতিহ্য বাংময় হয়ে ওঠে একাধিক সাহিত্যিক ও শিল্পীর চিন্তার মধ্যে। এই পর্বে যে গভীর মানবতাধর্মী রুশ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তার চরিত্র ছিল ঐতিহাসিক কারণেই বৈপ্লবিক। তরুণ লেনিনের চিন্তার ওপরে এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রভাব ছিল বিশেষ অর্থবহ।

বহু শতাব্দী ধরেই জারের সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসন রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। বিশেষতঃ, অন্যান্য দেশের তুলনায় রাশিয়াতে ধনতন্ত্রের বিলম্বে প্রসার, ধর্মীয় নানাবিধ কুসংস্কারের প্রাধান্য, রুশ চার্চের আধিপত্য, বৃহৎ ভূস্বামী ও রুশ অভিজাততন্ত্রের প্রবল প্রতাপ গোটা দেশকে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় পর্যবসিত করেছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ভাবধারার উন্মেষ ঐতিহাসিক কারণেই ঘটেছিল। একটি ধারা ছিল পুরোপুরিভাবে রক্ষণশীল, যেটি অক্টোবর বিপ্লবের শেষদিন পর্যন্ত রাশিয়াতে যে কোন ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছিল। অপর ধারাটি ছিল স্বৈরতন্ত্রবিরোধী, মানবতাবাদী, বৈপ্লবিক চিন্তাধর্মী। জারতন্ত্র ছিল এমনই এক ব্যবস্থা যাকে কোন ধরনের সংস্কার আন্দোলন করে পরিবর্তন করা সম্ভবপর ছিল না। তাই জারতন্ত্রের বিরোধী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন, অর্থাৎ, জারতন্ত্রের সমূল উচ্ছেদসাধন। ফলে দ্বিতীয় ধারাটির প্রবক্তা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের চিন্তার গণতান্ত্রিক, মানবতাবাদী উপাদান ছিল চূড়ান্তভাবে জারতন্ত্রবিরোধী ও বৈপ্লবিক, যদিও জারতন্ত্রের বিকল্প কোন ব্যবস্থা মানুষের চিন্তা ও মনের সৃষ্টিশীল বিকাশের পক্ষে সবচেয়ে বেশী সহায়ক হবে সে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা এঁদের ছিল না। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রুশ সংস্কৃতিতে শিল্প, সাহিত্যের যে অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে, তার মূল কথা ছিল সমাজসচেতনতা, —এক কথায়, এই চিন্তা ছিল স্বৈরতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের তীব্র সমালোচনাধর্মী। এই পর্বের শ্রেষ্ঠ কীর্তি পুশ্‌কিনের Yevgeny Onegin, লেরমনতভের A Hero of Our Time, গোগলের Dead Souls ও একাধিক ছোট গল্প, তুর্গেনেভের A Hunter's Sketches প্রভৃতি অসংখ্য রচনা। সামন্ততন্ত্র ও

ভূমিদাস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে পাভেল ফেদোতভের (Pavel Fedotov) 'The Major's Courtship', 'Fidelka's Death,' আলেকজাণ্ডার ইভানভের (Alexander Ivanov) 'Christ before the People' প্রভৃতি অনবদ্য পেন্টিং। রুশ অর্থনীতিতে ১৮৬১ সালের পর পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রুশ সাংস্কৃতিক ধারাটি এক চরম উৎকর্ষ লাভ করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেভ্ তলস্তয় (Lev Tolstoi) [১৮২৮-১৯১০], ফিদর দস্তয়েভ্সকি (Fyodor Dostoyevsky) [১৮২১-১৮৮১], আন্তন চেকভ্ (Anton Checkov) [১৮৬০-১৯০৪], ক্রুপদী সঙ্গীতে চাইকভ্সকি [১৮৪০-১৮৯৩], মুসোরগ্সকি (Mousorgsky) [১৮৩৯-১৮৮১], রিমস্কি-করসাকভ্ (Rimsky-Korsakov) [১৮৪৪-১৯০৮], পেন্টিং-এর ক্ষেত্রে পেরভ্ (Perov) [১৮৩৩-১৮৮২], ক্রামস্কয় (Kramskoy) [১৮৩৭-১৮৮৭], রেপিন (Repin) [১৮৪৪-১৯৩০] ছিলেন এই ঐতিহ্যের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।

উনবিংশ শতাব্দীর রুশ সাংস্কৃতিক আন্দোলন যেমন ছিল জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ জেহাদ, তারই পাশাপাশি এই শতকের গোড়া থেকেই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি গোপন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ধারাও ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। জারের সেনাবাহিনীর একটি অংশের সমর্থন পেয়ে ১৮২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম একদল সন্ত্রাসবাদী জারের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানর ব্যর্থ চেষ্টা করে, যার লক্ষ্য ছিল ভূমিদাসপ্রথার অবসান ঘটিয়ে একটি বিপ্লবী শাসনব্যবস্থা কায়েম করা। রুশ বিপ্লবের ইতিহাসে এই ঘটনা 'ডিসেম্বর অভ্যুত্থান' (December Uprising) নামে খ্যাত হয়ে আছে। এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন একাধিক গুপ্ত, সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, যাদের নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিকিতা মুরাভিয়ভ্ (Nikita Muravyov), পাভেল পেস্তেল (Pavel Pestel), বিপ্লবী কবি কনদ্রাতি রিলিয়েভ্ (Kondraty Ryleyev), আলেকজাণ্ডার বেসতুশেভ্ (Alexander Bestuzhev) প্রমুখেরা। ডিসেম্বর অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলেও রাশিয়াতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড স্তিমিত হল না। হেরজেন্ (Herzen) ও ওগারেভ্ (Ogarev), দুই বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে ও পরিচালনায় বিদেশ থেকে প্রকাশিত Kolokol-এ এবং এন. চেরনিশেভ্সকি (N. Cherny-

shevsky), এন. দবরোল্যুবভ (N. Dobrolyubov) ও বিপ্লবী কবি এন. নেক্রাসভ (N.Nekrasov)-এর সম্পাদনায় স্বদেশে প্রকাশিত Soveremennik এ জারতন্ত্র ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রীকরণের পক্ষে রচনা প্রকাশনার মাধ্যমে প্রতিবাদ জ্ঞাপন অব্যাহত রইল। কিছুদিনের মধ্যেই এই দুটি পত্রিকা স্বৈরতন্ত্র বিরোধিতার মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। এরই সূত্র ধরে চেরনিশেভ্‌সকি, হেরজেন্, ওগারেভ্‌ও দবরোল্যুবভের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Zemlya i Volya (জমি ও স্বাধীনতা) নামে একটি গোপন বিপ্লবী সংস্থা। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল রুশ কৃষকদের নিয়ে একটি জাতীয় অভ্যুত্থান সংঘটিত করা এবং সেই উদ্দেশ্যে গোটা দেশে এই সংস্থার একাধিক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দবরোল্যুবভের মৃত্যু, চেরনিশেভ্‌সকি সহ একাধিক নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার ও জারের পুলিশ ও সেনাবাহিনীর নৃশংস দমন-পীড়নের ফলে এই অভ্যুত্থান শেষ পর্যন্ত বাস্তব রূপ নিতে পারেনি, যদিও প্রবল গণ-অসন্তোষ ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের চাপে পড়ে ১৮৬৩ থেকে ১৮৭৪ সালের মধ্যে জারকে একাধিক সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংস্কার সাধন করতে হয়েছিল।

১৮৭৪ সালে রাশিয়াতে জার বিরোধী সংগ্রাম এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়। রুশ মধ্যবিত্তদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ার ফলে তাদের একটি অংশ কৃষক অভ্যুত্থান ও কৃষক সংগ্রামের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তোলে। তারই ফলশ্রুতিরূপে ১৮৭৪ সালে প্রায় এক হাজার রুশ তরুণ কৃষকের সাজে সজ্জিত হয়ে গ্রামে গ্রামে পদযাত্রা শুরু করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করা, কারণ তাদের কাছে কৃষকই ছিল রাশিয়াতে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান নেতা ও মূল চালিকাশক্তি। এই তরুণ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা নারদনিক (Narodnik) নামে খ্যাত। কিন্তু তাঁরা কৃষকদের মধ্যে তেমন কোন সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হওয়ায় নারদনিকদের একটি অংশ ১৮৭৯ সালে Narodnaya Volya (জনগণের ইচ্ছা) নামে নতুন একটি বিপ্লবী সমিতি গঠন করলেন যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসবাদের পথ অনুসরণ করে জারকে হত্যা করে জারতন্ত্রের অবসান ঘটান ও এইভাবে রুশ জনগণের সামাজিক মুক্তির পথ সুগম করা। সোফিয়া পেরোভস্কায়া (Sofia Perovskaya), আলেকজাণ্ডার মিখাইলভ (Alexander Mikhailov) প্রমুখ অভিজ্ঞ বিপ্লবী এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৮৮১ সালের

১লা মার্চ জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হলেন। কিন্তু তার ফলে রাশিয়াতে জারতন্ত্রের অবসান হল না। বরং গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলি জারতন্ত্রের নিষ্ঠুর দমনপীড়নের শিকার হয়ে দাঁড়াল। ফলে অল্প-দিনের মধ্যেই এই সংগঠনগুলি ভেঙ্গে পড়ে।

Narodnaya Volya-র পরিণতি দেখে রুশ বিপ্লবীদের একাংশের মধ্যে নতুন ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। সন্ত্রাসবাদ ও গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে যে রুশ জনগণের মুক্তি সম্ভব নয়, এই প্রত্যয় ধীরে ধীরে জন্মাতে শুরু করে। বিশেষতঃ, সত্তরের দশকে গোটা দেশ জুড়ে যে ব্যাপক ধর্মঘট শুরু হয়, তার ফলও হয় সুদূরপ্রসারী। এই সময়তে ১৮৭৫ সালে গঠিত হয় দু'টি প্রথম গোপন শ্রমিক সংগঠন : একটি প্রতিষ্ঠিত হয় ওদেসা বন্দরে যেটির নাম ছিল South Russian Workers' Union এবং North Russian Workers' Union সংগঠিত হয়েছিল সেণ্ট্ পিটার্সবুর্গে। ইতিমধ্যে রুশ বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা আত্মগোপন করে বিদেশ থেকে স্বদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন, তাঁরা অনেকেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে মার্কস-এঙ্গেলসের বিপ্লবী তত্ত্ব অনুশীলন করতে শুরু করেন। ১৮৭৯ সালে ভরোনেজ্ (Voronezh)-এ অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে Narodnaya Volya দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। একটি গোষ্ঠী সন্ত্রাসবাদকেই তাদের সংগ্রামের মূল রণকৌশল রূপে চিহ্নিত করে। অপর একটি গোষ্ঠী, Chorny Peredel মূলতঃ কৃষক সংগ্রামকেই তাদের প্রধান লক্ষ্য বলে গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় গোষ্ঠীর একাধিক সদস্য প্লেখানভ, আক্সেলরদ, ইগনাতভ প্রমুখেরা এই গোষ্ঠীর সঙ্গে সব সংশ্রব ত্যাগ করে মার্কসবাদকে গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৩ সালে প্রধানতঃ প্লেখানভের নেতৃত্বে জেনেভায় গঠিত হয় রাশিয়ার প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন Emancipation of Labour Group। এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মার্কসবাদের প্রচার, মার্কসবাদী সাহিত্যের রুশ অনুবাদ প্রকাশ ও নারদনিকদের কর্মসূচীর ভুল-ভ্রান্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখান যে, নারদনিকদের পন্থা অনুসরণ করে রুশ জনগণের মুক্তি সম্ভব নয়। প্লেখানভ, যাঁকে লেনিন রুশ দেশে মার্কসবাদের জনক রূপে আখ্যা দিয়েছেন, প্রথম বিশ্লেষণ করে দেখান যে, কৃষক নয়, রাশিয়াতে বিপ্লবের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে রুশ শ্রমিকশ্রেণী ও সেই লক্ষ্য পূরণার্থে শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা

দখলের মাধ্যমে রুশ জনগণের মুক্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। এই সময়ে কাজান (Kazan) বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত তরুণ লেনিন এই সংগঠনের সংস্পর্শে আসেন ও অনতিকালের মধ্যেই সেণ্ট্ পিটার্সবুর্গে এই গোষ্ঠীর হয়ে প্রচার-কার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই সময়ে তরুণ লেনিন দু'টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রচনার মাধ্যমে লেনিনবাদের সূত্রপাত করেন। দু'টি রচনা ছিল নারদনিক ও উদারপন্থী মার্কসবাদীদেরবিরুদ্ধে লেনিনের সংগ্রামের ফসল।

১৮৯৪ সালে রচিত What the "Friends of the People" are and How they fight the Social-Democrats লেনিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। লেনিন বিশ্লেষণ করে দেখান যে, কৃষককেন্দ্রিক নারদনিক মতাদর্শ রাশিয়াতে বিপ্লবের পথকে চিহ্নিত করতে পারে না ; রাশিয়াতে জারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে প্রকৃত বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী, ও তার জন্য প্রয়োজন মার্কসবাদী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি গঠন। লেনিনের আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন প্রভাবশালী নারদনিক নেতা এন. মিখাইলভ্সকি (N. Mikhailovsky)। লেনিন এই রচনাটিতে আরও দেখান যে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব স্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, রাশিয়াতে কৃষকদের বিপ্লবী ভূমিকাকে অস্বীকার করা। তিনি এ কথাই বলেন যে, শ্রমিকশ্রেণী তার নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী বন্ধনের ফলে ; কিন্তু কৃষক যেহেতু সর্বহারা নয়, সেহেতু জারতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে রাশিয়াতে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে কৃষকশ্রেণীর ভূমিকা মুখ্য হতে পারে না। লেনিনের দ্বিতীয় রচনা The Economic Content of Narodism and the Criticism of it in Mr. Struve's book (১৮৯৫) প্রবন্ধেরও লক্ষ্য ছিল নারদনিক নেতৃত্বের একাংশ, যাঁরা নারদনিক মতাদর্শের অন্তঃসারশূন্যতাকে উপলব্ধি করে তার বিকল্প হিসেবে মার্কসবাদ ও উদারনীতিবাদের সমন্বয়ে এক নতুন রাজনৈতিক ভাবাদর্শের সন্ধান করেছিলেন। লেনিন এই দৃষ্টিভঙ্গীকে তীব্র আক্রমণ করে দেখান যে, মার্কসবাদ ও উদারনীতিবাদ পরস্পর বিরোধী ও উভয়ের সমন্বয়ের অর্থ রাশিয়াতে পুঁজিবাদকে সুরক্ষিত করা।

১৮৯৫ সালে লেনিনের প্রচেষ্টায় সেণ্ট্ পিটার্সবুর্গে গঠিত হয় League of Struggle for the Emancipation of the Working Class। এটিই ছিল রাশিয়াতে পরবর্তীকালে মার্কসবাদী পার্টি প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

লেনিনের তাত্ত্বিক রচনা ও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যকলাপ অচিরেই তাঁকে অবিসংবাদী নেতা রূপে প্রতিষ্ঠা দেয় যার ফলস্বরূপ তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৮৯৬ সালে লেনিনের নির্দেশে সেন্ট্ পিটার্সবুর্গ সুতোর কারখানায় ৩০,০০০ শ্রমিকের ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত হয়। রাশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার পথে এটি ছিল একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ। এর অনতিকাল পরেই ১৮৯৮ সালে মিনস্ক (Minsk) শহরে লেনিনের নেতৃত্বে গঠিত হয় রাশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক দল যার নামকরণ হয় আর. এস. ডি. এল. পি. (Russian Social Democratic Labour Party বা R S D L P)। পার্টি প্রতিষ্ঠার অল্পদিনের মধ্যেই এর প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার হন। আর. এস. ডি. এল. পি.-র প্রথম কংগ্রেসে যে কর্মসূচীটি গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে এই সংগঠনের মূল লক্ষ্যগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। সেগুলি হল স্বাধীনতা অর্জন, একদিকে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ও অপরদিকে পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তবে পার্টির কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সদস্যদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ মতবিরোধ থাকায় একটি সুসংবদ্ধ, পরিণত মার্কসবাদী পার্টি প্রতিষ্ঠার কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

১৮৯৯ সালে লেনিন রচনা করেন The Development of Capitalism in Russia। এই গবেষণাগ্রন্থে লেনিন বিভিন্ন পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখান যে, যাঁরা সেই সময় মনে করতেন যে রাশিয়াতে ধনতন্ত্রের প্রসার হয়নি ও সামন্ততন্ত্রের প্রাধান্যই রুশ অর্থনীতিতে বজায় আছে, ও যার ফলে রাশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে কোন বিপ্লবী ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়, তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় অগ্রগতি কম হলেও রাশিয়াতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ধনতন্ত্র যে প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, লেনিনের রচনা তার প্রমাণ। সাম্প্রতিককালের এক ব্রিটিশ গবেষক, নীল হার্ডিং (Neil Harding) এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন[৩] যে, এই গ্রন্থে লেনিনের বিশ্লেষণই ১৯১৪ সাল পর্যন্ত লেনিনবাদের বিকাশকে বোঝার মূল পদ্ধতিগত চাবিকাঠি। তাঁর মতে এই রচনায় লেনিন রাশিয়াতে ধনতন্ত্রের বিকাশের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর

3. ঐ, পৃঃ ৫।

পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক প্রশ্নটির ব্যাখ্যা করেছেন।

১৯০০ সালে সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে লেনিনের প্রত্যাবর্তনের পরে রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনে এক নতুন পর্বের সূচনা হয়। মার্কসবাদে দীক্ষিত একাধিক রুশ বিপ্লবীর সহযোগিতায় ও লেনিনের পরিচালনায় জার্মানীর ষ্টুটগার্ট শহর থেকে আর. এস. ডি. এল. পি.-র মুখপত্ররূপে Iskra (স্ফুলিঙ্গ) আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় লেনিন রচিত সম্পাদকীয় The Urgent Tasks of our Movement ও পরবর্তীকালে Iskra-তে প্রকাশিত লেনিনের Where to Begin ও অন্যান্য প্রবন্ধে বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রথম ও প্রধান শর্ত হিসেবে একটি সংঘবদ্ধ, রাজনৈতিক পার্টি গড়ে তোলার ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয় লেনিনের What is to be done? যেখানে তিনি আর. এস. ডি. এল. পি.-র অভ্যন্তরে যাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রামে আভির্ভূত হন। এই গ্রন্থে লেনিন রুশ বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নিয়ামক ভূমিকা, বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য স্বতঃস্ফূর্ততার পরিবর্তে একটি বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে দানের প্রয়োজনীয়তা ও এই পরিচালনাকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের, অর্থাৎ, মার্কসবাদের, গভীর অনুশীলনের প্রশ্নটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। লেনিনের মতে, এই পার্টির চরিত্র হবে আত্মগোপনকারী, আকারে ছোট ও এটিকে পরিচালনা করবে তারাই বিপ্লব যাদের পেশা। লেনিনের এই মতের বিরুদ্ধে আর. এস. ডি. এল. পি.-র একটি বড় অংশ বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। বিপ্লবী পার্টি গঠনের প্রশ্নে লেনিনের এই মতবাদের সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল। প্রথমতঃ, মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশে ইতিহাসে এ কথা একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে যে, বিপ্লবী আন্দোলনে জনগণের নিছক স্বতঃস্ফূর্ততা শেষ পর্যন্ত তাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। আন্দোলন তখনই সাফল্য লাভ করে যদি তা সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব সমৃদ্ধ নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয় আর সে কারণেই প্রয়োজন একটি আদর্শনিষ্ঠ বিপ্লবী পার্টির, যেটি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয়তঃ, লেনিন রাশিয়ার যে পরিস্থিতিতে এই প্রশ্নের আলোচনা করেছিলেন, সেখানে পশ্চিমী ধাঁচে একটি বৃহৎ, অবাধ উদারনৈতিক পার্টির মাধ্যমে কোন বিপ্লব

পরিচালনা করার প্রশ্ন ছিল না। জারশাসিত রাশিয়াতে পুলিশী সন্ত্রাসের মোকাবিলা করার জন্য যথার্থই প্রয়োজন ছিল একটি আত্মগোপনকারী, সুশৃঙ্খল জঙ্গী মনোভাবাপন্ন পার্টির। এই পরিস্থিতিতে ঢিলেঢালা, তথাকথিত পশ্চিমী ধাঁচে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কোন পার্টি সংগঠন রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে আত্মহননের সামিল হত।

পার্টি সংগঠনের প্রশ্নে লেনিনের এই চিন্তার যাঁরা বিরোধী ছিলেন তাঁদের সঙ্গে লেনিনের সরাসরি মতবিরোধ হয় ১৯০৩ সালে অনুষ্ঠিত আর. এস. ডি. এল. পি.-র দ্বিতীয় কংগ্রেসে। লেনিন তাঁর পূর্ববর্তী বক্তব্যের জের টেনে সেখানে এ কথাই বলেন যে, নিছক অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এক ধরনের অর্থনীতিবাদে (Economism) পর্যবসিত হয়, যেমন হয়েছিল ব্রিটেনে চার্টিস্ট আন্দোলনে। সে আন্দোলন কখনই রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ নিতে পারে না, যদি না তার পুরোভাগে একটি বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব থাকে, যে পার্টি পরিচালিত হবে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শে দীক্ষিত পেশাগত বিপ্লবীদের দ্বারা। এই কংগ্রেসে মারতভ্ (Martov) প্রমুখরা লেনিনের এই নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন, যদিও শেষ পর্যন্ত লেনিন ও তাঁর অনুগামীরাই এই কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। এর ফলে লেনিন ও তাঁর সহযোগীরা বলশেভিক (রুশ Bolshinstvo = সংখ্যাগরিষ্ঠ) ও লেনিন বিরোধীরা মেন্‌শেভিক (রুশ Menshinstvo = সংখ্যালঘু) নামে পরিচিত হলেন। এই কংগ্রেসে কার্যতঃ আর. এস. ডি. এল. পি. দুই লাইনের দ্বন্দ্বে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় ও এখানেই লেনিনের প্রস্তাবিত একটি সুনির্দিষ্ট বিপ্লবী কর্মসূচী গৃহীত হয়। এই কর্মসূচীকে দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম অংশটিকে বলা হয়েছিল ন্যূনতম কর্মসূচী, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, গ্রামীণ জীবনে সামন্ততন্ত্রের বিলোপসাধন, সাম্যের ভিত্তিতে রাশিয়াতে প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। অপরদিকে বৃহত্তর কর্মসূচীতে ঘোষিত হল পার্টির প্রধান লক্ষ্য, অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৪ সালে লেনিন রচনা করেন তাঁর One Step forward, Two Steps back।

১৯০৫ সালের মধ্যে রাশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট এক চূড়ান্ত রূপ নেয়। ১৯০৩ সালে রুশ শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়, যেখানে তিন

লক্ষাধিক শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। গ্রামীণ রাশিয়াতে কৃষক সংগ্রামও তুলে ওঠে। ১৯০০-১৯০৪ সালের মধ্যে ৬৭০টি কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই সার্বিক সংকট ১৯০৪-১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পর আরও প্রকট হয় ও ফলে গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক চরম অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জারতন্ত্র বিরোধী উদারনৈতিক ভাবধারায় পুষ্ট বিরোধী দলগুলিও স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা শুরু করে ও একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। যুদ্ধে পরাজয়ের পরিণতিতে রুশ অর্থনীতিও চরম সংকটে পড়ে ও ফলে দরিদ্র মানুষকে বহন করতে হয় বিপুল পরিমাণ করের বোঝা। এক কথায়, গোটা রাশিয়া এই পর্বে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মুখে এসে দাঁড়ায়। এই সময়ে সেণ্ট্ পিটার্স্‌বুর্গের সুবৃহৎ পুতিলভ্ (Putilov) শিল্প সংস্থায় শ্রমিক ছাঁটাই-এর প্রতিবাদে জানুয়ারী ১৯০৫ সালে এই প্লাণ্টের ১৩,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে। দিন কয়েকের মধ্যে এই ধর্মঘট গোটা শহরে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধর্মঘট ছিল এতদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। শ্রমিকদের এই অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে ফাদার গার্পঁ (Father Gapon) নামে জনৈক ধর্মযাজক জারের কাছে তাঁর বিবেচনার জন্য জনসাধারণের দুর্দশার কথা জানিয়ে একটি দাবিসনদ পেশ করার প্রস্তাব দেন। এই দাবি পেশ করতে ৯ই জানুয়ারী ১৯০৫ সালে শ্রমিকরা জারের প্রাসাদের সম্মুখে জমায়েত হয় ও তার পরিণতিতে তাঁদের জারের পুলিশবাহিনীর নিষ্ঠুর গুলিচালনার সম্মুখীন হতে হয়। অসংখ্য শ্রমিকের নির্বিচারে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দাবানলের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। গোটা ১৯০৫ সাল জুড়ে অসংখ্য বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের মাধ্যমে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। জুন মাসে 'পোতেমকিন' রণতরীর নাবিকদের ধর্মঘট, অক্টোবরে মস্কোতে ছাপাখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের ধর্মঘট জারতন্ত্রের ভিতকে কাঁপিয়ে তোলে। এই অবস্থাকে সামাল দিতে জার দ্বিতীয় নিকোলাস জনসাধারণের কাছে গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন ও ডুমার (Duma, অর্থাৎ, পার্লামেণ্টের রুশ সংস্করণ) অধিবেশন আহ্বানের কথা ঘোষণা করেন।

লেনিন ও তাঁর অনুগামী বলশেভিকরা জারের এই আপসমূলক নীতিতে

প্রলুব্ধ না হতে জনগণের কাছে আহ্বান জানান ও সেই সঙ্গে দেশব্যাপী এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করে জারতন্ত্রকে উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে সোভিয়েত বা শ্রমিকদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা গড়ে উঠতে শুরু করে যাদের সক্রিয় ভূমিকা ভবিষ্যতে ধর্মঘট ও সশস্ত্র বিপ্লব পরিচালনা করতে গভীরভাবে সহায়ক হয়েছিল। এই অবস্থা চরম পরিণতি লাভ করে ডিসেম্বর ১৯০৫ সালে, যখন মস্কোর শ্রমিকরা রস্তোভ-অন-ডন্ ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের সহায়তায় সরাসরি এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রথম রুশ বিপ্লবকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করে। এই অভ্যুত্থান অবশ্য সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয় এবং লেনিন এই পরাজয়ের কারণগুলিকে তাঁর Lessons of the Moscow Uprising (১৯০৬) রচনায় বিশ্লেষণ করে দেখান। প্রথমতঃ, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি অভ্যুত্থান ঘটানর বা সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা বলশেভিকদের ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, মস্কোকে কেন্দ্র করে গোটা দেশে অভ্যুত্থান ঘটনার জন্য যে সাংগঠনিক ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, তার অভাবটি ছিল অন্যতম কারণ। তৃতীয়তঃ, শ্রমিকদের মধ্যে তখনও মেনশেভিকদের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল ও তার ফলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানেব প্রশ্নে মেনশেভিকদের বিরোধিতা শ্রমিকদের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি করে।

গোটা ১৯০৫ সাল জুড়ে প্রথম রুশ বিপ্লবের যে প্রক্রিয়াটি অনুভূত হয়, তার বিস্তৃত বিশ্লেষণ লেনিন করেন এই পর্বে তাঁর একাধিক রচনায়। ওই বছরেই লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আর. এস. ডি. এল. পি.-র তৃতীয় কংগ্রেসে লেনিন মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করার পরিপ্রেক্ষিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রশ্নটিকে উপস্থাপিত করেন ও রুশ বিপ্লবকে এই পথে পরিচালনা করার গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করেন। মেনশেভিকদের সঙ্গে এই প্রশ্নে লেনিনের যে মৌলিক মতপার্থক্য ছিল, লেনিন সেটিকে গভীর মুন্সিয়ানার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখান তাঁর Two Tactics of Social Democracy (১৯০৫) রচনায়, লেনিনবাদের বিকাশকে অনুধাবন করার জন্য যার গুরুত্ব অপরিসীম। এই দীর্ঘ প্রবন্ধে আসন্ন রুশ বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন তিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক প্রশ্নের অবতারণা করেন। প্রথমতঃ, লেনিনের বক্তব্য ছিল যে, ১৯০৫ সালে গোটা রাশিয়াতে বিপ্লবী প্রক্রিয়া যে পর্যায়ে

পৌঁছেছিল, সেই পর্বে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভবপর ছিল না, কারণ রাশিয়া তখনও পর্যন্ত সামন্ততন্ত্রের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়নি। উপরন্তু রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধিতে আতংকিত হয়ে জারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। অতএব, সামন্ততন্ত্রের সমূল উচ্ছেদ ও তার প্রধান স্তম্ভ জারের স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোর ধ্বংস সাধনই ছিল বিপ্লবের আশু কর্তব্য। এই প্রশ্নে মেনশেভিকদের সঙ্গে বলশেভিকদের বড় একটা মতপার্থক্য ছিল না। এক কথায়, এই পর্যায়ে রুশ বিপ্লবের স্তরটি ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, অর্থাৎ, স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু লেনিনের সঙ্গে মেনশেভিকদের মূল পার্থক্যটি সূচিত হয়েছিল এই প্রশ্নে যে, লেনিনের মতে বিপ্লবের স্তরটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক হলেও তার প্রধান চালিকাশক্তি ছিল শ্রমিকশ্রেণী; লেনিন দেখালেন যে, ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বিংশ শতাব্দীর এমন এক পর্বে যখন শ্রমিকশ্রেণী রাশিয়াতে প্রবল শক্তি নিয়ে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়েছিল। মেনশেভিকরা এই প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন নিতান্তই যান্ত্রিকভাবে। তাঁদের মত ছিল যে, বিপ্লবের স্তরটি যেহেতু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, সেহেতু এই বিপ্লবে বুর্জোয়ারাই নেতৃত্ব দিতে পারে ও শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা হবে একান্তই গৌণ। লেনিন বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, বিপ্লবের স্তরটি ঐতিহাসিকভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক হলেও রুশ বুর্জোয়া-শ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকা সেই সময়ে রাশিয়াতে ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল ও তার ফলে এই শ্রেণীর পক্ষে কোন প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করা সম্ভবপর ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য লেনিন প্রধান গুরুত্ব দিয়েছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষকের মৈত্রী বন্ধনের উপরে। লেনিনের মত ছিল যে, শ্রমিকশ্রেণীর নিকটতম মিত্র হতে পারে কৃষক, কারণ কৃষকরাও স্বৈরতন্ত্র ও পুঁজিবাদী শোষণের নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছিল। এই প্রশ্নে মেনশেভিকদের বক্তব্য ছিল যে, এই বিপ্লবকে যেহেতু নেতৃত্ব দেবে বুর্জোয়া-শ্রেণী, সেহেতু শ্রমিকশ্রেণীর উচিত হবে বুর্জোয়া লিবারেলদের সমর্থন যোগান যাতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে সুসম্পন্ন হয়। তৃতীয়তঃ, লেনিন তাঁর এই রচনাটিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীবন্ধনে বিপ্লবী একনায়কত্ব গড়ে তোলার ওপরে ও এই

দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বশর্তরূপে সোভিয়েতগুলিকে শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তাকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। অর্থাৎ, লেনিনের কাছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য তখনই যদি তা হতে পারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বশর্ত ও লেনিনের বিশ্লেষণে দু'টি বিপ্লবই একসূত্রে গাঁথা, কারণ দু'টি বিপ্লব এক অবিচ্ছিন্ন বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অঙ্গস্বরূপ। এই প্রশ্নেও মেনশেভিকদের মত ছিল ভিন্ন, কারণ তাঁদের কাছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যোগসূত্রের পরিপ্রেক্ষিতটি গ্রহণযোগ্য ছিল না।

দ্বিতীয় পর্ব : ১৯০৬—ফেব্রুয়ারী বিপ্লব, ১৯১৭

১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের ব্যর্থতার পর বিপ্লবী আন্দোলন রাশিয়াতে দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করে। লেনিনের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পর্বে রুশ বিপ্লবের আশু লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল জারের স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পন্ন করা। এই পর্বটি ছিল বলশেভিক পার্টি সংগঠনের যুগ ও এই সংগঠন গড়ে ওঠে জারের স্বৈরতান্ত্রিক সন্ত্রাস ও অভূতপূর্ব দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে। ১৯০৫ সালের পর বলশেভিক পার্টির মধ্যে মূলতঃ তিনটি প্রধান ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ, লেনিন ও তাঁর সহযোগীদের মত ছিল যে, আগামী দিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সর্বাগ্রে 'প্রয়োজন পার্টিকে সুসংহত করা, কারণ পার্টির সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত দুর্বলতা বিপ্লবের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণে লেনিনের লক্ষ্য ছিল যে কোন ধরনের সুযোগ গ্রহণ করা ও একই সঙ্গে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় এই দুই অবস্থার জন্য বলশেভিক পার্টিকে প্রস্তুত করা। তাই একই সঙ্গে আত্মগোপন অবস্থায় সংগ্রাম পরিচালনা করা ও অপরদিকে 'ডুমা'য় অংশগ্রহণ করে সংসদীয় গণতন্ত্রের যতটুকু সুযোগ গ্রহণ করা যায় তার সদ্ব্যবহার করা,—এই দ্বৈত ভূমিকা পালন করার জন্য তিনি বলশেভিক পার্টিকে সুসংহত করতে সচেষ্ট হন। লেনিনের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে আর. এস. ডি. এল. পি.-র মধ্যে দ্বিতীয় একটি ঝোঁক দেখা যায়, যার প্রতিনিধিদের 'ওৎসোভিস্ট' (রুশ **Otzovat** অর্থাৎ, প্রত্যাহ্বান) বা তথাকথিত "বামপন্থী" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। বগদানভ (**Bogdanov**) প্রমুখের নেতৃত্বে এই গোষ্ঠীটির মত ছিল যে, রুশ বিপ্লবকে সুসম্পন্ন করতে

হলে কোন অবস্থাতেই 'ডুমা'র সঙ্গে সংস্রব রাখা উচিত হবে না। তাঁদের ধারণা ছিল যে, শুধুমাত্র আত্মগোপন অবস্থায় পার্টিকে তার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে ও জার নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করার অর্থ হবে পার্টির বিপ্লবী চরিত্রকে ক্ষুন্ন করা। এর পাশাপাশি তৃতীয় একটি ঝোঁকও পরিলক্ষিত হয়, যাকে লেনিন বলেছিলেন 'অবলোপনবাদ' (Liquidationism)। এই ধারার প্রবক্তাদের মত ছিল যে, পার্টিকে শুধুমাত্র সংসদীয় কার্যকলাপের মধ্যেই নিজের ভূমিকাকে সীমিত রাখতে হবে। লেনিনের মতে এই ঝোঁকটি ছিল আত্মহননের সামিল, কারণ কেবলমাত্র 'ডুমা'য় অংশগ্রহণ করার মধ্যে পার্টির কর্মসূচীকে সীমাবদ্ধ রাখলে শেষ পর্যন্ত সেটি প্রতিক্রিয়ার শিকার হতে বাধ্য হবে। এই সম্ভাবনা থেকেই যায়, কারণ কোন না কোন সময়ে প্রতিক্রিয়াশীস শক্তিগুলি পার্টির বিরুদ্ধে আঘাত হানবেই এবং সে সময়ে তারা সামান্যতম গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হবে না।

এই দুটি ঝোঁকের বিরুদ্ধে লেনিনের সংগ্রাম কিন্তু খুব সহজ পথে এগোয়নি। ১৯০৬ সালে আর. এস. ডি. এল. পি.-র যে চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে মেনশেভিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ১৯০৭ সালে আর. এস. ডি. এল. পি.-র পঞ্চম কংগ্রেসে মেনশেভিকরা পরাজিত ও বহিষ্কৃত হয় ও সেই বছরেই জার 'ডুমা'কে ভেঙ্গে দিয়ে এক মারাত্মক প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু করেন,—যার বলি হয়েছিলেন বলশেভিক পার্টির অনেকেই। এই সময়ে গ্রেপ্তার এড়াতে লেনিন স্বেচ্ছানির্বাসনে যেতে বাধ্য হন ও এই সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই বলশেভিক পার্টির মধ্যে 'ওৎসোভিস্ট'দের প্রাধান্য দেখা দেয়। ১৯০৯ সালে বগদানভের অপসারণের পর এই অতি-বামপন্থীদের প্রভাব খানিকটা স্তিমিত হয়ে আসলেও লেনিনকে দীর্ঘদিন এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'ডুমা' পুনরায় চালু হবার পরে 'অবলোপনবাদের' প্রভাবও বাড়তে থাকে ও ১৯১২ সালে প্রাগে ষষ্ঠ নিখিল রুশ পার্টি সম্মেলনে এই ধারার প্রবক্তাদের বহিষ্কার করা হয়। এই দুটি ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেনিনের মতামত ছিল খুবই স্পষ্ট। প্রথমতঃ, জার প্রদত্ত ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি জনসাধারণের স্বৈরতন্ত্রবিরোধী সংগ্রামের জয় সূচনা করেছিল, অর্থাৎ, এই অধিকারগুলিকে জার জনগণকে প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন; সুতরাং

এগুলির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ লেনিনের মতে অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়তঃ, 'ডুমা'তে অংশগ্রহণ করার প্রশ্নে লেনিন বলেছিলেন যে বলশেভিকদের 'ডুমা'তে যোগ দেবার উদ্দেশ্য ছিল জারতন্ত্রকে সমর্থন জানান নয়; বরং জারতন্ত্রের মুখোশ খুলে দেবার জন্যই 'ডুমা'তে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন হয়েছিল।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং যুদ্ধকালীন অর্থনীতির সংকটের আবর্তে পড়ে গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থা এক চরম বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক সংকট অচিরেই রাজনৈতিক সংকটে রূপান্তরিত হয়। যুদ্ধে রাশিরার প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপকভাবে যুদ্ধবর্জনের মনোভাব দেখা যায় ও তার পরে সরকারী প্রশাসনও চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। সর্বোপরি গণঅসন্তোষ এই সময়ে তুঙ্গে ওঠে। বলশেভিক পার্টির সামনে এই পরিস্থিতি এক বিরাট সুযোগ এনে দেয়, বিশেষতঃ এই কারণে যে, এই সময়ে রাশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণীর বৃদ্ধি ছিল বিশেষ তাৎপর্যমূলক। ১৯১৫ সালে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ শ্রমিকই সেই সব কারখানায় নিযুক্ত ছিল যেখানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৫০০-র অধিক। বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় নিযুক্ত শ্রমিকদের ঘনত্বের এই তীব্রতা শ্রমিকশ্রেণীর চেতনার উন্মেষের পক্ষে ও বলশেভিকদের শ্রমিকদের মধ্যে সাংগঠনিক কার্যকলাপ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গভীরভাবে সহায়ক হয়েছিল।

একদিকে যুদ্ধপ্রসূত অর্থনৈতিক সংকট, অপরদিকে শ্রমিক শোষণের তীব্রতা শ্রমিক বিক্ষোভকে চরম আকার দেয়। জানুয়ারী ১৯১৭ সালে পেত্রোগ্রাদের প্রলেতারিয়েত ১৯০৫ সালের 'রক্তাক্ত রবিবার'কে স্মরণ করে ধর্মঘটে সামিল হয়। তাদের সংখ্যা ছিল ১,৫০,০০০। মার্চ মাসে পুতিলভ শিল্প সংস্থায় এক বিশাল ধর্মঘট সংগঠিত হয়। ৮ই মার্চ ৯০,০ ০ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয় ও তার দু'দিনের মধ্যে এই ধর্মঘট এক সর্বাত্মক আকার ধারণ করে। জার তার সেনাবাহিনীকে দিয়ে এই ধর্মঘটকে ভাঙার নির্দেশ দিলে সেনাবাহিনীর একটি অংশ ধর্মঘটি শ্রমিকদেব সঙ্গে যোগ দিলে জারের পতন আসন্ন হয়ে ওঠে। গোটা পেত্রোগ্রাদে গৃহযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ে ও শ্রমিকরা অস্ত্র ধারণ করে জারের স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এই ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের পরিণতিতে তৎকালীন রুশ ক্যালেণ্ডার

অনুযায়ী ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯১৭ সালে পেত্রোগ্রাড জনতার দখলে আসে ও তার অল্প দিনের মধ্যে জার পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ও জারতন্ত্রের অবসান সূচিত হয়।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে জারতন্ত্রের অবসান হলেও শ্রমিকশ্রেণীর বিক্ষোভের এই ব্যাপকতায় শংকিত, ত্রস্ত রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী জারতন্ত্রের পতনকে স্বাগত জানাল না। এর কারণটিও ছিল খুব স্পষ্ট। ক্ষয়প্রাপ্ত, দুর্বল, দুর্নীতিগ্রস্থ জারতন্ত্রকে টিঁকিয়ে রেখে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করত যে রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী, স্বভাবতই জারতন্ত্রের পতনের ফলে তারা নিজেদেরকে সর্বাধিক বিপদাপন্ন মনে করল। ফলে তাদের সামনে যে প্রশ্নটি দেখা দিল সেটি ছিল এই যে, জারতন্ত্রের অবসান হলেও নতুন রাজনৈতিক ক্ষমতা যেন কোনভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর করায়ত্ত না হয়। সেই উদ্দেশ্যে ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ সালে 'ডুমা'তে অংশগ্রহণকারী প্রভাবশালী বুর্জোয়া নেতারা একটি 'অস্থায়ী কমিটি' (Provisional Committee) গঠন করলেন ও একই সঙ্গে গঠিত হল 'পেত্রোগ্রাদ শ্রমিক ও সেনা প্রতিনিধিদের সোভিয়েত', যেখানে মেনশেভিকদের প্রাধান্য ছিল বেশী। কিন্তু যেহেতু সেখানে বলশেভিকরা সংখ্যায় একেবারে কম ছিল না, মেনশেভিকদের সঙ্গে যোগসাজসে 'অস্থায়ী কমিটি' নিজেকে 'অস্থায়ী সরকার' রূপে ঘোষণা করল। এই তথাকথিত সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রায় সকলেই ছিলেন বিভিন্ন বুর্জোয়া পার্টির প্রতিনিধি। পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের মেনশেভিক সদস্যরা এই নীতিকে সমর্থন জানিয়ে বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টাকে রোধ করে দিল। তার ফলে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবও রুশ জনগণের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিকে সুনির্দিষ্ট করতে পারল না। জারের স্বৈরতন্ত্রের অবসান হলেও যে 'অস্থায়ী সরকার' প্রতিষ্ঠিত হল, তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রইল বুর্জোয়াদের হাতে।

তৃতীয় পর্ব : মার্চ ১৯১৭—অক্টোবর বিপ্লব, ১৯১৭

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জারতন্ত্রের যে সংকট সৃষ্টি করেছিল তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে জারতন্ত্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জারকে ক্ষমতাচ্যুত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন লেনিন। তাই এই পর্বে লেনিনের স্লোগান ছিল, "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত কর"। লেনিনের মতে জারতন্ত্রকে আঘাত হানার সঠিক মুহূর্ত ছিল এটিই ও সে কারণেই লেনিনবাদের বিকাশের দ্বিতীয় পর্বে

লেনিনের মূল লক্ষ্য ছিল জারতন্ত্রের বিলোপ সাধন করা। কিন্তু তাঁর কাছে এটিই একমাত্র প্রশ্ন ছিল না। তাঁর কাছে আরও বড় প্রশ্নটি ছিল জারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পন্ন করে এই বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করা। এক কথায়, লেনিনের লক্ষ্য ছিল ফেব্রুয়ারী বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব রূপে গ্রহণ করা ও সেই মর্মে তিনি ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশ্লেষণ করেন। লেনিন তার Letters from Afar (১৯১৭), The Military Programme of the Proletarian Revolution (১৯১৭) প্রভৃতি রচনাগুলিতে এই আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকে লেনিন একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডে বিচার করেছিলেন। প্রথমতঃ, বিষয়গতভাবে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম শর্ত, কারণ স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটান ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সুসম্পন্ন করার পক্ষে অপরিহার্য। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা, অর্থাৎ, ফেব্রুয়ারী বিপ্লব যেহেতু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ব শর্ত মাত্র, সেহেতু বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এই বিপ্লবের লক্ষ্য হতে পারে না। বিশেষতঃ, ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি ছিল যেহেতু শ্রমিকশ্রেণী, সেহেতু শ্রমিক-শ্রেণীর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা।

জারতন্ত্রের পতনের পর বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা 'অস্থায়ী সরকার' প্রতিষ্ঠিত করে সেটিকে নিজেদের আয়ত্তাধীনে রেখে বিপ্লবের প্রক্রিয়াকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট হলেন, যাতে বলশেভিকদের পক্ষে ক্ষমতা দখল সম্ভবপর না হয়। আত্মগোপন অবস্থা থেকে প্রত্যাবর্তন করে লেনিন তাঁর 'এপ্রিল থিসিসে' (April Theses) নতুন পরিস্থিতিতে বলশেভিক পার্টির বিপ্লবী রণকৌশলকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করলেন। ইতিমধ্যে প্রবল গণবিক্ষোভের চাপে পড়ে ও বলশেভিকদের প্রচেষ্টায় পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত 'অস্থায়ী সরকারের' প্রতি আপসমূলক নীতির পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত অচিরেই এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় যে, কার্যতঃ এই সোভিয়েতের হাতেই মূল রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, যদিও আইনতঃ 'অস্থায়ী সরকার'ই রাশিয়ার সার্বভৌম সরকারই রয়ে গেল।

পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল শ্রমিক মিলিশিয়া গঠন, গণআদালত প্রবর্তন ও সেনাবাহিনীর প্রতিটি ইউনিটে নির্বাচিত সেনাকমিটি গঠন। এর ফলে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে রাশিয়াতে কার্যতঃ দু'টি ক্ষমতাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল: একটি হল পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত, যার হাতে রইল প্রকৃত ক্ষমতা ও যেখানে ইতিমধ্যে বলশেভিকরা তাদের নিজেদের অবস্থানকে সুসংহত করতে পেরেছিল। অপরদিকে তথাকথিত 'অস্থায়ী সরকার' নামে সার্বভৌম সরকার হলেও জনগণের এর প্রতি কোন সমর্থন ছিল না। লেনিন এই পরিস্থিতিকে 'দ্বৈত ক্ষমতা' (Dual Power) নামে চিহ্নিত করেছিলেন এবং 'অস্থায়ী সরকারের প্রতি সমস্ত সমর্থন প্রত্যাহার করে 'পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের' হাতে শান্তিপূর্ণভাবে সরকারী ক্ষমতা অর্পণ করার আহ্বান জানালেন। এই রণনীতির উদ্দেশ্য ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চৌহদ্দি থেকে বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে মুক্ত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উত্তরণ ঘটান। সে কারণেই এই পর্বে লেনিনের শ্লোগান ছিল, 'অস্থায়ী সরকারকে কোন সমর্থন নয়! সমস্ত ক্ষমতা দিতে হবে সোভিয়েতকে!' লেনিনের এই দৃষ্টিভঙ্গী বলশেভিক পার্টিকে এই পর্বে পরিচালনা করেছিল যার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবে।

ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবর,—এই পর্বটি লেনিনবাদের বিকাশের পক্ষে ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লব কোন্ পথে?—সেই পথ কি হিংসাত্মক না শান্তিপূর্ণ, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সঠিক বিশ্লেষণের ওপরে নির্ভর করছিল অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য। সাম্প্রতিককালের গবেষণার আলোকে এই পর্বে লেনিনবাদের বিকাশকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে।[4] (ক) ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই লেনিনের কাছে মূল প্রশ্নটি ছিল পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে গোটা দেশে সোভিয়েতগুলিকে শক্তিশালী করা, যাতে আসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে গণচেতনা, শ্রমিকচেতনা বৃদ্ধি পেতে পারে। এই পর্বে লেনিনের আলোচনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র সম্পর্কে দেশের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন

4. Lucien Sene, 'Documents on Problems of Dictatorship of Proletariat' *Marxist Miscellany*, No. 8, June 1977.

পাওয়া। তাই তিনি চেয়েছিলেন সোভিয়েতগুলিকে শক্তিশালি করে, মেনশেভিকদের প্রভাব হ্রাস করে সাধারণ মানুষকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করতে। লেনিনের আলোচনার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এপ্রিল থেকে জুলাই-এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সরকারী প্রশাসনের দুর্বলতা, দোদুল্যমানতা, গণসমর্থনের অভাব প্রভৃতির ফলে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে রক্তক্ষয়ী কোন গৃহযুদ্ধ ছাড়াই সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করার ঐতিহাসিক সম্ভাবনা সৃষ্ট হয়েছিল। তাই এই পর্বে বলশেভিকদের পেত্রোগ্রাদ শহর সম্মেলনে লেনিন প্রস্তাব দিলেন যে, রাশিয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে, অর্থাৎ, শ্রমিক ও কৃষকের হাতে শান্তিপূর্ণ পক্ষে ক্ষমতা অর্পণের বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। (খ) কিন্তু জুলাই-এর মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর এই মূল্যায়ন পরিবর্তন করতে লেনিন এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হলেন না যখন দেখা গেল যে 'অস্থায়ী সরকার' গণ অসন্তোষ, গণবিক্ষোভকে পরোয়া না করে এক প্রতিবিপ্লবী ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। কেরেনস্কির (Kerensky) নেতৃত্বে এই 'অস্থায়ী সরকার' বিপ্লবকে প্রতিহত করার জন্য যখন সরাসরি দমনপীড়নের পথ নিল, তখন জুলাই-আগস্ট মাসে লেনিন লিখলেন যে, রাশিয়াতে শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নটি অন্তর্হিত হয়েছে। অতএব, এই সরকারকে বলপ্রয়োগ করে, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা রইল না। এই সময়তে লেনিনের উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হল The Impending Catastrophe and How to Combat it, The State and Revolution প্রভৃতি। (গ) সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে, অর্থাৎ, অক্টোবর বিপ্লবের মাত্র তিন সপ্তাহ আগে লেনিনের বিশ্লেষণে আবার পরিবর্তন সূচিত হয়। এই সময়ে জারপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি বুর্জোয়া দলগুলির একাংশের সহযোগিতায় জেনারেল করনিলভের (Kornilov) নেতৃত্বে 'অস্থায়ী সরকারকে' উৎখাত করে জারতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে একটি প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় প্রধানতঃ শ্রমিকশ্রেণী এবং পেত্রোগ্রাদ শহরের সেনাবাহিনী ও বাল্টিক নৌসেনাদের সম্মিলিত প্রতিরোধের ফলে। এই ঘটনার ফলে রুশ জনগণের কাছে 'অস্থায়ী সরকারের' প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ এই সরকারের প্রতিনিধিদের একাংশ, যাঁরা 'সাংবিধানিক গণতন্ত্রী' (Constitutional-Democrat) নামে

পরিচিত ছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে করনিলভ প্রতিবিপ্লবকে সাহায্য দান করে। সেই সঙ্গে রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষের কাছে এ কথাও প্রমাণিত হল যে, জনগণের প্রকৃত স্বার্থরক্ষাকারী ভূমিকা পালন একমাত্র বলশেভিকরাই করতে পারে, কারণ করনিলভ বিদ্রোহ দমনে তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করনিলভ বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে এক নতুন পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্ট হল, যার সঙ্গে মোটামুটিভাবে এপ্রিল-জুলাই পর্বকে তুলনা করা যেতে পারে। লেনিনের বক্তব্য ছিল যে, করনিলভ প্রতিবিপ্লবের ব্যর্থতা 'অস্থায়ী সরকারের' জনবিরোধী চরিত্র, বুর্জোয়া দলগুলির ও মেনশেভিকদের দুর্বলতা ও দোদুল্যমানতাকে, সর্বোপরি এদের সকলের প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গীকে সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে বলশেভিকদের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের জনসমর্থন আদায় করার এক অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছিল এই ঘটনা। আর তার ফলে সোভিয়েতের হাতে সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পণের দাবি ক্রমেই জনসাধারণের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে উঠছিল। এই পরিস্থিতিতে লেনিন তাঁর On Compromises রচনায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথকে পরিহার করে 'অস্থায়ী সরকার'কে পদচ্যুত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার নতুন এক সম্ভাবনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। লেনিনের বক্তব্য ছিল যে, এটি ছিল ইতিহাসের এক অতি বিরল মুহূর্ত যখন কেরেনস্কি সরকারের অবস্থা হয়ে উঠেছিল সমস্ত দিক থেকে অত্যন্ত শোচনীয় ও যার পরিণতিতে এই অপদার্থ, জনবিরোধী দুর্বল সরকারের ওপরে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে রক্তাক্ত সংঘর্ষের পথকে সাময়িকভাবে বাতিল করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার এক ঐতিহাসিক সম্ভাবনা উদিত হয়েছিল। লেনিনের মত ছিল যে, এই সুযোগ ছিল স্বল্পস্থায়ী, কিন্তু অভূতপূর্ব, কারণ 'অস্থায়ী সরকারের' পক্ষে জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন সক্রিয় প্রতিরোধ করা সেই মুহূর্তে সম্ভব ছিল না। এই বিশেষ মুহূর্তের পূর্ণ সুযোগ নেবার ইঙ্গিত পাওয়া যায় লেনিনের এই পর্বের রচনায়। (ঘ) কিন্তু লেনিনের এই মূল্যায়নকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সোভিয়েতগুলির পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সোভিয়েতগুলিতে তখনও পর্যন্ত মেনশেভিকদের প্রভাব, বিশেষতঃ বলশেভিকদের মধ্যে এই প্রশ্নে গুরুতর মতভেদ এই সুযোগকে হাতছাড়া করে দেয়। 'অস্থায়ী সরকার' তার পতন আসন্ন জেনে এক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিপ্লবী শক্তিগুলিকে চূড়ান্ত আঘাত হানার পরিকল্পনা করে।

লেনিন যে মুহূর্তে উপলব্ধি করেন যে, ইতিহাস তাকে যে সুযোগ দিয়েছিল তা অতিক্রান্ত, সেই মুহূর্তে তিনি আহ্বান জানান সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের, যাতে 'অস্থায়ী সরকার'কে প্রতিবিপ্লবী আঘাত হানার কোন সুযোগ না দিয়েই অপসারিত করা যায়। এরই পরিণতি অক্টোবর মহাবিপ্লব, 'অস্থায়ী সরকারের' পতন ঘটিয়ে যেটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা করে। এই পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য The Bolsheviks must assume Power, Marxism and Insurrection, Advice of an Onlooker প্রভৃতি লেনিনের একাধিক প্রবন্ধ।

চতুর্থ পর্ব : ১৯১৭—লেনিনের মৃত্যুকাল, ১৯২৪

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার এই পর্বে লেনিন তাঁর একাধিক রচনার মাধ্যমে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রতিক্রিয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের রাষ্ট্রক্ষমতায় টিঁকে থাকার প্রশ্ন, কমিউনিস্ট আন্দোলনে বামপন্থী হঠকারিতার বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নের বিশ্লেষণ ও উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রণকৌশল নির্ধারণ। বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে না গিয়েও এ কথা বলা যায় যে, প্রতিটি প্রশ্নের বিশ্লেষণই ছিল লেনিনবাদের বিকাশের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

এই আলোচনা থেকে বিপ্লব সম্পর্কে লেনিনবাদী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমতঃ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রশ্নে লেনিনের কাছে হিংসাত্মক বা অহিংসাত্মক কোন পথই চূড়ান্ত ছিল না। বিপ্লব কোন পথে আসবে সেটি অনেকাংশেই নির্ভর করবে বিপ্লবকে যারা প্রতিহত করতে চায় তাদের শক্তি, সামর্থ ও পন্থার ওপরে। তারা হিংসাত্মক, প্রতিবিপ্লবী পথ অনুসরণ করলে বিপ্লবী শক্তিগুলিকেও হিংসার আশ্রয় নিতে হবে বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য। যেমন, জুলাই ১৯১৭তে ও অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বমুহূর্তে 'অস্থায়ী সরকারের' প্রতিবিপ্লবী পথকে রুদ্ধ করার জন্য বলশেভিকদের অস্ত্র ধরতে ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান জানাতে লেনিন বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করেননি। দ্বিতীয়তঃ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যেহেতু জনগণের স্বার্থে পরিচালিত হয়,

সেহেতু বিপ্লবের অনুগামী শক্তিগুলির সব সময়েই প্রচেষ্টা হবে রক্তাক্ত সংঘর্ষের পথকে যথাসম্ভব পরিহার করে ন্যূনতম লোকক্ষয়ের মাধ্যমে বিপ্লবের পথকে প্রশস্ত করা। এই পরিপ্রেক্ষিতেই লেনিন এপ্রিল-জুলাই ও সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সালে দু'টি ঐতিহাসিক সুযোগের কথা বলেছিলেন যার ভিত্তিতে রাশিয়াতে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের পথকে এড়িয়ে গিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্র গঠনের স্বার্থে ও শ্রমজীবী মানুষের রক্তক্ষয়ের পথকে রোধ করতেই লেনিন এই বিরল মূহূর্তটির সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

তৃতীয়তঃ, লেনিন বারে বারেই বলেছেন যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সুনিশ্চিত করার অন্যতম শর্ত হল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন লাভ করা। সমাজতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি হল শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষক। তাই যে পার্টি ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যে আদর্শ বিপ্লবকে পরিচালনা করে, জনগণের তাদের প্রতি ব্যাপক সমর্থন ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করা যায় না,—বিশেষতঃ এই কারণে যে, ব্যাপক গণসমর্থনই একমাত্র বিপ্লব-বিরোধী শক্তিগুলিকে চিহ্নিত করে জনজীবন থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে। লেনিন যখন সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের মাত্র সপ্তাহ কয়েক পূর্বেও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সম্ভাবনা বাতিল করে দেবার কথা ভেবে-ছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিত এটাই ছিল যে, সেই ঐতিহাসিক মূহূর্তে একদিকে যেমন প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি জনজীবন থেকে হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন, অপরদিকে তেমন বলশেভিকদের পক্ষে ব্যাপক গণসমর্থনও নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। চতুর্থতঃ, বিপ্লবের পথ ও রণকৌশল সম্পর্কে লেনিন কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়ে যাননি। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে'হলে অবস্থার পরিবর্তন অনুযায়ী রণকৌশলের পরিবর্তনও মূহূর্তের মধ্যে করতে হবে। কোন একটি পথকে চূড়ান্ত বলে ধরে নিলে তা হবে নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতার পরিচয়। তাই লেনিন ১৯১৭ সালে এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে অন্ততঃ চারবার অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে রণ-কৌশলের পরিবর্তন করেছিলেন ও সেগুলি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। শান্তিপূর্ণ পথ → রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ → শান্তিপূর্ণ পথ → রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এই ধারায় লেনিন এগিয়েছিলেন বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের

সময় পর্যন্তও লেনিন মূলতঃ এই নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। কখনও 'দুমা'য় অংশগ্রহণ, কখনও আত্মগোপন অবস্থায় সংগ্রাম পরিচালনা, এই বাঁকাচোরা পথে, সমস্ত ধরনের রণকৌশলের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি বলশেভিক পার্টির রণনীতি নির্ধারণ করেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই লেনিন অতি-বামপন্থী 'ওৎসোভিস্ট' ও চরম সংশোধনবাদী 'অবলোপনবাদী'দের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পঞ্চমতঃ, লেনিনেব রণকৌশলের অন্যতম তাৎপর্য ছিল এই যে, জনসাধারণের মধ্যে সোভিয়েত ধাঁচের সংগঠন গড়ে তুলে তার মাধ্যমে জনমানসে শ্রমজীবী পার্টির প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে অক্টোবর বিপ্লবের সময়-কাল পর্যন্ত 'অস্থায়ী সরকারের' বিরুদ্ধে যে অসংখ্য গণআন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছিল, তার অন্যতম চালিকাশক্তি ছিল সোভিয়েতগুলি। সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবকে জয়যুক্ত করতে সোভিয়েতের ভূমিকাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে লেনিন মার্কসীয় বিপ্লবী তত্ত্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজন করেছিলেন।

॥ ৩ ॥

লেনিনবাদের দার্শনিক পটভূমিকা

লেনিনের সামগ্রিক চিন্তাভাবনার যেমন একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছিল, তেমনি আবার বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও লেনিনবাদেব বিকাশ ঘটেছিল। প্রয়াত সোভিয়েত এ্যাকাডেমিসিয়ান ভি. ভি. আদোরাৎস্কি (V. V. Adoratsky) লেনিনের দার্শনিক চিন্তার বিকাশকে মূলতঃ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্ব : তরুণ লেনিনের সময়কাল থেকে ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব ; দ্বিতীয় পর্ব : ১৯০৫-১৯১৪ সাল ; তৃতীয় পর্ব : ১৯১৪-১৯১৬ সাল।

প্রথম পর্ব ঃ তরুণ লেনিনের সময়কাল—
১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব

এই পর্বে তরুণ লেনিনের দার্শনিক রচনার কেন্দ্রবিন্দুটি ছিল নারদনিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই সময়ে, অর্থাৎ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে, রাশিয়াতে নারদনিক ভাবাদর্শ বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মতপার্থক্য

সত্ত্বেও এই মতাদর্শের মূল পুরোধা ছিলেন পি. এল. লাভরভ (P. L. Lavrov) [১৮২১-১৯০০] এবং এন. কে. মিখাইলভ্‌সকি (N. K. Mikhailovsky) [১৮৪২-১৯০৪]। নারদনিকদের চিন্তাভাবনা ছিল মার্কসবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত বিন্দুতে অবস্থিত। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, ইতিহাসের নিজস্ব কোন অর্থ নেই ; বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী এককভাবে নিজেদের লক্ষ্য স্থির করে ইতিহাসে গতি সঞ্চার করে, অর্থাৎ, ইতিহাসের বিবর্তনের ঐতিহাসিক, বস্তুবাদী ভিত্তি ও ব্যাখ্যাকে তাঁরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন। এই বক্তব্যের জের টেনে নারদনিক দার্শনিকেরা প্রচার করেন যে, ইতিহাসের উদ্দেশ্য হল প্রগতিকে সুনিশ্চিত করা এবং প্রগতিকে নিশ্চয়তা দিতে পারেন একমাত্র বুদ্ধিজীবীরা, কারণ তাঁরাই হলেন দেশের মুক্তিপথের দিশারী। রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, এখানে প্রলেতারিয়েত বা পুঁজিপতি কোন শক্তিই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে না ; রাশিয়ার মুক্তি, তাঁদের মতে, নির্ভরশীল ছিল বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক সমাজের ওপরে। ১৮৯০ সালের পরে রাশিয়াতে প্লেখানভের প্রচেষ্টায় মার্কসবাদের প্রসার শুরু হয় ও ১৮৯৩-৯৪ সালে তা বিস্তৃতি লাভ করে। নারদনিকদের এই ব্যক্তি কেন্দ্রিক, বাস্তববিমুখ ইতিহাসব্যাখ্যার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্লেখানভ ও লেনিন। প্লেখানভ তাঁর The Development of the Monist View of History (১৮৯৫) গ্রন্থে নারদনিকদের ব্যাখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন।

প্রায় গোড়া থেকেই রুশ মার্কসবাদী মহলে দু'টি ধারা পরিলক্ষিত হয়। একটি ধারা, যার প্রতিনিধি ছিলেন প্লেখানভ, তরুণ লেনিন প্রমুখেরা, মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রতি ছিল সম্পূর্ণ আস্থাশীল। অপর একটি ধারার প্রবর্তকরূপে আবির্ভূত হলেন পি. স্ত্রুভে (P. Struve), এন. বেরদিয়াএভ্‌ (N. Berdyaev), এস. বুলগাকভ্‌ (S. Bulgakov) ও পরবর্তীকালে এ. বগদানভ্‌ (A. Bogdanov)। এঁদের মতে, মার্কসীয় ইতিহাসব্যাখ্যা হল এক ধরনের যান্ত্রিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণ, যা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উপাদানের মাধ্যমে ইতিহাসব্যাখ্যার চেষ্টা করে। এঁদের বক্তব্য ছিল যে, শেষ বিচারে ব্যক্তি হল স্বাধীন ও তার স্বাধীন চেতনাকে কোন তথাকথিত নিয়মশৃংখলের মধ্যে বাঁধা সম্ভবপর নয়। এঁরা এই যুক্তিটিকে আরও এক ধাপ প্রসারিত করে

বলেন যে, ব্যক্তিচেতনা অনেকাংশেই স্বয়ম্ভু ও চৈতন্যের বিকাশ অনেকাংশেই বাস্তব জগতের প্রথামত নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাঁদের এই চিন্তার পিছনে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল জার্মানীতে নয়া-কাণ্টবাদের প্রবক্তা লাঙ্গে (Lange), রীহ্‌ল (Riehl), ভিণ্ডেলবাণ্ড্ (Windelband), রিকার্ট (Rickert) প্রমুখের চিন্তার।

এই পটভূমিতে ১৮৯৪ সালে লেনিন তাঁর What the Friends of the People are and how they fight the Social Democrats রচনা করেন। তাঁর পরবর্তী রচনা The Economic Content of Narodism and the Criticism of it in Mr. Struve's book প্রকাশনের অনুমতি পায়নি। দ্বিতীয় রচনাটি লেনিন প্রস্তুত করেন স্ত্রুভের Critical Remarks on the Problem of Russian Economic Development-এর সমালোচনা রূপে। স্ত্রুভের এই রচনাটি আপাতদৃষ্টিতে নারদনিকদের বিরুদ্ধে লিখিত হলেও তার সঙ্গে মার্কসবাদের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁর কাছে রুশ সমাজব্যবস্থার অর্থ ছিল সমাজজীবনের দুরবস্থার বিভিন্ন দিকের সুসমঞ্জস যোগফলের একটি বর্ণনা মাত্র। অপরদিকে লেনিন তাঁর দু'টি রচনাতেই রুশ সমাজজীবনকে এক ক্ষয়িষ্ণু অর্থব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রতিফলন রূপে চিত্রায়িত করেছিলেন। তারই পরিণতিতে লেনিন ১৮৯৯ সালে রচনা করেন The Development of Capitalism in Russia। রাশিয়াতে মার্কসবাদ চর্চার প্রথমাবস্থায় স্ত্রুভে ও তাঁর অনুগামীরা মার্কসবাদকে সরাসরি অস্বীকার না করে 'ভিন্নমতাবলম্বী মার্কসবাদ' (Critical Marxism) নামে একটি ধারার সৃষ্টি করেছিলেন, যদিও পরবর্তীকালে অল্পদিনের মধ্যেই মার্কসবাদের সঙ্গে সব সংশ্রব তাঁরা ত্যাগ করেন। কিন্তু প্লেখানভ ও লেনিনের সঙ্গে এই নব্যপন্থী মার্কসবাদীদের বিরোধ একেবারে শুরু থেকেই আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৯৮ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত প্লেখানভ একগুচ্ছ প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে এই নয়া মার্কসবাদের সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে Our Critics Criticised এই নামে প্লেখানভের রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। স্ত্রুভের বিরুদ্ধে লিখিত লেনিনের প্রবন্ধ ছিল এই মতাদর্শগত আক্রমণেরই একটি নিদর্শন।

দ্বিতীয় পর্ব : ১৯০৫—১৯১৪ সাল

১৮৯৮ সালে আর. এস. ডি. এল. পি. প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ১৯০৫ সালের ব্যর্থ রুশ বিপ্লবের সময়কাল পর্যন্ত লেনিন প্রত্যক্ষভাবে কোন দার্শনিক রচনায় মনোনিবেশ করেননি, কারণ এই সময়টি ছিল পার্টির মধ্যে বলশেভিকদের সাংগঠনিক ও আদর্শগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কালপর্ব। অবশ্য আদোরাৎস্কির প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এই সময়তেও দর্শন সম্পর্কে লেনিনের চির আগ্রহ অক্ষুণ্ণ ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০০ সালে 'নির্বাসন থেকে ফিরে এসে লেনিন তাঁর মায়ের কাছে যে গ্রন্থগুলি প্রেরণ করেন তাব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্পিনোজা, কাণ্ট্, ফিয্‌টে, শেলিং, ফয়েরবাখ্, লাঙ্গে ও প্লেখানভের রচনাবলী।

১৯০৫ সালের পরবর্তী অধ্যায়ে, যখন জারতন্ত্র প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাসের মাধ্যমে রুশ বিপ্লবেব প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর, অস্ট্রিয়ার নয়াকাণ্টীয় পদার্থবিজ্ঞানী ও দার্শনিক ই. মাখ্ (E. Mach) [১৮৩৮-১৯১৬] ও আর. আভেনারিয়ুসের (R. Avenarius) [১৮৪৩-১৮৯৬] প্রভাবে রাশিয়াতে দর্শনের জগতে বগদানভের নেতৃত্বে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়, যেটি প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ (Empirio-Criticism) নামে পরিচিত। লেনিনের চোখে এই দর্শনের মূল আক্রমণের বিষয়বস্তু ছিল মার্কসবাদ এবং এর উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লববিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে মদত দেওয়া, কারণ মার্কসবাদবিরোধীদের কাছে প্রত্যক্ষ বিচারবাদী দর্শন ছিল এক মহান অস্ত্রস্বরূপ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৯ সালে লেনিন রচনা করেন তাঁর Materialism and Empirio Criticism। যদিও লেনিনের পূর্বে প্লেখানভ প্রত্যক্ষ বিচারবাদী দর্শনের বিরোধিতা করেছিলেন, তা ছিল খুবই দুর্বল ও অস্পষ্ট। রাশিয়াতে প্রত্যক্ষ-বিচারবাদের নেতা ছিলেন বগদানভ, বাজাবভ (Bazarov) [১৮৭৪-১৯৩৯], লুনাচারস্কি (Lunacharsky) [১৮৭৫-১৯৩৩], বারম্যান (১৮৬৮-১৯৩৩) প্রমুখেরা। Materialism and Empirio-Criticism গ্রন্থে লেনিনের আলোচনাকে দু'টি প্রধান বিষয়রূপে চিহ্নিত করা যায়।

(ক) মাখ্ ও আভেনেরিয়ুস ও তাঁদের অনুসরণ করে বগদানভ প্রমুখেরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিকল্প এক দর্শন প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়েছিলেন। প্রথমতঃ, তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, জ্ঞানের উৎস বস্তুজগতের বাস্তব উপস্থিতি নয় ; তার উৎসটি হল ব্যক্তির সংবেদন (sensation), যার সত্তাটি সার্বভৌম।

দ্বিতীয়তঃ, বস্তুজগৎ সম্পর্কে ব্যক্তির জ্ঞান যেহেতু সংবেদননির্ভর, সেহেতু বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ কখনই বিষয়গত হতে পারে না ; অর্থাৎ, বস্তুজগৎ সম্পর্কে বিষয়গতভাবে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর নয়। আপাতদৃষ্টিতে এই দু'টি প্রতিপাদ্য থেকে এ কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, এঁরাও মার্কসবাদীদের মত বস্তুবাদী এবং মার্কসবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-বিচারবাদের বোধহয় কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। তার কারণ, মার্কসবাদীদের মত এঁরাও মনে করেন যে, বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ সংবেদনলব্ধ একটি প্রক্রিয়া ; জ্ঞান সংবেদন নিরপেক্ষ কোন বিমূর্ত বিষয় নয়। প্রত্যক্ষ বা সংবেদনই যে জ্ঞানের উৎস, এ প্রশ্নে কোন মতবিরোধ নেই, ঠিকই। কিন্তু "আসল বিতর্ক হলো প্রত্যক্ষেব স্বরূপ নিয়ে, প্রত্যক্ষের উৎস নিয়ে। নব্য-ভাববাদীরা প্রত্যক্ষ-স্বলক্ষণ জাতীয় কিছুর কল্পনা করেন—প্রত্যক্ষেরই বা সংবেদনেরই বুঝি কোনো একরকম স্বাধীন বা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা আছে এবং তাছাড়া দুনিয়া বলে কোথাও কিছু নেই, কিংবা দুনিয়া বলতে আমরা যা বুঝি তাব একমাত্র উপাদান যেন ওই সংবেদন-মাত্রই। বস্তুবাদী মতে কিন্তু প্রত্যক্ষ মানেই কোনো-কিছুর প্রত্যক্ষ, সংবেদন বলতে বাহ্যবস্তুরই সংবেদন। সংবেদন আছে, কিন্তু তা নিছক সংবেদন ; তাকে কোনো কিছুর সংবেদন বলা যাবে না, কোনো বাহ্যবস্তুর সংবেদন বলা যাবে না, সে সংবেদন থেকে কোনো বহির্বস্তুরই নির্দেশ পাওয়া যাবে না,—এ জাতীয় কথা বস্তুবাদীর দৃষ্টিতে নেহাতই অসংলগ্ন।"[5] প্রত্যক্ষ-বিচারবাদের সঙ্গে লেনিনের মূল বিতর্কটি যথার্থভাবেই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এই প্রশ্নে। এক কথায়, প্রত্যক্ষবাদীরা মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বের বিকল্পরূপে ভাববাদের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। লেনিনের কথায়, "অভিজ্ঞতা বা সংবেদন বা প্রত্যক্ষই সমস্ত জ্ঞানের উৎস। কথাটা ঠিকই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রত্যক্ষের মধ্যে কি বাহ্য সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, অর্থাৎ বাহ্য সত্তাই কি প্রত্যক্ষের উৎস ? উত্তরে আপনি যদি বলেন হাঁ, তাহলে আপনি হলেন বস্তুবাদী। উত্তরে যদি আপনি বলেন 'না', তাহলে আপনি অসংলগ্নতার দোষে দুষ্ট হবেন এবং শেষ পর্যন্ত উপনীত হবেন অধ্যাত্মবাদে (ভাববাদে)।"[6]

5. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, "দার্শনিক লেনিন" পৃঃ ৬২-৬৩।

6. **Materialism and Empirio-Criticism** থেকে অনূদিত ও উক্ত, ঐ, পৃঃ ৬২।

সংবেদনের যে নিজস্ব কোন সার্বভৌম সত্তা নেই, তার উৎস যে বস্তুজগৎ ও আমাদের চেতনায় সংবেদনের মাধ্যমে বস্তুজগতের যে যথাযথ প্রতিফলন হয়, লেনিনের এই বক্তব্য সাধারণভাবে "প্রতিবিম্বতত্ত্ব" (Reflection theory) নামে খ্যাত। আজকের পৃথিবীতে মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বে লেনিনের এই মৌলিক সংযোজন একাধিক পশ্চিমী তাত্ত্বিক ও উদারপন্থী মার্কসবাদীদের সমালোচনায় কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আভিনেরি, পেত্রোভিচ্ (Petrović), কোলাকোভ্‌সকি প্রমুখেরা।[7] এঁরা মনে করেন যে, লেনিন সংবেদনের স্বয়ম্ভূ সত্তাকে অস্বীকার করে মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বে কার্যতঃ যান্ত্রিকতার আমদানী করেছেন এবং জ্ঞানলাভের প্রশ্নকে সম্পূর্ণভাবে বস্তুজগৎ নির্ভর একটি প্রক্রিয়া রূপে ব্যাখ্যা করে মার্কসীয় দর্শনে সক্রিয় অনুশীলন (Praxis)-এর ভূমিকাকে বর্জন করেছেন। এই তাত্ত্বিকদের যুক্তি যে কতখানি অসার ও ভ্রান্ত, সেটি লেনিনের "প্রতিবিম্বতত্ত্বের" সঠিক বিশ্লেষণ করলেই বোধগম্য হয়। লেনিন একথা কখনই বলেননি যে ব্যক্তি তার চেতনায় সংবেদনের মাধ্যমে বস্তুজগতের নিষ্ক্রীয় প্রতিফলন (passive reflection) ঘটায়। 'প্রতিফলন' বলতে লেনিন কি বোঝাতে চেয়েছেন, তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিয়েছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ভাববাদীর মতে চেতনার সক্রিয়তা একেবারে চরম অর্থে বা সম্পূর্ণ বিনা শর্তে বুঝতে হবে: চেতনা যেন কোনো-একরকম সর্বশক্তিমান স্রষ্টার মতো, পুরো দুনিয়ার অস্তিত্বই বুঝি তার উপর নির্ভর করছে! বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস-এর দৃষ্টিকোণ থেকে মোটেই তা নয়। চেতনার সক্রিয়তা বস্তুজগতের জ্ঞান-সাপেক্ষ: বস্তুজগতের নির্ভুল জ্ঞান দিতে পারে বলেই চেতনা সক্রিয়ভাবে বহির্জগৎ পরিবর্তনে সমর্থ হয়। অর্থাৎ যতো নির্ভুলভাবে, যতো নিশ্চিতভাবে আমাদের চেতনায় বহির্জগৎ প্রতিবিম্বিত হয় ততোই সার্থকভাবে আমাদের চেতনা বহির্জগৎ পরিবর্তনের সামর্থ্য অর্জন করে।...চেতনার সক্রিয় ভূমিকায় এই একান্ত অস্বীকৃতির জন্যেই মার্কস তাঁর "থিসিস অন ফয়েরবাখ"-এ সাবেকী বস্তুবাদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে মার্কস চেতনার সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত ভাববাদী কল্পনায় প্রত্যাবর্তন

7. এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য John Hoffman, *Marxism and the Theory of Praxis*, পৃ: ৭১-৮১, ১৮৪-৮৯।

করতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বস্তুবাদ বর্জন নয়, বস্তুবাদেই সমৃদ্ধিসাধন। কিন্তু প্রাকসিস-পন্থীদের [যুগোশ্লাভিয়ায় উদারনীতিপন্থী মার্কসবাদ—শো. দ.] উদ্দেশ্য তা নয়। চেতনার সক্রিয় ভূমিকা সমর্থনের অজুহাতে তাঁরা চেতনার এই সক্রিয় ভূমিকাকে সঠিকভাবে বোঝাবার মূল বস্তুবাদী শর্তটিই বরবাদ করে দিতে চান, লেনিনের বিরুদ্ধে তর্ক তুলে বলেন যে তার প্রতিবিম্ববাদ নিষ্ফল নিষ্ক্রিয়তারই সমর্থন করে বিপ্লব বানচাল করবার আয়োজন করে।[8]

এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ বিচারবাদীরা কার্যতঃ এক ধরনের দৃষ্টবাদী (positivist) দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণ রচনা করেছিলেন। এঁদের মতবাদকে গ্রহণ করার অর্থ হল এই যে, জ্ঞান আপেক্ষিক ও সংবেদন-নির্ভর বলে বস্তুজগৎ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করার প্রশ্নটি অবান্তর এবং বস্তুজগৎকে পরিবর্তন করার প্রশ্নটিও তার ফলে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ ভাববাদেরই পুনরুক্তি মাত্র। ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের পরে শাসক শ্রেণীর সামনে যে সংকট দেখা দেয়, প্রত্যক্ষ বিচার-বাদীদের বক্তব্য কার্যতঃ সমাজব্যবস্থাকে অপরিবর্তনীয় রাখতে তাদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তৃতীয়তঃ, লেনিনের "প্রতিবিম্বতত্ত্ব" মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের একাধিক রচনায় ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছিলেন। লেনিন "প্রতিবিম্বতত্ত্বের" মাধ্যমে চেতনার সক্রিয় ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্যকে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বে লেনিনের সংযোজনকে সূত্রাকারে তিনটি প্রধান নীতির মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা যায়। এক, বস্তুজগতের বিষয়গত অস্তিত্ব মানুষের চেতনা নিরপেক্ষ ; দুই, বস্তুজগৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করা সম্ভব ; তিন, জ্ঞানের উৎস যেমন কোন বিমূর্ত সংবেদনপুঞ্জ নয় ও বস্তুজগৎই যেমন জ্ঞানের উৎস, তেমনি প্রকৃত ও সঠিক জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়ায় মানবচৈতন্যের ভূমিকাও অত্যন্ত সক্রিয়, যার ফলে বস্তুজগৎ সম্পর্কে ধারণা ও তার পরিবর্তন সাধন করা যায়। লেনিনের এই সত্ত্বের তাৎপর্য ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার

৪. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, "দার্শনিক লেনিন", পৃঃ ৮৬-৮৭।

ক্ষেত্রেও সুগভীর।[৭] সমাজজীবনে লেনিনের "প্রতিবিম্বতত্ত্বের" প্রয়োগের অর্থ হল যে, ব্যক্তির সমাজচেতনা সমাজজীবন থেকে উৎসারিত হয় ও এই চেতনা সমাজজীবনের সঠিক প্রতিবিম্বেরই ফলশ্রুতি। সমাজজীবন সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভের ফলে সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কেও ব্যক্তি সচেতন হয় ও সেখান থেকেই সৃষ্টি হয় বিপ্লব। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই লেনিন শ্রমিক আন্দোলনে ও বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ততার বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্টির সক্রিয় ভূমিকার গুরুত্বকে প্রথমাবধি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এক কথায়, লেনিনের "প্রতিবিম্বতত্ত্ব" মার্কসবাদের বিকৃতি নয়, বরং মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বে অন্যতম উল্লখযোগ্য অবদান।

(খ) Materialism and Empirio Criticism গ্রন্থে লেনিন দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি আলোচনা করেছিলেন সেটিও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অন্যতম প্রশ্ন। পরমাণু (atom) আবিষ্কৃত হবার পরে পদার্থবিদ্যার জগতে এই ধারণা জন্মেছিল যে, এটিই হল পদার্থের চূড়ান্ত ও শেষ রূপ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ক্রিয়াক্ষেত্র (electro-magnetic field) আবিষ্কারের ফলে পদার্থবিদ্যার এই ধারণা প্রচণ্ড আঘাত পায়। এখন দেখা গেল যে পরমাণুই পদার্থের শেষ কথা নয়; বরং পদার্থের অর্থ দাঁড়ায় এমন এক জগৎ যেখানে পজিটিভ নিউক্লিয়াসকে নেগেটিভ ইলেকট্রন্ কণা আবর্তন করছে। অণুর এই বিভাজনের ফলে এল. উলভিন্ (L. Houllevigne) প্রমুখ পদার্থবিদরা-বলে বসলেন যে, পদার্থ বলে তবে আর কিছু রইল না এবং পদার্থের ধারণারও অবলুপ্তি ঘটেছে। পদার্থবিদ্যার জগতে এর ফলে যে সংকট উপস্থিত হল, প্রত্যক্ষ বিচারবাদীরা তাতে উৎসাহিত হয়ে বললেন যে, বস্তুর যেহেতু বিলুপ্তি ঘটেছে, বস্তু বলতে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের অণুর প্রতিক্রিয়া মাত্র বোঝায়, সেহেতু মার্কসীয় দর্শনে বস্তুজগৎকে যে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাও অচল হয়ে পড়েছে। লেনিন এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেখালেন যে, ইলেকট্রন্ হল অফুরাণ, অর্থাৎ, বস্তুর কোন ক্ষয় নেই। লেনিন বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, ইলেকট্রনের আবিষ্কার পদার্থবিদ্যার জগতে সংকট সৃষ্টি না করে বরং এটাই প্রমাণ করেছে যে বস্তুজগৎ চলমান,

গতিশীল ও এই বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া অনন্তকাল ধরে চলবে। লেনিনের বক্তব্য অনুযায়ী, ইলেকট্রনের আবিষ্কারের ফলে বস্তুর মৃত্যু ঘোষিত হল না, বস্তুজগতের সীমানা সম্পর্কে পূর্বের জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটল মাত্র। তার অর্থ, মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তিই এর ফলে শক্তিশালী হল, অর্থাৎ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল কথাটিই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল যে, বস্তুর অস্তিত্ব চেতনা নিরপেক্ষ এবং বস্তুজগৎ চলমান, অনন্ত ও অফুরাণ। সাম্প্রতিককালের পদার্থ-বিদ্যার গবেষণা লেনিনের এই বক্তব্যকেই প্রমাণিত করেছে।[10]

তৃতীয় পর্ব ঃ ১৯১৪—১৯১৬ সাল

যুদ্ধের দিনগুলিতে সুইজাবল্যাণ্ডে স্বেচ্ছানির্বাসনের সময়ে লেনিন নতুন করে দর্শনচর্চায় মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তিনি হেগেল, ফয়েরবাখ, অ্যারিস্টটল প্রমুখ দার্শনিকের রচনা ও সমকালীন রুশ দর্শন গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন আসন্ন রুশ বিপ্লবের পবিপ্রেক্ষিতে দ্বন্দ্বতত্ত্বের গুরুত্বকে উপস্থাপিত করার প্রয়োজনে। এই সময়ে বচিত লেনিনের নোটগুলি পরবর্তীকালে Philosophical Notebooks নামে প্রকাশিত হয়। লেনিনের এই খসড়া রচনাগুলিতে দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিশ্লেষণ সংক্রান্ত মোট তিন ধরনের বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, সাধারণভাবে দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিশ্লেষণ ; দ্বিতীয়তঃ, দ্বন্দ্বতত্ত্ব, মার্কসীয় যুক্তিতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্বেব পারস্পরিক সম্পর্কের ও ঐক্যের আলোচনা ; তৃতীয়তঃ, সমাজ পবিবর্তনেব স্বার্থে দ্বন্দ্বতত্ত্বের দার্শনিক তাৎপর্যের ব্যাখ্যা।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, দ্বন্দ্বতত্ত্বের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন Philosophical Notebooks-এব রচনাগুলির মাধ্যমে মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বে নতুন মাত্রা যোগ করেন। লেনিন জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে দর্শনের দু'টি প্রধান ধারাকে নস্যাৎ করেছেন। দেকার্ত, লাইবনিৎজ্ (Leibnitz) প্রমুখেরা যাঁরা জ্ঞানকে সংবেদন নিরপেক্ষ একটি কল্পনাশ্রয়ী বিষয় মনে কবেন, তাঁদের বক্তব্যকে লেনিন বর্জন করেছেন। আবার একই সঙ্গে সাবেকী বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের (empiricism) প্রবক্তারূপে লক্, কঁদিলাক্

10. এই বক্তব্যের সমর্থনে দ্রষ্টব্য, V. S. Barashenkov and D. I. Blokhintsev, 'Lenin's Idea of the Inexhaustibility of Matter in Modern Physics', in M. E. Omelyanovsky (ed), *Lenin and Modern Natural Science* ; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, "দার্শনিক লেনিন", দশম অধ্যায়।

(Condillac), ফয়েরবাখ্ প্রমুখেরা সংবেদনকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস মনে করে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকেও লেনিন গ্রহণ করেননি। লেনিন দেখিয়েছেন যে, জ্ঞানপ্রক্রিয়া দু'টি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরে, সংবেদনের মাধ্যমে বস্তুজগৎ সম্পর্কে ব্যক্তি সচেতন হয়; দ্বিতীয় স্তরে, বিভিন্ন অভিধা (Concept) চয়নের মাধ্যমে ব্যক্তি বস্তুজগৎ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণায় উপনীত হয়, এবং এই প্রক্রিয়াটি হল ব্যক্তির চেতনার জগতে বস্তুজগতের সক্রিয় প্রতিফলনের সফল পরিণতি।

লেনিনবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর দার্শনিক রচনাগুলির অবদান ও তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর, কারণ লেনিনের কাছে দর্শন বিপ্লব নিরপেক্ষ কোন বিমূর্ত বিষয় ছিল না। তাঁর রাজনৈতিক রচনাগুলির মধ্যে তিনি যেমন ক্ষয়িষ্ণু এক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদসাধনের পদ্ধতিগত দিকগুলি বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁর দার্শনিক রচনাগুলির মাধ্যমেও লেনিন তাঁর প্রতিপক্ষকে এই উদ্দেশ্য নিয়েই মোকাবিলা করেছেন। দর্শনের জগতে লেনিনের বিরোধীরা অর্থাৎ, নারদনিক, প্রত্যক্ষ বিচারবাদী প্রমুখেরা সকলেই ছিলেন মার্কসবাদের বিরোধী। দর্শনের জগতের সংগ্রামে লেনিনের প্রতিপক্ষ শক্তিগুলি পুরনো ব্যবস্থাকেই খানিকটা নতুন আকৃতি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন ও সে কারণেই লেনিনের দার্শনিক রচনাবলী কোন অর্থেই রাজনীতি নিরপেক্ষ ছিল না। লেনিনবাদের বিকাশের বৈপ্লবিক তাৎপর্যকে উপলব্ধি করার জন্য তাই লেনিনের রাজনৈতিক ও দার্শনিক উভয় সংগ্রামের যোগসূত্রটি অনুধাবন করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

॥ ৪ ॥

লেনিনবাদের তাৎপর্য সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য

লেনিনবাদের গুরুত্বকে পশ্চিমী তাত্ত্বিকরাও আজ আর অস্বীকার করতে পারেন না। লেনিনবাদের বিকাশের ধারাটিকে বিশ্লেষণ করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, লেনিনবাদ ও মার্কসবাদ পরস্পরবিরোধী ত নয়ই, বরং একটি অপরটির পরিপূরক। বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদী দুনিয়ার ঘনায়মান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন ধনতন্ত্রের যে বিশ্লেষণ করেছিলেন, তার তাৎপর্য যুগপৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। মার্কস Capital-এ পুঁজিবাদের

অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের মূল কারণটির যে বিশ্লেষণ করেছিলেন, লেনিন তারই সার্থক প্রয়োগ ও বিকাশ ঘটান। পরবর্তীকালে ১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত Imperialism গ্রন্থে পুঁজিবাদের একচেটিয়া পুঁজিতে ও সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরের প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করেন লেনিন দেখান যে, সাম্রাজ্য-বাদই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ। রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, মার্কস-এঙ্গেলস বিশ্লেষিত সমাজবিপ্লবের মূল সূত্রটির সার্থক বিকাশ লেনিন ঘটিয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রাশিয়াতে সুসম্পন্ন করে। মার্কস-এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণাটুকু দিতে পেরেছিলেন; লেনিন তার প্রায়োগিক ব্যাখ্যা করেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করে। একইভাবে বলা যায় যে, মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের জীবদ্দশায় প্রলেতারীয় বিপ্লবের নিয়ামক শক্তি রূপে কমিউনিস্ট পার্টিকে চিহ্নিত করলেও লেনিনই কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন ও রণকৌশল সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির মূল সূত্রগুলিকে প্রতিষ্ঠা করেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পটভূমিকায়। সর্বোপরি, মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের চিন্তায় দলানুগামীতার (Partisanship) নীতিকে বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে, সমাজজীবনে কোন কিছুই নিরপেক্ষ নয়, কারণ শ্রেণীসংগ্রাম নিরপেক্ষ সমাজ বা ব্যক্তির অস্তিত্ব বাস্তবে সম্ভব নয়। সমাজে কোন কিছুই শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়,—দলানুগামীতার এই নীতিকে লেনিন দর্শন ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লেনিনবাদের দৃষ্টিতে দর্শনের ক্ষেত্রে ভাববাদ ও বস্তুবাদের মাঝামাঝি নিরপেক্ষ কোন অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব নয়; আবার কোন দার্শনিক তত্ত্বই শেষ বিচারে শ্রেণীসংগ্রাম নিরপেক্ষ নয়; বরং যে কোন দার্শনিক তত্ত্বই শ্রেণীসংগ্রামে বিবদমান কোন এক পক্ষের হাতের অস্ত্র। লেনিনের এই দৃষ্টিভঙ্গী রাজনীতি ও দর্শনের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছিল।

লেনিনবাদ সম্পর্কে এ কথা অনেক সময়েই বলা হয়ে থাকে যে, এই রাজনৈতিক দর্শন শুধুমাত্র রাশিয়া ও তথাকথিত পশ্চাদপদ দেশগুলির পক্ষেই প্রযোজ্য। পশ্চিমী তাত্ত্বিকদের মধ্যে আর. ব্ল্যাকি (R. Blackey), সি. টি. পেইন্টন্ (C. T. Paynton), এইচ্. ওয়েবার (H. Weber) প্রমুখেরা এই মতের পৃষ্ঠপোষক। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলেই এই মতের অসারতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ, অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে রাশিয়াকে তথাকথিত "অনুন্নত দেশ" বলে অভিহিত করা ভুল হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত

পূর্বে রাশিয়ার স্থান ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে ছিল চতুর্থ ও সামগ্রিক শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে স্থান ছিল পঞ্চম। তাই রাশিয়াকে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয়তঃ, লেনিন যেমন অবশ্যই পিছিয়ে পড়া দেশগুলির সমস্যা ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনই তাঁর বিশ্লেষণ ও গবেষণার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল ধনবাদী ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাই লেনিনবাদ নিছক একটি রুশ প্রপঞ্চ (phenomenon),—এই ধারণাটি সম্পূর্ণই অবাস্তব।

১৮৭৭ সালে মার্কস ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে রাশিয়া বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত; ১৮৮২·সালে এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র রুশ সংস্করণে লেখেন যে ইউরোপে সে সময়ে রাশিয়া ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোভাগে। ১৮৮৫ সালে এঙ্গেলস ঘোষণা করলেন যে রাশিয়া তার ১৭৮৯ সালের (অর্থাৎ, ফরাসী বিপ্লব) দিকে অগ্রসর হচ্ছে ও রাশিয়াতে বিপ্লব আসন্নপ্রায়। অক্টোবর বিপ্লব ছিল সামগ্রিকভাবে এই প্রক্রিয়ারই ফলশ্রুতি। তাই অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য যেমন আন্তর্জাতিক, লেনিনবাদের শিক্ষা ও প্রেক্ষাপটও তেমনভাবেই মার্কসবাদের বিকাশ ও প্রয়োগের সার্থকতম রূপ।

অষ্টম অধ্যায়

রাষ্ট্র, বিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণার পার্টি প্রসঙ্গে লেনিনবাদী তত্ত্ব

উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কস-এঙ্গেলস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অক্টোবর বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন বিংশ শতাব্দীতে তার প্রায়োগিক বিকাশ ঘটান। একাধিক ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য: (ক) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংক্রান্ত তত্ত্ব; (খ) প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তত্ত্ব; (গ) শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গঠন ও তার চরিত্র সংক্রান্ত তত্ত্ব।

॥ ১ ॥

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রসঙ্গে লেনিনের তত্ত্ব

অক্টোবর বিপ্লবের প্রধান তাত্ত্বিক ও নেতারূপে লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে তত্ত্ব সৃষ্টি করেন, তার তিনটি দিক বিশেষভাবে বিচার্য: (ক) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত শর্তাবলী; (খ) সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবে শান্তিপূর্ণ ও হিংসাত্মক পথের প্রশ্ন; (গ) গণতান্ত্রিক বিপ্লবেব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ ও উভয়ের অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র।

(ক) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত শর্তাবলী

মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের জীবদ্দশায় ধনতন্ত্রের বিকল্পরূপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ও অনিবার্যতার কথা ঘোষণা করে-ছিলেন। তাঁদের এই ধারণার তাৎপর্য এখানেই যে, তাঁরা শুধুমাত্র ধনতন্ত্রের চারিত্রিক বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত হননি। পুঁজিবাদের ধ্বংস যে অনিবার্য ও প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে যে পুঁজিবাদের অবসান হবে তার তত্ত্বগত ধারণাও মার্কস-এঙ্গেলসের রচনার মধ্যে প্রথম পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁরা যেহেতু কল্পনাবিলাসী বিপ্লবী ছিলেন না, বিপ্লব

সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কোন ধরনের আবেগধর্মী রোমান্টিক চিন্তাপ্রসূত ছিল না। সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, মার্কস-এঙ্গেলস উনবিংশ শতাব্দীর যে পর্বে এই তত্ত্বের আলোচনা করেছিলেন, সেই সময়ে সমাজতন্ত্রের আদর্শ সম্পর্কে প্রলেতারিয়েতের ধারণা ছিল খুবই অমুন্নত স্তরের এবং শ্রমিক আন্দোলনও ছিল যথেষ্ট অপরিণত। সর্বোপরি তাঁদের জীবদ্দশাতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কোন অভিজ্ঞতা মার্কস-এঙ্গেলসের পক্ষে ঐতিহাসিক কারণেই সম্ভবপর ছিল না। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তাঁরা ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত প্রশ্নের আলোচনা কবেছিলেন, যদিও বিষয়গত প্রশ্নটির বিশ্লেষণের ওপরে তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন অপেক্ষাকৃত বেশী। কোন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদের অবলুপ্তি সম্ভব,—পুঁজিবাদী সমাজের বিশ্লেষণে ব্যাপৃত মার্কস-এঙ্গেলসের কাছে এটিই ছিল মূল প্রশ্ন। তাই প্রলেতারীয় বিপ্লবের পক্ষে সহায়ক হতে পারে কোন বাস্তব অবস্থা, সেই আলোচনাটি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। যেহেতু তাঁরা পুঁজিবাদের উদ্ভব, বিকাশ ও অবলুপ্তির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেই প্রধানতঃ নিয়োজিত ছিলেন, সেহেতু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব প্রসঙ্গে কোন প্রায়োগিক বিশ্লেষণ তাঁদের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না।

১৮৪৪ সালেই তরুণ মার্কস লেখেন যে, বিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র আসতে পারে না। পরবর্তীকালে German Ideology-তে মার্কস-এঙ্গেলস ঘোষণা করলেন যে, শাসক শ্রেণীকে উচ্ছেদ কবার জন্য প্রয়োজন হল বিপ্লব, কারণ উচ্ছেদকারী শ্রেণী (অর্থাৎ, প্রলেতারিয়েত) একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই শতাব্দীর পুঞ্জীভূত শোষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারে। তার পরে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো', 'ক্যাপিটাল' প্রভৃতি রচনায় মার্কস-এঙ্গেলস প্রলেতারীয় বিপ্লবের অনিবার্যতার ঐতিহাসিক কারণ ব্যাখ্যা করেন,—যে বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল সূত্রের সঙ্গে গ্রথিত। মার্কস-এঙ্গেলস পুঁজিপতি ও শ্রমিকের অসম দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, এই সংঘাত নিরসনের জন্য ঐতিহাসিক প্রয়োজন দেখা দেয় প্রলেতারীয় বিপ্লবের, যার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করে গোটা সমাজব্যবস্থাকে চিরকালের জন্য

শোষণমুক্ত করে। এক কথায়, প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি। সুতরাং মার্কস-এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে দেখেছিলেন পুঁজিবাদী সমাজের সংকটের এক নির্দিষ্ট পরিণতি রূপে, অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত শর্তটি তখনই উপস্থিত যখন পুঁজিবাদ গভীর সংকটে নিমজ্জিত হয়। এই কারণে তাঁরা বিপ্লবের নামে হঠকারিতার তীব্র সমালোচক ছিলেন। তাঁরা স্পষ্টই বলেছিলেন যে, বাস্তব পরিস্থিতি বিচার না করে, বিষয়গত শর্তগুলিকে উপেক্ষা করে বিপ্লব করার চেষ্টা সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ১৮৫০ সালে 'কমিউনিস্ট লীগ'-এর মধ্যে সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট এক গোষ্ঠীর দুই নেতা যখন অপরিণত অবস্থাতেও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহ্বান জানিয়েছিলেন, মার্কস ও এঙ্গেলেস তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

মার্কস-এঙ্গেলসের রচনায় বিষয়গত শর্তটির বিশ্লেষণ যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। এই ধারণা থেকে যদি মনে হয় যে, তার অর্থ হল, বিষয়গত পরিস্থিতি পরিণত রূপ লাভ করলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুষ্ঠিত হবে, তবে সেটি হবে একটি সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা। বিষয়গত শর্তের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস কখনই তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পর্ককে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেননি। বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বিষয়ীগত দিকটি সম্পর্কেও তাঁরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁরা এ কথাই বলেছিলেন যে, পুঁজিবাদের সংকটের ফলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব স্বতস্ফূর্তভাবে কখনই সংঘটিত হয় না। পুঁজিবাদেব গভীরতম সংকটেও প্রলেতারীয় বিপ্লবেব বাস্তবায়ন সম্ভব নয় যদি না সচেতনভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে সেই বিপ্লবে সঠিক পথে পরিচালিত করা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মার্কস প্রথম আন্তর্জাতিকেব একটি সভায় বলেছিলেন যে, অত্যন্ত অনুকূল রাজনৈক পরিস্থিতিতেও প্রলেতারিয়েতের সাফল্য নির্ভর করবে এমন একটি সংগঠনের ওপরে যেটি প্রলেতারিয়েতের শক্তিকে সংঘবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ১৮৮৭ সালে এঙ্গেলস লেখেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর চূড়ান্ত সাফল্য শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে একটি শ্রেণী সচেতন, স্বতন্ত্র ধরনের বিপ্লবী পার্টি প্রতিষ্ঠার ওপরে।

লেনিন অক্টোবর বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নটির আরও সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ করেন। যেহেতু লেনিনকে একটি কঠোর বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে এই প্রশ্নের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণের সম্মুখীন হতে

হয়েছিল, সেহেতু মার্কস-এঙ্গেলস কৃত ব্যাখ্যাতে তাঁর পক্ষে গভীর, সৃষ্টিশীল সংযোজন করা সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, অক্টোবর বিপ্লব যেহেতু পরিচালিত হয়েছিল লেনিন নির্দেশিত বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বাধীনে, সেহেতু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়ীগত দিকটির বিশ্লেষণ লেনিনের রচনায় একটি মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। এর ভিত্তিতে আজকের দিনের একাধিক তাত্ত্বিক এই মত পোষণ করেন যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নে লেনিন ও মার্কস-এঙ্গেলসের মত পরস্পরবিরোধী। আলফ্রেড মেয়ার (Alfred Meyer), আর. ভি. ড্যানিয়েল্‌স (R. V. Daniels), জন কীপ্‌ (John Keep), এ. পীট্রে (A. Piettre) প্রমুখ পশ্চিমী তাত্ত্বিকদের মতে, মার্কস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আলোচনায় মূলতঃ বিষয়গত প্রশ্নটিকেই উত্থাপন করেছিলেন। লেনিন বিষয়ীগত উপাদানটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ও পার্টির নেতৃস্থানীয় ভূমিকাকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থাপন করে বিষয়গত দিকটিকে উপেক্ষা করেছেন। এঁদের মত হল যে, ক্ল্যাসিকাল মার্কসবাদ প্রলেতারীয় বিপ্লবকে বিচার করে এক ঐতিহাসিক অনিবার্যতার (historical necessity) পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঐতিহাসিক নিয়তিবাদের দ্বারা পরিচালিত একটি বিষয়গত পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মাত্র। এঁদের ধারণা অনুযায়ী লেনিন এই নিয়তিবাদকে উপেক্ষা করে বিপ্লবকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন বিষয়ীগত উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে। অতএব, এই যুক্তি অনুসারে মার্কস ছিলেন নিয়তিবাদী ; অপরপক্ষে লেনিন ছিলেন স্বচালনবাদী (voluntarist) ও সেই অর্থে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রসঙ্গে লেনিনের ব্যাখ্যা মার্কসবাদের বিকৃতি মাত্র।

এই জাতীয় তত্ত্বের যৌক্তিকতা যে কতখানি অসার সেটি দু'টি যুক্তির দিকে দৃষ্টি দিলেই বোধগম্য হবে।[1] প্রথমতঃ, এই তাত্ত্বিকদের কাছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত শর্ত দু'টির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতটি একেবারেই দুর্বোধ্য। এঁদের চোখে প্রলেতারীর বিপ্লবের হয় একটি বিষয়গত নতুবা একটি বিষয়ীগত প্রেক্ষাপট আছে ও দু'টি প্রেক্ষাপট তাঁদের কাছে পরস্পরবিরোধী। অপরদিকে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার

1. এই তত্ত্বগুলির বিস্তৃত আলোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য Yuri Krasin, *The Sociology of Revolution : A Marxist View*, Chapter 5 এবং Yuri Krasin, *The Dialectics of Revolutionary Process*, Chapter 2.

করলে দেখা যায় যে, দু'টি উপাদানই এক সূত্রে গ্রথিত। মার্কসবাদ কখনই দু'টি উপাদানকে পরস্পরনিরপেক্ষ বলে মনে করে না। বিষয়গত পরিস্থিতির উদ্ভবের ফলেই বিষয়ীগত উপাদানগুলির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়; আবার বিষয়ীগত উপাদানগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠার ফলেই বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে বিষয়গত পরিস্থিতি তার চরম পরিণতিতে পৌছয়। দ্বিতীয়তঃ, মার্কস-এঙ্গেলসের মত লেনিনও এককভাবে বিষয়গত বা বিষয়ীগত শর্তগুলির আলোচনা করেননি। বিষয়ীগত উপাদানগুলি সম্পর্কে লেনিনের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতটি ছিল সমকালীন রাশিয়ার ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিষয়গত বিশ্লেষণ। সেই অর্থে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রসঙ্গে লেনিনের তত্ত্ব ছিল মার্কস-এঙ্গেলসের আলোচনায় একটি সৃষ্টিশীল সংযোজন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ব্যাখ্যায় বিষয়গত ও বিষয়ীগত উপাদানের বিশ্লেষণে লেনিনের অবদানকে বিচার করা প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত শর্তগুলিকে লেনিনের আলোচনা অনুযায়ী প্রধানতঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, লেনিন প্রলেতারীয় বিপ্লবকে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। লেনিন তাঁর Imperialism (১৯১৬), The Impending Catastrophe and How to combat it (১৯১৭) প্রভৃতি রচনায় বিশ্লেষণ করে দেখান যে, একচেটিয়া পুঁজির আবির্ভাবের ফলে ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্রশক্তি ও একচেটিয়া পুঁজির প্রত্যক্ষ মিলনের ফলে পুঁজিবাদ তাব চরম সংকটের পর্যায়ে এসে পৌছেছে ও সেই অবস্থা থেকে সরাসরি সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। লেনিন দেখান যে, একচেটিয়া পুঁজির প্রতিষ্ঠা ও দ্রুতগতিতে তার আকার বৃদ্ধির ফলে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে উপাদানব্যবস্থার সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের সংঘাত অর্থনৈতিক সঙ্কটকে তীব্র করে তোলে, কারণ রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায় পুঁজিপতিরা আকাশচুম্বী মুনাফা অর্জনে ব্রতী হয় ও তার পরিণতিতে রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। সেই সঙ্গে লেনিন আরও বলেন যে, একচেটিয়া পুঁজিপতিরা মুনাফার নেশায় নিজেদের মধ্যে ঘোর অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, যার ফলে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে কলহ ও দ্বন্দ্বও এক চরম পর্যায়ে পৌছয়। এভাবে একদিকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার নিজস্ব দ্বন্দ্ব ও অপরদিকে পুঁজি-

বাদী দুনিয়ার অন্তর্দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত ভিত্তি রচনা করে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম বিষয়গত শর্তরূপে লেনিন একটি উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর The Collapse of the Second International (১৯১৫), Left-Wing Communism—An Infantile Disorder (১৯২০) প্রভৃতি রচনায় লেনিন বিপ্লবী পরিস্থিতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করেন। এগুলি হল: (ক) শাসক শ্রেণীর পক্ষে যখন আর পুরনো কায়দায় শাসন চালান সম্ভব হয় না, অর্থাৎ শোষিত মানুষের অসন্তোষ ও বিক্ষোভের তীব্রতায় শাসক শ্রেণী যখন তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে বিপন্ন বোধ করে ও তার ফলে যখন সমাজের "উচ্চবিত্ত শ্রেণীদের" (upper class) সঙ্কট দেখা দেয়; (খ) যখন শোষিত শ্রেণীর বঞ্চনা ও যন্ত্রণাবোধ এক চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে; (গ) এর পরিণতিতে শোষিত শ্রেণী যখন নিজের মুক্তির জন্য এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত হয়।

লেনিনের কাছে বিষয়গত শর্তাবলীর এই দু'টি প্রধান উপাদানই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পরস্পব গভীবভাবে সম্পৃক্ত। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম প্রধান শর্ত অবশ্যই পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকট। কিন্তু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংকট বিষয়গত পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেয় না। প্রলেতারীয় বিপ্লবের পক্ষে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকট তখনই সহায়ক হয় যদি তা যথার্থ রাজনৈতিক সংকটের মাধ্যমে সার্থক রূপ নেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেনিন রুশ বিপ্লবের বিভিন্ন পর্বকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। লেনিনের দৃষ্টিতে অক্টোবর বিপ্লব সংঘটিত হবার পিছনে যে বিষয়গত পরিস্থিতি কাজ করেছিল তার একটি দিক হল রুশ অর্থনীতির গভীর সংকট; অপর দিকটি হল অসংখ্য সংগ্রামের মাধ্যমে এই সংকটের রাজনৈতিক স্তরে আত্মপ্রকাশ। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল একের পর এক ধর্মঘট, সরকার ও জনতার মধ্যে একাধিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, জার সরকারের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকট প্রভৃতি।

বিষয়গত শর্তগুলির আলোচনার পাশাপাশি লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম প্রধান শর্তরূপে বিষয়ীগত উপাদানগুলির বিশ্লেষণের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। লেনিনের বক্তব্য অনুযায়ী এই শর্তগুলি

হল : (ক) শ্রমজীবী মানুষের চিন্তায় বৈপ্লবিক চেতনার উপস্থিতি ; (খ) সংগঠিত গণশক্তির বিকাশ, যার ফলে জনগণের পক্ষে সমস্ত শক্তি নিয়ে বিপ্লবে সামিল হওয়া সম্ভব ; (গ) জনগণের সংগ্রামকে পরিচালনা করার জন্য একটি বিপ্লবী পার্টির উপস্থিতি, যে সঠিক রণকৌশল রচনা করে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রয়োজনে যথার্থ রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। রুশ বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ে লেনিন যে জঙ্গী মনোভাবাপন্ন বলশেভিক পার্টি গঠনের প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা এই চিন্তারই ফলশ্রুতি। বিপ্লবের পক্ষে বিষয়গত পরিস্থিতি যথেষ্ট অনুকূল হলেও বল-শেভিক পার্টির সংগ্রামী ও সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া অক্টোবর বিপ্লব যে সাফল্য-মণ্ডিত হতে পারত না, এ কথা আজ অনস্বীকার্য।

লেনিনের কাছে বিষয়গত ও বিষয়ীগত শর্তগুলি ছিল দ্বান্দ্বিক ঐক্যে গ্রথিত। বিষয়ীগত প্রশ্নটি লেনিনকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হয়েছিল কারণ, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক নেতারা মার্কস বর্ণিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটি যান্ত্রিক ও সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন। তাঁরা প্রচার করেছিলেন যে, মার্কস-এঙ্গেলস শুধুমাত্র বিষয়গত পরিস্থিতির পরিণতি লাভকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একমাত্র শর্ত-রূপে চিহ্নিত করেছেন। কাউট্‌সকি (Kautsky) প্রমুখেরা এই বক্তব্যের জের টেনে মত দিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পার্টির প্রত্যক্ষ নেতৃত্বের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্ট হলে বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অনুষ্ঠিত হবে। এই জাতীয় তত্ত্ব যে মার্কস-এঙ্গেলসের বিপ্লবী চিন্তার সম্পূর্ণ বিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে চূড়ান্ত ক্ষতি-কারক, সেটিকে বোঝাবার জন্য লেনিনকে আরও বেশী করে বিষয়ীগত প্রশ্নটিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করতে হয়েছিল। অপরদিকে বিষয়ীবাদিতার (Subjectivism) নামে বিষয়গত পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আহ্বান জানানর হঠকারিতার দিকটি সম্পর্কেও লেনিন গভীরভাবে সচেতন ছিলেন।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়গত ও বিষয়ীগত উপাদানের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য প্রয়োজন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টিতে এই দুই উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক কখনই এমন নয় যে, বিষয়গত উপাদানই হল মুখ্য ও বিষয়ীগত উপাদানটি গৌণ বা বিষয়গত উপাদানই

বিষয়ীগত উপাদানকে স্থির করে দেয়। বিষয়গত পরিস্থিতি অবশ্যই বিষয়ীগত শর্তগুলির উৎসারণে প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে বিষয়ীগত উপাদানের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য সব সময়েই থাকতে পারে। কনস্তানতিন জারোদভ্ (Konstantin Zarodov) সঠিকভাবেই ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, বিষয়গত পরিস্থিতি বিপ্লবের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত নির্ধারণ করে দেয় ঠিকই, কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিত যান্ত্রিকভাবে বিষয়ীগত উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ কবে না।[2] যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এমন একাধিক ঘটনার উল্লেখ করা যায় যেখানে দেখা গেছে যে, আকস্মিকভাবে বিষয়ীগত উপাদান এমন একটি রূপে আত্মপ্রকাশ কবেছে যে শেষ পযন্ত বিপ্লবের দিক নির্দেশে সেটিই নিযামক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যেমন, সম্প্রতি ইথিওপিয়াতে বাজতন্ত্র থেকে বিপ্লবী গণতন্ত্রে উত্তবণে ইথিওপীয় সেনাবাহিনীব বিপ্লবী অংশের সক্রিয় ভূমিকা ছিল অন্যতম প্রধান শর্ত, যদিও বিষয়গতভাবে ইথিওপিয়াতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট ধীর গতিতে ঘনীভূত হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে বিপবের আকস্মিক উৎসারণেব সঙ্গে বিষয়গত পবিস্থিতিব সবাসবি ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন কবা কঠিন। আবাব এও দেখা গেছে যে, বিপ্লব প্রায আসন্ন হয়েও আকস্মিক কোন বিষয়ীগত ঘটনাব ফলে বিপ্লবী আন্দোলন সেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পবে গ্রীসে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হতে পারল না ব্রিটিশ ও মার্কিন সেনাবাহিনীব সেখানে সবাসবি হস্তক্ষেপেব ফলে। পববর্তীকালে মধ্য আমেবিকাতে গুয়াতেমালা ও ডমিনিকান বিপাব্লিক যখন পবিবর্তনেব মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন মার্কিন সেনাবাহিনীর বেআইনী হস্তক্ষেপে তা পর্যুদস্ত হয়ে যায়।

(খ) হিংসা ও শান্তিপূর্ণ পথের প্রশ্ন

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যেহেতু জীবন নিবপেক্ষ বা বাস্তব নিরপেক্ষ কোন দর্শন নয়, সেহেতু বিপ্লব কোন্ পথে ও কিভাবে অগ্রসব হবে, তার কোন বাঁধাধরা বা যান্ত্রিক ফবমূলা মার্কসবাদে পাওয়া যাবে না। বিপ্লবের রূপ অহিংস হবে কি সহিংস হবে, তার ব্যাপকতাই বা হবে কি ধরনের, অহিংস ও সহিংস

2 K. Zarodov, *Leninism and Contemporary Problems of the Transition from Capitalism to Socialism*, পৃঃ ১১৮-১২৯।

এই দুই পথের মিশ্রণ কোন সময়ে ঘটতে পারে কিনা, এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে কোন ধরাবাঁধা ধারণায় খোঁজ করা এক অর্থহীন প্রয়াস মাত্র। বিপ্লবের পথ প্রসঙ্গে লেনিন খুব স্পষ্টভাবেই দু'টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কোন একটি নির্দিষ্ট পথে সম্পন্ন হবে এমন কথা মার্কসবাদ বলে না; বরং মার্কসবাদ কোন পন্থাই বরবাদ করে না। দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লব কোন্ পথে,—এই প্রশ্নটিকে মার্কসবাদ যাচাই করে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। বিপ্লব কোন্ পথে চালিত হবে, তা নির্ভর করে ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সমাজেব অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশের স্তরের ওপরে। এক কথায়, বাস্তব পরিস্থিতির নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ ছাড়া বিপ্লবের পথ প্রসঙ্গে কোন একটি পন্থার প্রস্তাব করা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব ব্যাপার।

বিপ্লবের পথের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে, শ্রমিকশ্রেণী স্বেচ্ছায় কখনই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চায় না, কারণ মার্কসবাদী দর্শনে বিপ্লব ও হিংসা সমার্থক নয়। শ্রমিকশ্রেণীব দৃষ্টিভঙ্গীতে শোষণের শৃঙ্খল মোচন করে জনগণের প্রকৃত শাসন কায়েম করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ার নামই হল বিপ্লব। মার্কসবাদী চিন্তায় বিপ্লবের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ বা ভীতিপ্রদর্শনের কোন সম্পর্ক নেই, কারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুষ্টিমেয় কিছু আদর্শবাদী বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাধ্যমে শাসকশ্রেণীকে সাময়িকভাবে আতংকিত করতে পাবে মাত্র; কিন্তু তার মাধ্যমে শোষকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করা যায় না। গণআন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ফলে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে নিপীড়িত মানুষেবও অচিরেই মোহভঙ্গ হয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেব অর্থ পুঁজিবাদী শোষণেব বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সঠিক রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশ, যা বাস্তব রূপ নেয় এক বিস্ফোরণের মধ্যে; এই বিস্ফোরণ একদিকে যেমন ধাবিত হয় পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে, অপরদিকে এটি পরিচালিত হয় শোষণ ও অত্যাচারের, বন্ধনকে ছিন্ন করে একটি সুন্দর, নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার কাজে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তাই শুধু একটি ধ্বংসাত্মক ঘটনা নয়; নিপীড়িত মানুষের সৃষ্টিশীল শ্রমেরও এটি এক অভিব্যক্তি। সে কারণেই শ্রমিকশ্রেণী কখনই বিনা প্রয়োজনে রক্তপাত ঘটাতে চায় না; রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে শ্রমিকের আত্মোৎসর্গ বিপ্লবোত্তর পর্বে সমাজতন্ত্র গঠনের পক্ষে

অপূরণীয় ক্ষতি করে। সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা দেয় যে শ্রমিক, তার আত্মদান, বা দেশের সম্পদ উৎপাদিত হয় যাদের মাধ্যমে, সেই শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লব সম্পন্ন হবার পূর্বেই আত্মাহুতি সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজে খুব বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। শোষকশ্রেণী মাত্রেই তাই সর্বতোভাবে প্রয়াসী হয় মেহনতী মানুষকে রক্তাক্ত সংঘর্ষে নিয়োজিত করতে, কারণ বলপ্রয়োগ করার রাষ্ট্রক্ষমতা থাকে শোষক শ্রেণীর হাতে। তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দেয় যে রাজনৈতিক পার্টি তার দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার ওপরে। বিনা প্ররোচনায় রক্তাক্ত সংঘর্ষের পথে শ্রমিকশ্রেণী যাতে পা না বাড়ায় তার ওপরে দৃষ্টি রাখা, রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হলে শ্রমিকশ্রেণী অস্ত্র ধরতে সক্ষম ও প্রস্তুত কি না,—এই বাস্তব প্রশ্নগুলির বিশ্লেষণের ওপরে নির্ভর করে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ কোন পথে হবে।

এই ব্যাখ্যা থেকেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমতঃ, বাস্তব পরিস্থিতি, অর্থাৎ শোষক শ্রেণীর নীতিই শোষিত মানুষকে অস্ত্র ধরতে বাধ্য করে, কারণ শোষকের সহিংস উৎপীড়নকে সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়া দমন করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, খুব স্বাভাবিক কারণেই তাই শ্রমিকশ্রেণী তার নিজস্ব স্বার্থে, সমাজতন্ত্র গঠনের স্বার্থে চায় ন্যূনতম রক্তপাতে ও দ্রুততম উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে। সাম্যবাদ যেহেতু মানবতাবাদেরই বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি, সেহেতু শ্রমিকশ্রেণী রক্তপিপাসু এ কথা মনে করা অসমীচীন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সশস্ত্র সংগ্রামেব পথে পরিচালিত হলেও সাম্যবাদের মানবতাবাদী চরিত্রের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ বলেই শ্রমিকশ্রেণী নিছক রক্তের নেশায় উন্মত্ত হয়ে সেই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে না। এই কারণেই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে, সমাজতন্ত্রের স্বার্থে, সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম পরিহার করার মত বাস্তব পরিস্থিতি যদি দেখা দেয়, তবে নীতিগতভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অবশ্যই তাকে স্বাগত জানায়। মার্কস বলেছেন যে, সশস্ত্র অভ্যুত্থান হবে উন্মাদের মতই আচরণ যদি দেখা যায় যে শান্তিপূর্ণ পথে সে কাজ ত্বরান্বিত হতে পারে। লেনিন বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন যে, শ্রমিকশ্রেণী শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নকে স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর গুরুত্ব দেবে। রাশিয়াতে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে লেনিন একাধিকবার এই সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখেন। প্রথমবার এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় মার্চ-জুলাই মাসে ও দ্বিতীয়বার সেপ্টেম্বর মাসে স্বল্প

সময়ের জন্য। উভয় ক্ষেত্রেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল রাশিয়াতে 'দ্বৈত ক্ষমতা' প্রতিষ্ঠিত হবার পরিপ্রেক্ষিতে, যখন শ্রমিক কৃষকের সোভিয়েতগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠার ফলে তারাই ক্রমশঃ প্রকৃত ক্ষমতার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যখন 'অস্থায়ী সরকার' তার নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ার ফলে ঐতিহাসিকভাবে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যে সরাসরি সংঘর্ষের পথে না গিয়ে প্রলেতারিয়েতের কাছে অস্থায়ী সরকারকে অপসারণ ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের এক অভূতপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। এই অবস্থায়, লেনিন যাকে 'ইতিহাসের এক বিরল মুহূর্ত', বলে বর্ণনা করেছেন, শাসকশ্রেণীকে রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধের পথ পরিহার করে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করার সম্ভাবনাকে তিনি বিবেচনা করেছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তব রূপ নেয়নি। ১৯৪৮ সালে যুদ্ধোত্তর চেকোশ্লোভাকিয়াতে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে এককভাবে বুর্জোয়া সরকার গঠনের চেষ্টা করলে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে গোটা দেশে যে ব্যাপক গণবিক্ষোভ ও সশস্ত্র শ্রমিক ব্রিগেডকে মোতায়েন করা হয়, তার পরিণতিতে সরকার বাধ্য হয় কমিউনিস্ট ও শ্রমিক-কৃষকদের প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হবার সুযোগ দিতে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে স্তালিন সম্পর্কে এক ধরনের অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, তিনি নাকি শান্তিপূর্ণ পথের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। সাম্প্রতিককালের গবেষণায় এই এই তথ্য যে ভুল তা প্রমাণিত হয়েছে।[3] ১৯৪৬ সালে চেকোশ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে ক্লেমেন্ট্ গট্ভাল্ড্ (Klement Gottwald) বলেছিলেন যে, যুদ্ধোত্তর পর্বে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে শ্রমিক-শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকতর সচেতনতা ও সমর্থনের ফলস্বরূপ স্তালিন এই অঞ্চলগুলিতে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাটি গভীরভাবে বিবেচনা করেছিলেন।

কিন্তু শান্তিপূর্ণ পথ বলতে কখনই সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ বোঝায় না। শান্তিপূর্ণ পথ বলতে শুধুমাত্র সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান, গেরিলা যুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধ জাতীয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অনুপস্থিতিকে বোঝায়। শান্তিপূর্ণ পথের সম্ভাবনা সে সব দেশেই সম্ভব যেখানে উদারনীতিবাদকে কেন্দ্র করে শাসকশ্রেণীর

3. ঐ, পৃঃ ১৭৫-১৭৬, বিশেষতঃ পাদটীকা ৫।

সামগ্রিক রাজনীতি আবর্তিত হয় বা যে পরিস্থিতিতে শাসকশ্রেণী বিশেষ মুহূর্তে বাষ্ট্রশক্তির ওপরে নিয়ন্ত্রণভার হারিয়ে ফেলে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই লেনিন 'ডুমা'তে শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণেব কথা বলেছিলেন, কাবণ এই পদক্ষেপ রুশ বিপ্লবেব বিশেষ এক একটি পর্বে শ্রমিক স্বার্থের বা বিপ্লবের পরিপন্থী ছিল না। শান্তিপূর্ণ পথ গৃহযুদ্ধের পথ নয় ঠিকই ; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এই পথ শ্রেণীসংগ্রাম নিবপেক্ষ। বরং এমন ঘটনা অবশ্যই ঘটতে পাবে যখন শান্তিপূর্ণ পথেব সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়ে প্রলেতারিয়েতকে সশস্ত্র শ্রেণীসংগ্রামের পথে নামতে হয়, যেমনটি ঘটেছিল বাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লবেব সময়ে। এই প্রসঙ্গে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গে মার্কসেব উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[4] মার্কস বলেছিলেন যে, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণী শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতা দখল করতে পারলেও যখনই মেহনতী মানুষের স্বার্থবিরোধী দীর্ঘদিনেব প্রচলিত আইনব্যবস্থাকে বববাদ কবতে প্রয়াসী হবে, তখনই পবাজিত শ্রেণীশক্তিগুলি হিংসাব আশ্রয় নেবে তাদেব পুরনো স্বার্থকে শেষবাবের মত বক্ষা করাব জন্য। এক কথায়, শোষক শ্রেণী হিংসা ও বক্তপাতের আশ্রয় নেয় তাদের শ্রেণীস্বার্থকে বাঁচিয়ে বাখাব প্রয়োজনে। আব সে কাবণেই তখন প্রয়োজন দেখা দেয় সশস্ত্র গণ-প্রতিবোধেব। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শান্তিপূর্ণ পথের হিংসাত্মক পথে যে কোন মুহূর্তে রূপান্তরেব সম্ভাবনা তাই সব সময়ে থেকেই যায়।

হিংসাত্মক, অর্থাৎ বক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বা সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানেব মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দু'টি পবিস্থিতিতে অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ, শান্তিপূর্ণ পথে প্রলেতাবিয়েত বাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে যদি সেই সঙ্গেই শ্রেণী-শত্রুদেব পর্যুদস্ত করে নিরস্ত্র কবতে না পারে, তবে অচিবেই পবাজিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য রক্তাক্ত হিংসাব ও সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের পথ অনুসরণ করে ও যার ফলে অবিলম্বেই শান্তিপূর্ণ পথ হিংসার রূপ নেয়। এই ঘটনা ঘটেছিল চিলিতে ১৯৭৩ সালে, যখন রাষ্ট্রপতি আলেন্দেকে হত্যা করে নির্বাচনে পরাস্ত প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি সামরিক-বাহিনীর একাংশের সহযোগিতায় রাষ্ট্রযন্ত্র দখলের প্রয়াসে রক্তাক্ত প্রতি-বিপ্লবের পথ নিয়েছিল। আলেন্দে সরকারের পতনের অন্যতম কারণ ছিল শান্তিপূর্ণ পথের প্রশ্নটিকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া ও সশস্ত্র সংগ্রামের

---

4. উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৫৩।

সম্ভাবনাকে প্রায় সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, যে সব পরিস্থিতিতে শাসকশ্রেণী সামান্যতম গণতান্ত্রিক অধিকারও জনগণকে দেয় না এবং এক ভয়াবহ সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে ক্ষমতায় নিজেকে অধিষ্ঠিত রাখতে চায়, সে সব ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধ ও রক্তাক্ত সংঘর্ষ ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকে না। তার অন্যতম দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিককালে মধ্য আমেরিকার নিকারাগুয়াতে স্বৈরাচারী সোমোজাকে সশস্ত্র, রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে গদিচ্যুত করে সমাজতন্ত্রকে বাস্তবায়িত কবার উদ্দেশ্যে একটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠার ঘটনা। একইভাবে ১৯৫৯ সালে কিউবাতে বাতিস্তার ফ্যাসিস্ত সরকাবকে গেরিলা যুদ্ধেব মাধ্যমে অপসাবণ কবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সে পথেই আজ সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে মধ্য আমেরিকার ওয়াতেমালা, এল সালভাদর প্রভৃতি দেশগুলিতে।

স্বাভাবিকভাবেই হিংসাত্মক পথে ক্ষমতাদখলের প্রশ্নটি যখন শ্রমিকশ্রেণীব সামনে অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিব হিংসাশ্রয়ী দমননীতি যখন শ্রমিকশ্রেণীকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য করে, তখন সহিংস পথেব প্রশ্নটিকেও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা কবার প্রয়োজন দেখা দেয়। মার্কস-এঙ্গেলস এবং লেনিন বারে বাবেই রোমান্টিক বিপ্লবীপনার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই প্রশ্নটিকে আলোচনা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানেব আহ্বান সাফল্যমণ্ডিত না হলে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টিকে প্রতিবিপ্লবী দমননীতির নিষ্ঠুর শিকার হতে হয়; সে কারণে অপরিণত পবিস্থিতিতে এই ধরনের আহ্বান দেওয়া রাজনৈতিক হঠকারিতাব সামিল। সশস্ত্র অভ্যুত্থান বা দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সঙ্গে সামরিকবাহিনীর ভূমিকাব প্রশ্নটিও জড়িয়ে পড়ে, কারণ এই সংগ্রামে চূড়ান্ত জয়লাভ করতে হলে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী ভাবাদর্শের প্রভাব বিস্তার করার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। রাশিয়াতে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে অক্টোবব বিপ্লবের সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল বলশেভিকদের প্রতি রুশ সেনাবাহিনীর একাংশের ঘনিষ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন। তাই রাজনৈতিক ও সামরিক এই দু'টি প্রশ্নের সঠিক মীমাংসার ওপরে নির্ভর করে হিংসাত্মক পথে বিপ্লবের সাফল্য।

লেনিন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নিম্নোক্ত শর্তগুলিকে চিহ্নিত করে গেছেন। (১) সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে লঘুভাবে দেখা

উচিত নয় ; এই ধরনের অভ্যুত্থান শুরু হলে তাকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করে যেতে হবে ; (২) চরম মুহূর্তে এবং সঠিক ক্ষেত্রে সর্ব শক্তি নিয়োগ করা, নতুবা শত্রুপক্ষ তার উন্নত প্রস্তুতি ও সংগঠনের ফলে বিপ্লবী শক্তিগুলিকে পর্যুদস্ত করে দেবে ; (৩) অভ্যুত্থান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণাত্মক ভূমিকা স্থিতজ্ঞ হয়ে নিতে হবে ; এ ক্ষেত্রে রক্ষণাত্মক ভূমিকা নেয়া হবে আত্মহননের সামিল ; (৪) শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতে হবে সম্পূর্ণ আকস্মিক-ভাবে সেই মুহূর্তে যখন সে নিজে অসংগঠিত, (৫) যৎসামান্য হলেও প্রতিদিন সাফল্য অর্জনের প্রয়াস চালাতে হবে ও সেই সঙ্গে বিপ্লবী শক্তিগুলির নিজেদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হবে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টিতে শান্তিপূর্ণ ও হিংসাত্মক পথের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। আকারগত পার্থক্য থাকলেও দু'টি পথই তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। উভয় পথের যোগসূত্রটি বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রাসিন্ (Krasin) সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন[5] যে, শান্তিপূর্ণ ও হিংসাত্মক পথের মধ্যে আঙ্গিকের পার্থক্য থাকলেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পটভূমিকায় উভয়েরই কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। প্রথমতঃ, উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে সচেতনভাবে তার শক্তিকে মজুত রাখতে হবে ; সেটি কখনও রূপ নেয় প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে, কখনও বা তাদেরকে গ্রেপ্তার করে বা কখনও তাদের সাংগঠনিক কার্যকলাপকে অকেজো করে দিয়ে. দ্বিতীয়তঃ, যে পথই অনুসৃত হোক না কেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য শেষ বিচারে নির্ভর করে শ্রমিকশ্রেণীর বৃহত্তর অংশের রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হওয়ার প্রক্রিয়ার ওপরে ; তৃতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্নে যে পথই অবলম্বন করা হোক না কেন, শ্রমিকশ্রেণীর দেশব্যাপী গণজাগরণ ছাড়া সে পথে সাফল্য আসে না ; চতুর্থতঃ, তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণ সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অংশীদার না হলে কোন পথেই সাফল্য আসবে না ; পঞ্চমতঃ, উভয় পথেরই মূল লক্ষ্য হল রাষ্ট্রশক্তির চরিত্র বদল ও শোষণকারী রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসসাধন ; ষষ্ঠতঃ, যে পথই

5. **Yuri Krasin,** ***The Dialectics of Revolutionary Process,*** **পৃ: ১৩১-১৩২।**

অনুসরণ করে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সাধিত হোক না কেন, নতুন রাষ্ট্রশক্তির সাফল্য নির্ভর করবে বিপ্লবী পার্টির সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপরে।

(গ) গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ ও উভয়ের অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র।

একাধিক পশ্চিমী তাত্ত্বিক এই ধারণা পোষণ করেন যে, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র পরস্পরবিরোধী ও শ্রমিকশ্রেণীর দর্শনে গণতন্ত্রের কোন স্থান নেই। এই যুক্তির ভিত্তিতে তাই বলা হয়ে থাকে যে, শ্রমিকশ্রেণী ও তাকে পরিচালনা করে যে বিপ্লবী পার্টি উভয়ের হাতেই গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সর্বাধিক বিপন্ন। মার্কসীয় চিন্তার ইতিহাসের বিশ্লেষণ করলে কিন্তু দেখা যাবে যে, এই ধারণাটি সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন। বরং মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা এবং বিশেষ করে পরবর্তীকালে লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের গুরুত্বটি বারে বারেই তুলে ধরেছেন। গণতান্ত্রিক বিপ্লব হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম প্রধান শর্ত; সে কারণে মার্কস-এঙ্গেলস তাদের জীবদ্দশাতে সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁদের কাছে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই সার্থক পরিণতি। মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের রচনায় উভয়ের সম্পর্ককে প্রধানতঃ তিনটি স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছিলেন। পুঁজিবাদের যুগে প্রথম স্তরে বিপ্লবের লক্ষ্য হল সামন্ততন্ত্রকে খর্ব করে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা; দ্বিতীয় স্তরে বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, যা মূলতঃ উপকার সাধন করে কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্তদের। তৃতীয় স্তরে বিপ্লব সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর নিয়ামক ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

মার্কস-এঙ্গেলসের এই বিশ্লেষণ থেকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমতঃ, পুঁজিবাদীরা বিপ্লবকে সর্বসময়েই বেঁধে রাখতে চায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে, যে কারণে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বুর্জোয়া শ্রেণীর সামগ্রিক সমর্থন কখনই থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণীর সামগ্রিক সমর্থন থাকা সত্ত্বেও সেটি অচিরেই অন্তর্হিত হল যখন দেখা গেল যে, জ্যাকোবিনদের নেতৃত্বে

একটি বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রী সরকার সেখানে গঠিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই রোবেসপিয়েরের নেতৃত্বে ফ্রান্সে যে জ্যাকোবিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই ফ্রান্সের বুর্জোয়া শ্রেণী সামগ্রিকভাবে সেটিকে স্বাগত জানায়নি। তাই তাঁরা চেয়েছিলেন বিপ্লবকে প্রথম স্তরটির মধ্যেই বেঁধে রাখতে। দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরটিতে উত্তীর্ণ হবার তাৎপর্য এখানেই যে, এই স্তরেই সৃষ্টি হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীতা ও শর্তাবলী ; দ্বিতীয় স্তরে বিপ্লবের সাফল্য গণতন্ত্রকে করে তোলে প্রকৃত অর্থে গণমুখী ও সেখান থেকেই উৎসারিত হয় গণতন্ত্রকে সার্থকতম বৈপ্লবিক রূপ দেবার প্রয়াস, যেটি আত্মপ্রকাশ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে।

মার্কস-এঙ্গেলস যে যুগের পটভূমিকায় এই প্রশ্নটির বিশ্লেষণ করেছিলেন সে সময়ে এর চেয়ে বেশী কিছু বলা সম্ভব ছিল না। লেনিন এই প্রশ্নটির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে দেখান তাঁর Two Tactics of Social Democracy রচনায়। প্রথমতঃ, লেনিন দেখান যে, পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের যুগে পুঁজি-বাদ নিজের শ্রেণীস্বার্থকে কায়েম রাখার জন্য গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে হাত মেলায়, যাতে কোনক্রমেই প্রকৃত অর্থে জনগণের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাদের হাতে ক্ষমতা স্থানান্তরিত না হয়। লেনিনের বিশ্লেষণের অন্যতম ভিত্তি ছিল রুশ বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা। রাশিয়াতে পুঁজিবাদের বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জারতন্ত্রের সঙ্গে আপস করে জন-গণকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ক্ষমতা ভোগ করতে না দেয়া। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে 'অস্থায়ী সরকারের' প্রতিষ্ঠা এই পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, এই সূত্র ধরেই লেনিন দেখান যে, ঐতিহাসিকভাবে বিপ্লবের স্তরটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক হলেও এই পর্যায়ে বুর্জোয়ারাই যেহেতু বিপ্লবের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে চায়, সেহেতু এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সার্থকভাবে সম্পন্ন করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব গিয়ে পড়ে শ্রমিকশ্রেণীর ওপরে। লেনিন একে নতুন ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রমিকশ্রেণী এই বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়, কারণ শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থেই প্রয়োজন গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির প্রতিষ্ঠা, যা সুরক্ষিত করে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থানকে ও যার ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণী প্রস্তুত হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই লেনিন বলেছিলেন যে, ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে রুশ

বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা ছিল গণতন্ত্র-বিরোধী এবং ঐতিহাসিকভাবেই জার-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেও প্রধান শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণী। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রলেতারিয়েতকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে দেয়, কারণ সমাজতন্ত্র হল গণতন্ত্রেরই সার্থকতম ফলশ্রুতি।

॥ ২ ॥

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব ও স্তালিনের সংযোজন

প্রলেতারীয় বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পরি-প্রেক্ষিতে মার্কস-এঙ্গেলস প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ধারণাটি উদ্ভাবন করেন। লেনিন অক্টোবর বিপ্লবের পটভূমিকায় ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে এই ধারণাটির সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটান। মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে লেনিনের এই অবদান যথার্থই মৌলিক। মার্কস-এঙ্গেলস রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র শোষক শ্রেণীর হাতিয়ার-রূপে ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ সাধন করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্র কি চেহারা নেবে, সে সম্পর্কেও তাঁরা আলোচনা করেছিলেন, যদিও সেই বক্তব্য ঐতিহাসিক কারণেই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। ইতিহাসগত কারণটি হল এই যে, তাঁদের জীবদ্দশাতে মার্কস-এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাস্তব রূপায়ন বা প্রলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রামের পরিণত বহিঃপ্রকাশ দেখার কোন সুযোগ পাননি। লেনিনকে প্রলেতারীয় বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ সাধন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করার বাস্তব সমস্যাটির মুখোমুখি হতে হয়েছিল; সে কারণেই লেনিন মার্কস-এঙ্গেলস প্রস্তাবিত মূল সূত্রগুলির সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটাতে ও তাঁদের চিন্তার অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সিড্‌নি হুক্ (Sidney Hook), জার্মান নয়া-কান্টীয় তাত্ত্বিক ডব্লু. থাইমার (W. Theimer) প্রমুখের মতে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয়ের আলোচনায় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ধারণাটি আদৌ কোন গুরুত্ব পায়নি। সাম্প্রতিক কালের একাধিক তথ্যনিষ্ঠ গবেষণার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে

যে, এই জাতীয় ভাবনা-চিন্তা মার্কস-এঙ্গেলসের রচনার নিছক বিকৃতি মাত্র।[6] এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, মূলতঃ তিনটি পর্বে মার্কস-এঙ্গেলস প্রলেতারীয় একনায়কত্বের তাত্ত্বিক ধারণাটির বিকাশ ঘটান। ১৮৪৫-৪৬এ German Ideology-তে ও ১৮৪৮ সালে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে' মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা প্রথম আলেচেনা করে দেখান যে, প্রলেতারিয়েতকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে "শাসকশ্রেণীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে" ও "গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে" জয়লাভ করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৮৫০-৬০ পর্বে মার্কস ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ও পরবর্তীকালে লুই নেপোলিয়নের স্বেচ্ছাচারী শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণাটির আরও বিকাশ ঘটান। মার্কস-এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণীব প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রথম আন্তর্জাতিকের একাধিক দলিলেও এই চিন্তার প্রতিফলন লক্ষণীয়। এই পর্যায়ে মার্কসের রচনাতে মুখ্যতঃ দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (১৮৫২) বচনায় মার্কস দেখান যে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হলে প্রলেতারিয়েতকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোটিকে চূর্ণ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, এই পর্বের একাধিক রচনায় মার্কস এই ধারণাটির তত্ত্বগত রূপ দেন যে, প্রলেতারিয়েতেব ক্ষমতা দখলেব প্রশ্নটি হল পুঁজিবাদ থেকে পূর্ণ সমাজতন্ত্রে, অর্থাৎ, সাম্যবাদে উত্তরণপর্বে প্রলেতারিয়েতের নিয়ন্ত্রণে এক অন্তর্বর্তীকালীন বাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করা। তৃতীয় পর্বে মার্কস-এঙ্গেলস ঐতিহাসিক প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতার আলোকে এই প্রশ্নটির আরও গভীর বিশ্লেষণ কবেন। ১৮৭১ সালে লুই নেপোলিয়নের জনবিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণী এক ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে মাসাধিককাল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে যে বিকল্প শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিল, ইতিহাসে সেটি প্যারিস কমিউন নামে খ্যাত। এই ঘটনার বিশ্লেষণের আলোচনায় মার্কসের চিন্তার দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, মার্কস তাঁর

The Civil War in France (১৮৭১)-এ দেখান যে, সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণপর্বে প্রলেতারীয় নেতৃত্বে রাষ্ট্রযন্ত্র একটি অন্তর্বর্তীকালীন রূপ পরিগ্রহ করে, যেটিকে মার্কস প্রলেতারীয় একনায়কত্ব নামে অভিহিত করেছেন। প্যারিসের প্রলেতারিয়েত শেষ পর্যন্ত তাদের কমিউনকে বাঁচিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়, যার অন্যতম কারণ ছিল প্যারিস কমিউনের সাংগঠনিক দুর্বলতা ছাড়াও বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করার ব্যর্থতা। এই পরাজয়ের কারণগুলিকে বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কস দেখালেন যে, প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেও প্রতিবিপ্লবকে পর্যুদস্ত করার জন্য ও শোষক শ্রেণীর পুনরুত্থানকে প্রতিহত করার প্রয়োজনে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীকে তার নিজস্ব শ্রেণী-একনায়কত্ব, অর্থাৎ, সংখ্যালঘু শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু শোষিত মানুষের বিপ্লবী প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ; ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের পরও প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি যতদিন পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে তার নিজের ও সমাজের স্বার্থে বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। তাই এই উত্তরণপর্বে রাষ্ট্রকাঠামোর চরিত্রটি হবে বৈপ্লবিক ও এটি ব্যবহৃত হবে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মার্কস সাম্যবাদে উত্তরণপর্বের রাষ্ট্রশক্তিকে "প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব" আখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, মার্কসের দৃষ্টিতে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব বলতে শুধু এই বোঝায় না যে তা হবে প্রতিবিপ্লবকে পর্যুদস্ত করার জন্য বিপ্লবের হাতিয়ার। তাঁর কাছে এর প্রয়োজন প্রলেতারিয়েতের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর থেকে শুরু করে দীর্ঘ একটি কালপর্ব জুড়ে, যার মাধ্যমে প্রলেতারিয়েত তার নিজের রাষ্ট্রক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে, অর্থাৎ, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্র, যাকে মার্কস তাঁর Critique of the Gotha Programme (১৮৭৫)-এ সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের প্রথম স্তর রূপে বর্ণনা করেছেন। পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে ও তখন রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। এঙ্গেলস তাঁর Anti-Duehring-এ এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেই বলেছেন যে, পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে যখন সমাজে সমস্ত রকমের বৈষম্য অবলুপ্ত হবে, তখন রাষ্ট্র বিলীন হয়ে যাবে (the State will wither away)।

এই পটভূমিকায় মার্কস-এঙ্গেলস বর্ণিত প্রলেতারীয় একনায়কত্বের

ধারণাটির তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, পুঁজিবাদ থেকে সমাজ-তন্ত্রে উত্তরণে প্রতিবিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য প্রলেতারিয়েতের নিজস্ব একনায়কত্ব প্রয়োজন; দ্বিতীয়তঃ, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রয়োজন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গঠন করার স্বার্থে, অর্থাৎ পূর্ণ সাম্যবাদে উত্তরণের পূর্ব শর্তগুলিকে প্রতিষ্ঠা করতে; তৃতীয়তঃ, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব একটি অতি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, যেটি পুঁজিবাদের উচ্ছেদের সময় থেকে শুরু করে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাপর্ব পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

আসন্ন অক্টোবর বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে ও পরবর্তীকালে সমাজ-তন্ত্রকে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে রক্ষা করার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে লেনিন এই তত্ত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। লেনিনের মৃত্যুর পর প্রলেতারীয় বিপ্লবকে চিরস্থায়ী ও সমাজতন্ত্র গঠনকে সুনিশ্চিত করতে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ধারণাটির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। তার ব্যাখ্যা করেন মূলতঃ জে. ভি. স্তালিন। লেনিন তাঁর Marxism on the State (১৯১৭), The State and Revolution (১৯১৭), The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky (১৯১৮), The Economics and Politics of Dictatorship of Proletariat (১৯১৯) ও অন্যান্য প্রবন্ধে মার্কস-এঙ্গেলস উদ্ভাবিত প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ধারণাটির সৃজনশীল রূপ দেন ও তার সার্থক বিকাশ ঘটান। পরবর্তীকালে স্তালিন তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে লেনিনের বক্তব্যের যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেন তাঁর Foundations of Leninism (১৯২৪) রচনায়। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রসঙ্গে লেনিনের আলোচনাকে মূলতঃ তিনটি প্রধান সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।[7]

প্রথম সূত্র ঃ শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় যে কোন রাষ্ট্রশক্তি সমাজে আধি-পত্য বিস্তারকারী শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। মার্কস-এঙ্গেলস প্রস্তাবিত 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে' রাষ্ট্রশক্তি সংক্রান্ত এই ব্যাখ্যাকেই আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে লেনিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, রাষ্ট্রশক্তি মূলতঃ সংখ্যা-

7. বিশিষ্ট ফরাসী মার্কসবাদী গবেষক বালিবার (Balibar) তাঁর *The Dictatorship of the Proletariat* গ্রন্থে লেনিনের এই সূত্রগুলিকে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যেটি এই আলোচনাতে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

গরিষ্ঠ শোষিত শ্রেণীগুলির ওপরে সংখ্যালঘু শোষকদের একক শ্রেণী একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। শোষক শ্রেণী শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে তার শ্রেণীস্বার্থকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই রাষ্ট্রক্ষমতাকে আঁকরে থাকে ও প্রয়োজন হলে চূড়ান্ত হিংসাত্মক উপায়ে তার নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ বিরোধী সংগ্রামকে ধ্বংস করতে পিছু পা হয় না। সে কারণে এই শ্রেণীএকনায়কত্বকে ধ্বংস করতে হলে প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব বিপ্লবী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা, যাতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব স্থায়ী হয় ও শ্রমিকশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অক্ষুন্ন থাকে। লেনিন এই বিপ্লবী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাকারী শ্রমিকশ্রেণী নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রশক্তিকেই বলেছেন প্রলেতারীয় একনায়কত্ব। লেনিনের এই তত্ত্ব দু'টি যুক্তির ওপরে নির্ভরশীল। এক, রাষ্ট্রশক্তি শ্রেণীনিরপেক্ষ কোন বিমূর্ত প্রতিষ্ঠান নয়। একটি বিশেষ ধরনের শ্রেণীবিন্যাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা,—মার্কসবাদ এ কথাই বলে। দুই, রাষ্ট্রশক্তি শেষ বিচারে যেহেতু একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী, সেহেতু অন্যান্য শ্রেণীর ওপরে কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রশক্তিকে চরম দমন পীড়ন ও হিংসার পথে পরিচালিত করা হয় ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সেই কারণেই প্রতিটি রাষ্ট্রই কার্যতঃ সংখ্যালঘু শোষকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রকাশ। এই কারণে দেখা যায় যে, উদারনীতিবাদে বিশ্বাসী পশ্চিমী গণ-তন্ত্রগুলিতেও শ্রমিক মিছিল, নিরস্ত্রীকরণ, যুদ্ধ ও বেকারীর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও ধর্মঘটকে দমন করতে যে কোন অজুহাতে বলপ্রয়োগ ও হিংসার নীতি অনুসৃত হয়। স্তালিন সঠিকভাবেই বলেছেন যে, প্রলেতারীয় এক-নায়কত্ব হল এককভাবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, অর্থাৎ এটি এক নতুন ধরনের একনায়কত্ব যেটি পরিচালিত হয় পরাভূত শোষকদের প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপকে পর্যুদস্ত করার বিরুদ্ধে ও একই সঙ্গে এটি হয় শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এক নতুন ধরনের গণতন্ত্র, কারণ এই একনায়কত্ব পরিচালিত হয় শোষিত শ্রেণীর স্বার্থে। আর এই কারণেই এই গণতন্ত্র ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার স্বার্থে আদৌ পরিচালিত হয় না। এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে যাকে নিয়ন্ত্রণ করে শ্রমিকশ্রেণী ও এটি পরিচালিত হয় ধনিক-শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় সূত্রঃ বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের স্তরে উত্তরণটি শ্রেণীসংগ্রাম নিরপেক্ষভাবে হয় না। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব সৃষ্ট

হয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তির কাঠামোটিকে চূর্ণ করে, অর্থাৎ, ধনতান্ত্রিক সমাজকে রক্ষা করে যে সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র ও পুলিশ তাদের শক্তিকে পর্যুদস্ত করে। এক কথায় বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব থেকে প্রলেতারীয় একনায়কত্বে উত্তরণটি সংঘটিত হয় তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তির দমনমূলক কাঠামোটিকে ভাঙার মধ্য দিয়ে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার দু'টি দিক লক্ষ্যণীয় ও একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রথমতঃ, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা বলতে বোঝায় দমনমূলক একটি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করা। দ্বিতীয়তঃ, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বলতে কেবলমাত্র ধ্বংসকেই বোঝায় না, প্রলেতারিয়েত তথা সমগ্র শোষিত মানুষের স্বার্থ রক্ষাকারী নতুন এক রাষ্ট্রশক্তি গড়ে তোলার কাজকেও বোঝায় ও মূলতঃ এই নতুন বৈপ্লবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করার পূর্বশর্তরূপেই প্রয়োজন বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রটির ধ্বংসসাধন। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ধারণাটিকে বোঝার পক্ষে এই দু'টি দিকের খানিকটা বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

(ক) বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের দমনমূলক কাঠামোটিকে ধ্বংস করার জন্য যে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রয়োজন, সেটিকে প্রথম গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করেন মার্কস তাঁর The Civil War in France রচনায়। লেনিন এই ধারণাটিরই সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটান। স্তালিন দেখিয়েছেন, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অন্যতম উদ্দেশ্য হল দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির বিপ্লববিরোধী কার্যকলাপকে চূর্ণ করা, যাতে কোন মতেই পুঁজিবাদ ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। বালিবার (Balibar) এই প্রশ্নটিকে লেনিনের অত্যধিক গুরুত্ব দেবার পিছনে দু'টি কারণ নির্দেশ করেছেন। প্রথমতঃ, শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করে যখন একটি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে অর্থাৎ, যখন বিপ্লবী শক্তিগুলির চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে শোষক শ্রেণীর করায়ত্ত রাষ্ট্রযন্ত্রটি বিপন্ন হয়ে পড়ে, তখন শাসকশ্রেণী এই সংগ্রামকে প্রতিহত করতে নিয়োগ করে তার দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রকে। তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের অন্যতম শর্ত এই যন্ত্রটিকে চূর্ণ ও ধ্বংস করা। দ্বিতীয়তঃ, বালিবার সঠিকভাবেই বলেছেন যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আইনগত চেহারা যাই হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই তার দমনমূলক চরিত্রটি মূলতঃ এক ধরনের। বিশেষতঃ, পুলিশ ও সেনাবহিনীর সংগঠন যে কোন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণতঃ একই ধাঁচে গড়া হয়ে থাকে ও সে কারণেই দেখা যায় যে, চূড়ান্ত

কোন এক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয় ও চরম সন্ত্রাসের পথ অনুসরণ করে গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য। এমন ঘটনাই ঘটেছিল জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতায় আসার সময়ে বা সম্প্রতি চিলিতে আলেন্দে সরকারকে উৎখাত পর্বে। এই সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পুলিশ ও সেনা-বাহিনীর সহায়তাতেই অতি দ্রুত চরম দক্ষিণপন্থী সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাদের আক্রমণের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিকশ্রেণী।

(খ) প্রলেতারীয় একনায়কত্ব শুধুমাত্র একটি নেতিবাচক ধারণা নয়, যার অর্থ একটি দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংস সাধন করা। এর অন্যতম লক্ষ্যটি হল ইতিবাচক, অর্থাৎ, নতুন ধরনের একটি রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠা করা। বালিবার এর দু'টি দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমতঃ, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, গুণগতভাবে সেটি এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রশক্তি, কারণ প্রলেতারীয় বিপ্লব সংঘটিত হয় জনগণের সক্রিয় ও ব্যাপক, প্রত্যক্ষ ও বিপুল অংশগ্রহণের মধ্যে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল প্রকৃত অর্থেই জনগণের বিপ্লব ও সে কারণেই প্রলেতারীয় একনায়কত্ব যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তার মূল ভিত্তি হল জনগণ। শোষিত মানুষকে সংগঠিত করে যে গণসংগঠনগুলি, সেগুলিই হয়ে দাঁড়ায় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মূল ভিত্তি। স্তালিন এ কারণেই প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে শোষিত মানুষের গণতন্ত্ররূপে আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অন্যতম লক্ষ্য হল সোভিয়েতগুলিকে কেন্দ্র করে প্রকৃত জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ও প্রয়োগ করা। দ্বিতীয়তঃ, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে নতুন যে রাষ্ট্রক্ষমতার জন্ম হয়, সেটি রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার চূড়ান্ত অবলুপ্তির শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব যে নতুন রাষ্ট্রশক্তির জন্ম দেয়, তার মধ্যেই নিহিত থাকে ভবিষ্যতের রাষ্ট্র অব-লুপ্তির ধারণা। এক কথায়, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মাধ্যমে যে রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি যেহেতু পরিচালিত হয় জনগণের স্বার্থে সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করতে, যেহেতু সমাজের দুর্বল শ্রেণীগুলিকে উৎপীড়ন করার প্রয়োজনে রাষ্ট্রের যে উদ্ভব হয়েছিল, তার তাৎপর্য সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ দৃঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পেতে থাকে ও প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির সম্পূর্ণ পরাজয় সূচিত হলে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব রাষ্ট্রবিহীন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তুত করে।

তৃতীয় সূত্র ঃ মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে' ও পরবর্তীকালে মার্কস তাঁর Citique of the Gotha Programme-এ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থাপিত হয় আদর্শ সাম্যবাদী ব্যবস্থায় পৌঁছনর পূর্বশর্ত বা সাম্যবাদের প্রথম স্তর, লেনিন যাকে বলেছেন সমাজতন্ত্র (Socialism)। এই স্তরে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব যে রাষ্ট্রশক্তির জন্ম দেয় তা একই সঙ্গে গড়ে তোলে সাম্যবাদে রূপান্তরের বাস্তব বুনিয়াদ ও অপরদিকে এটি প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে পরিচালনা করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম। এই পর্বটি তাই স্বাভাবিকভাবেই একটি দীর্ঘ সময় জুড়ে ব্যাপ্ত থাকে। এই পর্বের পরিসমাপ্তি জন্ম দেয় দ্বিতীয় পর্বের, অর্থাৎ, প্রকৃত সাম্যবাদী সমাজের, যখন শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে, অর্থাৎ, সমাজতন্ত্রবিরোধিতার অবসান হয়ে রাষ্ট্রের প্রয়োজনও নিঃশেষিত হয়, যার পরিণতিতে, এঙ্গেলসের ভাষায় রাষ্ট্র বিলীন হয়ে যায়। এই পর্বে উৎপাদিকা শক্তিগুলির নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ ঘটে যা জন্ম দেয় সাম্যবাদী সমাজের উপযোগী উৎপাদন সম্পর্কের, সেই সমাজে প্রলেতারীয় ও অ-প্রলেতারীয় শ্রেণীগুলির মধ্যে অবৈর দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে ও মানুষ হয় তার সৃষ্টিশীল শ্রমশক্তির সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণকর্তা, অর্থাৎ, মানুষের শ্রম হয় তার সৃষ্টিশীলতার ও আনন্দের অভিব্যক্তি। এ থেকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। এক, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের পর্বটিই হল সমাজতন্ত্র, অর্থাৎ সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের প্রথম স্তর, যার ব্যাপ্তি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অব্যবহিত পরের মুহূর্ত থেকে সমাজতন্ত্রের সাম্যবাদে উত্তরণের স্তরসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। দুই, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মাধ্যমে যে নতুন রাষ্ট্রশক্তি উত্থিত হয় তার মধ্যে নিহিত থাকে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত অবলুপ্তির বীজ, যেটি পরিণতি লাভ করে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এক কথায়, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, সেটিই নির্ধারণ করে দেয় ভবিষ্যতের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ, সাম্যবাদী ব্যবস্থার রূপরেখাটিকে। সুতরাং মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিনের দৃষ্টিতে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব একটি দ্বান্দ্বিক ধারণা, যা একই সঙ্গে একটি নতুন রাষ্ট্রশক্তির জন্ম দেয় ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অবলুপ্তির পূর্বশর্তকে সৃষ্টি করে।

লেনিনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে ১৯৩৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে

স্তালিনের সময়ে যে নতুন সংবিধানটি গৃহীত হয় তাকে কেন্দ্র করে স্তালিনের বিশ্লেষণ প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ধারণাটি সম্পর্কে এক জটিল বিতর্কের সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, এই পর্বে স্তালিনের বিশ্লেষণ সর্বাংশে সঠিক ছিল না। স্তালিনের ব্যাখ্যায় বলা হল যে, নতুন সোভিয়েত সংবিধান গৃহীত হবার পিছনে অন্যতম কারণটি ছিল এই যে, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটেছে ও ফলে প্রলেতারীয় একনায়কত্বেরও অবসান ঘটেছে। স্তালিনের মতে শ্রেণীসংগ্রাম ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব পর্বের পরিসমাপ্তির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমাজতন্ত্রের স্তর যার মূল বৈশিষ্ট্যটি হল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপস্থিতি ও শ্রেণীসংগ্রামের অবসান। এই পর্বের সমাপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্যবাদ,—এটিই ছিল স্তালিনের বক্তব্য।

স্তালিনের এই বিশ্লেষণের সঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিনের বক্তব্যের কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিনের মতে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব হল একটি দ্বান্দ্বিক ধারণা, অর্থাৎ এই রাষ্ট্রশক্তি একই সঙ্গে সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করে ও অপরদিকে নিরলস শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে পর্যুদস্ত করে। স্তালিনের মতকে গ্রহণ করার অর্থ হবে এই যে, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বলতে শুধুমাত্র শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা করাকেই বোঝায়। দ্বিতীয়তঃ, মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রলেতারীয় একনায়কত্বের গোটা পর্বটিই হল সমাজতন্ত্র, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের সমগ্র স্তরটি জুড়েই শ্রেণীসংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। স্তালিনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সমাজতন্ত্রের স্তর ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের স্তর পরস্পরবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব পর্বের শ্রেণীসংগ্রামের স্তরের সমাপ্তির পর শুরু হয় সমাজতন্ত্রের স্তর ও তার ফলে সমাজতন্ত্রের স্তরে শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব লোপ পাবে। ১৯৩৬ সালে সোভিয়েত সংবিধান গ্রহণ করার পিছনে অন্যতম যুক্তি ছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের স্তরে উন্নীত হয়েছে ও তারই প্রয়োজনে এই নতুন সংবিধান রচনা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার অর্থ দাঁড়ায় যে, মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিনের ব্যাখ্যায় যেখানে প্রলে-তারীয় একনায়কত্ব, সমাজতন্ত্র ও শ্রেণীসংগ্রাম পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত,

স্তালিনের বক্তব্য অনুযায়ী প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, অর্থাৎ, শ্রেণীসংগ্রামের স্তর ও সমাজতন্ত্রের স্তর পরস্পর বিচ্ছিন্ন। তৃতীয়তঃ, মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিনের চোখে যেখানে পূর্ণ সাম্যবাদের স্তরের উত্তরণে দু'টি পর্বের কথা ভাবা হয়েছে, স্তালিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিনটি পর্বের করা ভাবতে হয়। প্রথম পর্ব: প্রলেতারীয় একনায়কত্ব=শ্রেণীসংগ্রামের স্তর; দ্বিতীয় পর্ব: সমাজতন্ত্র=বন্ধুত্বপূর্ণ শ্রেণীসম্পর্কের স্তর; তৃতীয় পর্ব: পূর্ণ সাম্যবাদের স্তর। স্তালিনের আলোচনাতে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে যে যান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, সেটি পরবর্তীকালে একটি গুরুতর রকমের ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয়। সেটি হল এই যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজন আর থাকে না এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব পরস্পরবিরোধী; অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রলেতারীয় এক-নায়কত্বের প্রয়োগ সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রবিরোধী। সাম্প্রতিককালের একাধিক উদারনীতিবাদে বিশ্বাসী মার্কসবাদীরা স্তালিনের এই যুক্তিটিকে ব্যবহার করেন প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিরোধিতাকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে।[৪] ১৯৫৬ সালের সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০ তম কংগ্রেসে স্তালিনের একাধিক ভুলত্রুটির যে সমালোচনা করা হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি স্তালিনের এই তাত্ত্বিক ভ্রান্তিটির প্রতি দিক নির্দেশ করে বলেছিল যে, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা বিরোধী নয়; বরং উভয়ে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।[৭] প্রলেতারীয় একনায়কত্ব সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করে ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ইতিবাচক দিকটিকে সংগঠিত করে। স্তালিনের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অনেক

8. এই প্রসঙ্গে কলেত্তির (Colletti) 'Lenin's State and Revolution' প্রবন্ধটি তাঁর *From Rousseau to Lenin* গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২২৬-২২৭। তিনি নিজে কট্টর স্তালিনবিরোধী হলেও এই যুক্তিটিকে কাজে লাগিয়েছেন। স্তালিনের এই বক্তব্যের বিস্তৃত সমালোচনার জন্য **E. Balibar,** ***On the Dictatorship of the Proletariat*** গ্রন্থের **Grahame Lock** কৃত ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য।

9. **'More on the Historical Experience of the Dictatorship of the Proletariat in** ***The Historical Experience of the Dictatorship of the Proletariat*** দ্রষ্টব্য।

রীতিনীতিই যে মেনে চলা হয়নি, তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই বিশ্লেষণ করে।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস উদ্ভাবিত মৌলিক ধারণাটির লেনিন যে বিশ্লেষণ করেছেন, পশ্চিমী তাত্ত্বিকরা একাধিক উপায়ে তার সমালোচনা করেছেন। প্রথমতঃ, এই ধারণা পোষণ করা হয়ে থাকে যে, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব হল বলপ্রয়োগের সমার্থক। বলা বাহুল্য যে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বে বলপ্রয়োগের উপাদান অবশ্যই থাকে, কারণ যে কোন একনায়কত্বই বলপ্রয়োগের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু প্রলেতারীয় ও অপ্রলেতারীয় একনায়কত্বের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটি হল যে, অন্যান্য একনায়কত্বে শোষক শ্রেণী বলপ্রয়োগ করে শোষিতের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায়। প্রলেতারীয় একনায়কত্বে বলপ্রয়োগ করা হয় শোষকের বিরুদ্ধে, নতুন এক রাষ্ট্রশক্তি গঠন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রক্ষা করার প্রয়োজনে। দ্বিতীয়তঃ, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব হল গণতন্ত্রবিরোধী, কারণ এই বিপ্লবী একনায়কত্ব তথাকথিত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে। এর জবাবে বলা যায় যে, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের রীতিনীতিগুলি যুগ যুগ ধরে রচিত হয়েছে শোষক শ্রেণীর ওপরে দমনপীড়ন চালাবার জন্য। যেহেতু প্রলেতারীয় একনায়কত্ব হল শোষিত মানুষের স্বার্থে এক নতুন ধরনের গণতন্ত্র, তাই পুরনো উদারনৈতিক রীতিনীতিগুলিকে বর্জন করেই নতুন রাষ্ট্রশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। তৃতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রের বিরোধীরা বলেন যে, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় একটিই মাত্র পথে, অর্থাৎ, হিংসার পথে, যেমনটি হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা বলে যে এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পূর্ব ইউরোপের একাধিক দেশে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের (People's Democratic Revolution) মাধ্যমে। এই দেশগুলিতে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ বা সোভিয়েত জাতীয় সশস্ত্র সংগঠন ঐতিহাসিক কারণেই প্রাধান্য পায়নি। এই দেশগুলিতে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল: (ক) বুর্জোয়া সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের ধীরে ধীরে বিলোপসাধন; (খ) একাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি যেগুলির ফ্যাসীবাদ-বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, যদিও নিয়ামক ভূমিকাটি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর;

(গ) অনেক ক্ষেত্রে পুরনো সংসদীয় ব্যবস্থার কোন কোন রীতিনীতিকে বাঁচিয়ে রাখা; (ঘ) সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় এই দেশগুলিতে বল-প্রয়োগের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। অপরদিকে চীন, উত্তর কোরিয়া ও উত্তর ভিয়েতনামে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্য-বাদ বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে ও সেই কারণে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের চেহারা এই দেশগুলিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের।

॥ ৩ ॥

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি প্রসঙ্গে লেনিনের তত্ত্ব ও স্তালিনের বিশ্লেষণ

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত কবতে ও বিবোধী শক্তিগুলিব প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপকে পর্যুদস্ত করতে প্রয়োজন শ্রমিশ্রেণীব নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রেব আদর্শে পবিচালিত বিপ্লবী পার্টি। প্রলেতাবীয় একনায়কত্বেব ধারণাকে বাস্তবায়িত করাব জন্য শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির প্রয়োজনীয়তা ও তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে অক্টোবব বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা কবেছিলেন লেনিন ও পার্টি প্রসঙ্গে লেনিনীয় তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করেন স্তালিন।

১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস-এঙ্গেলস বিশ্লেষণ করে দেখান যে, শ্রমিকশ্রেণীব সংগ্রামে মুখ্য পরিচালকের ভূমিকা পালন করে কমিউনিস্ট পার্টি, যার সাংগঠনিক নেতৃত্ব ছাড়া প্রলেতারিয়েতেব স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করতে পারে না। মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কমিউনিস্ট লীগ ও পরবর্তীকালে শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন,—প্রথম আন্তর্জাতিক। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে সাংগঠনিক রূপ দেবাব পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের একাধিক বচনার মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের গুরুত্ব, প্রলেতারিয়েতকে একটি শ্রেণীসচেতন শক্তিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে পার্টির ভূমিকা ও প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার জন্য পার্টির সক্রিয়তার প্রশ্নকে গুরুত্বসহকারে ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কস-এঙ্গেলসই প্রথম একথা বলেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির রাজনৈতিক লক্ষ্য যেহেতু একটি বিপ্লবকে সম্পন্ন করা, সেহেতু এই ধরনের পার্টির সাংগঠনিক চরিত্র তথা-কথিত পার্লামেন্টারী পার্টিগুলির চরিত্র থেকে হবে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁরাই

প্রথম বলেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে একদিকে কঠিন নিয়মশৃঙ্খলা ও অপরদিকে পার্টির মধ্যে গণতন্ত্র উভয়ের সার্থক সমন্বয় ঘটাতে হবে। তাঁরাই প্রথম এই ধারণার তাত্ত্বিক ভিত্তি সৃষ্টি করেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে প্রতিটি সদস্যের যেমন গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে, তেমনই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতই হবে চূড়ান্ত ও প্রতিটি সদস্যের ক্ষেত্রেই সেটি বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হবে; অর্থাৎ পার্টি শৃঙ্খলা ও পার্টি গণতন্ত্র উভয়ের দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব বিপ্লবী পার্টি। ১৮৭১ সালে প্যারিস কমিউনের ব্যর্থতাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কস তাঁর The Civil War in France রচনাতে দেখান যে, কমিউনের পতনের অন্যতম কারণ ছিল প্যারিস প্রলেতারিয়েতের অকুতোভয় সংগ্রামকে নেতৃত্ব দেবার মত কোন পার্টির অনুপস্থিতি, যার ফলে এই ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবের কাছে পরাস্ত হয়। এই অভিজ্ঞতা মার্কস ও এঙ্গেলসকে প্রলেতারীয় সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য বিপ্লবী পার্টির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন করে তোলে।

পার্টি প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি একান্তভাবেই শ্রমিকের শ্রেণী সচেতনতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। কল্পনাশ্রয়ী কিছু অস্পষ্ট ধারণাকে ভিত্তি করে অথবা সন্ত্রাসবাদী কোন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য যে সব পার্টি গড়ে ওঠে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গুণগতভাবে তা থেকে ভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ, সর্বহারার প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় যে পার্টির ওপরে, তার একটি সুনির্দিষ্ট মতাদর্শগত ভিত্তি থাকে এবং বলা বাহুল্য, সেটি হল মার্কসীয় বস্তুবাদী জীবনদর্শন। নিছক আবেগ বা স্বতঃস্ফূর্ততা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির পিছনে প্রধান চালিকাশক্তি হতে পারে না। তৃতীয়তঃ, যেহেতু প্রলেতারিয়েতের পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের মতাদর্শে আস্থাশীল, সেই কারণে তার একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্যটি হল বুর্জোয়া শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে আঘাত হেনে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা।

লেনিন মার্কস-এঙ্গেলস প্রবর্তিত বিপ্লবী পার্টি সম্পর্কে মূল ধারণাটির সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটান। পার্টি প্রশ্নে লেনিনের তত্ত্ব লেনিনবাদের ঐতিহাসিক

বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অক্টোবর বিপ্লবকে সংগঠিত ও সুসম্পন্ন করার বৈপ্লবিক প্রয়াসে লেনিনের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সংসদীয় ব্যবস্থার ধাঁচে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম ইউরোপীয় পার্টিগুলির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হতে পারে না। তিনি তাঁর Notes of a Publicist (১৯২২) প্রবন্ধে দেখালেন যে, সংসদীয় রীতিনীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পার্টিগুলি হল মূলতঃ সংস্কারপন্থী ও বিপ্লববিরোধী, যদিও বিপ্লবের কথা তারা সময় বিশেষে বলে থাকে। ফলে এই পার্টিগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শে পরিচালিত বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠনে রূপান্তরিত করা অসম্ভব। লেনিন তাঁর সাংগঠনিক ও তাত্ত্বিক প্রচেষ্টায় যে বলশেভিক পার্টিকে গড়ে তুলেছিলেন, সেটি ছিল প্রধানতঃ দু'টি ভিন্ন ধারণার বিরোধী। প্রথমতঃ, লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় পশ্চিমের সংসদীয় রীতিনীতিতে বিশ্বাসী পার্টিগুলির ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য দায়ী শাসক পুঁজিবাদী সরকারগুলির যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাতে এরা বদ্ধপরিকর। লেনিনের কাছে এই পার্টিগুলি ছিল মূলতঃ সংস্কারপন্থী ও বিপ্লববিরোধী, যাদের কাছে যে কোন ধরনের বিপ্লবী অভ্যুত্থান ও বৈপ্লবিক কর্মসূচী ছিল অগ্রহণযোগ্য। এই ধারাটির পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাউট্স্কি, শাইডেমান্ প্রমুখেরা। ১৮৯০ সাল থেকে এই প্রবণতা পশ্চিম ইউরোপীয় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তা চরম পরিণতি লাভ করে। পার্টি সম্পর্কে লেনিনবাদী তত্ত্বের মূল নীতিগুলি তাই গড়ে ওঠে এই ঝোঁকের বিরোধিতা করে। দ্বিতীয়তঃ, পার্টি গঠনের প্রশ্নে লেনিনকে অপর একটি বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যেটি সৃষ্টি করেছিলেন রুশ নারদনিকরা। নারদনিকদের একটি প্রভাবশালী অংশ ছিল সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ও তাদের ধারণা ছিল যে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে একমাত্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে। লেনিনের কাছে এই তত্ত্ব ছিল বর্জনীয়, কারণ তাঁর কাছে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা ছিল সর্ব অর্থে অবৈজ্ঞানিক। সুতরাং সংস্কারবাদ ও সন্ত্রাসবাদ এই দুই বিপরীতমুখী ঝোঁকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লেনিনকে বলশেভিক পার্টি গঠনের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রস্তুত করতে হয়েছিল।

পার্টি প্রসঙ্গে লেনিনবাদী তত্ত্বের আদি ব্যাখ্যাটি পাওয়া যায় লেনিনের

What is to be done ? (১৯০২) প্রবন্ধে। এই রচনাটিতে তিনি আসন্ন ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের পটভূমিকায় বলশেভিক আদর্শে পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করেন। প্রথমতঃ, বিপ্লবী নেতৃত্বের সাংগঠনিক স্থিতি ও ধারাবাহিকতাকে সুনিশ্চিত করা না গেলে বিপ্লবকে স্থায়িত্ব দেয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, বৈপ্লবিক সংগঠনের শক্তি নির্ভর করবে জনগণের বৃহত্তম অংশকে আন্দোলনে সামিল করানর সাফল্যের ওপরে। তৃতীয়তঃ, প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাসের মোকাবিলা কবার জন্য এই সংগঠনের সদস্যপদ যতদূর সম্ভব পেশাগত বিপ্লবীদের (professional revolutionaries) মধ্যে সীমিত রাখা প্রয়োজন। লেনিনের এই রচনাটি প্রকাশিত হবার পরে রাশিয়াতে বিপ্লবের প্রেক্ষাপট একাধিকবার অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়, যার ফলে লেনিন একই সঙ্গে প্রকাশ্যে ও গোপনে পার্টি গড়ে তোলার কাজকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রচিত One Step Forward, Two steps Back (১৯০৪), Left Wing Communism—An Infantile Disorder (১৯২০) প্রভৃতি প্রবন্ধে লেনিন বলশেভিক পার্টি গঠনের মূল নীতিগুলির সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটান। লেনিনের মৃত্যুর পরে স্তালিন তাঁর Foundations of Leninism (১৯২৪)-এ পার্টি প্রসঙ্গে লেনিনবাদী তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রে গ্রথিত করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। স্তালিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী সেনাবাহিনী, অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে পার্টি। স্তালিন বলেছেন যে, রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনী যেমন সেনাধ্যক্ষ ছাড়া তার ভূমিকা পালন করতে পাবে না, শ্রমিকশ্রেণীও তার সংগ্রামী ভূমিকা পালন করতে অক্ষম হবে যদি না তাকে পরিচালনা করে সেনাধ্যক্ষ সদৃশ পার্টি। কিন্তু পার্টিকে শুধুমাত্র নেতারূপে ঘোষণা করলেই যথেষ্ট নয়। নেতৃত্ব সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই যদি তা পরিচালিত হয় সঠিক বৈপ্লবিক তত্ত্বের দ্বারা, অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ মার্কসবাদের ভিত্তিতে যদি তা রচিত হয়। সেই সঙ্গে পার্টি বহির্ভূত বৃহত্তর জনগণের স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার ওপরে নির্ভর করে জনমানসে পার্টি নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা ও তাকে সুনিশ্চিত করে গড়ে ওঠে পার্টির বিপ্লবী সংগঠন।

দ্বিতীয়তঃ, পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর সাংগঠনিক নেতৃত্ব প্রদান করতে হয়।

তার অর্থ, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী পরিচালনা করে সংগঠনকে অক্ষুন্ন রেখে তার ব্যাপ্তিকে প্রসারিত করতে হবে। প্রতিবিপ্লবী শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে আক্রমণ করা, আবার বিরোধী শক্তির বিপুলতর প্রতিআক্রমণের বিরুদ্ধে সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে প্রয়োজনে সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণ করা,—এই উভয় পন্থা অনুসরণ করার জন্যই পার্টির সাংগঠনিক নেতৃত্বকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন তাঁর One Step Forward, Two Steps Back প্রবন্ধে দেখালেন যে, প্রকৃত বিপ্লবী আদর্শের ওপরে পার্টিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ক্ষুদ্রতম ইউনিট থেকে উচ্চতম ইউনিট পর্যন্ত পার্টির গোটা কাঠামোটিকে গড়ে তুলতে হবে সুসংবদ্ধভাবে, কারণ পার্টি বলতে কয়েকটি সাংগঠনিক ইউনিটের যান্ত্রিক সমন্বয়কে বোঝায় না। ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম স্তর পর্যন্ত পার্টির সাংগঠনিক নেতৃত্ব হবে সুদৃঢ়, একত্রিত ও সংঘবদ্ধ। এই বক্তব্যের ভিত্তিতে লেনিন বলেছিলেন যে নিম্নতম ইউনিট থেকে উচ্চতম ইউনিট পর্যন্ত পার্টির প্রতিটি সদস্য পরিচালিত হবে একটি নীতি দ্বারা। সেটি হল এই যে, পার্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে প্রতিটি সদস্যের মতামত গণতান্ত্রিক উপায়ে বিবেচনার পর সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে স্বীকৃত হবে ও সেটি হবে প্রতিটি সদস্যের প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য। মার্কসীয় পরিভাষায় এর নাম গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা (Democratic Centralism), যার মাধ্যমে পার্টির সংগঠনকে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রাখা যায়। এই নীতি অনুসৃত না হলে পার্টির সাংগঠনিক ঐক্য ধ্বংস হতে বাধ্য। লেনিন এই সঙ্গে আরও একটি নীতির ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দেন; সেটি হল যে, পার্টির প্রতিটি সদস্যকে কোন না কোন পার্টি সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। লেনিনের বক্তব্য হল যে, সাংগঠনিক কাজের মাধ্যমেই পার্টি সম্পর্কে একজন সদস্যের রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ জন্মায় ও সেই সঙ্গে পার্টি শৃঙ্খলাও অটুট থাকে। এই প্রশ্নে মেনশেভিকদের সঙ্গে লেনিনের তীব্র মতবিরোধ ছিল। মেনশেভিকদের বক্তব্য ছিল যে, পার্টি কর্মসূচীর প্রতি আস্থাশীল ও সহানুভূতিশীল যে কোন ব্যক্তিকেই পার্টি সদস্য মনে করা যেতে পারে। লেনিনের আপত্তি ছিল এই যে, কোন ধরনের দায়িত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ভূমিকা পালন না করেই যদি কোন ব্যক্তি পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন, তাহলে পার্টি সদস্য ও বহিরাগতদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না, যার ফলে পার্টি হয়ে উঠবে কিছু

তথাকথিত সহানুভূতিশীল ও মাতব্বর ব্যক্তির মিলনক্ষেত্র ও যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে পার্টি শৃঙ্খলার অবলুপ্তি ও পার্টি সংগঠনের ভাঙন।

তৃতীয়তঃ, পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে সর্বোচ্চতম নেতৃত্ব, অর্থাৎ, প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামকে পরিচালনা করে যে একাধিক গণসংগঠন, সেগুলিকে নেতৃত্ব প্রদান করে পার্টি। ট্রেড ইউনিয়ন, পার্লামেণ্টারী গ্রুপ, শিক্ষক, ছাত্র, মহিলা সংগঠন, কৃষকদের নিজস্ব সংগঠন প্রভৃতি একাধিক চ্যানেলে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম আত্মপ্রকাশ করে। এই সংগঠনগুলির নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব পার্টির, নতুবা বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়ে চরম নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে। পার্টির কাজ হবে বিভিন্ন ফ্রন্ট বা গণসংগঠনগুলির মধ্যে সাযুজ্য সাধন করে শ্রেণীসংগ্রামকে একটি চূড়ান্ত পরিণতির দিকে পৌঁছে দেওয়াকে সুনিশ্চিত করা। তার অর্থ এই নয় যে, এই সংগঠনগুলি হবে সর্বতোভাবে পার্টি সদস্যদের দ্বারাই এককভাবে পরিচালিত; কারণ এই সংগঠনগুলির অনেক সদস্যই হবেন পার্টি বহির্ভূত, অথচ যারা শ্রেণীসংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বৃহত্তর জনগণেরই একাংশ। তাই পার্টি বহির্ভূত ব্যক্তিদের ওপরে পার্টি আইনতঃ তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কিন্তু যেটি প্রয়োজন তা হল এই যে, সংগঠনগুলির মূল নেতৃত্ব থাকবে পার্টির প্রতি অনুগামী ও এই নেতৃত্বের মাধ্যমেই পার্টিকে পরোক্ষভাবে গণসংগঠনগুলির ওপরে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে। সে কারণেই লেনিনবাদী তত্ত্বে রাজনীতি ও পার্টি নিরপেক্ষ গণসংগঠনের কোন স্থান নেই।

চতুর্থতঃ, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ধারণাকে বাস্তবে রূপদানের হাতিয়ার হল পার্টি। পার্টির কাজ প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী একনায়কত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা ও তাকে সুসংহত করে বিপ্লবকে রক্ষা করা। পার্টি এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থাকে জোরদার করে, শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে ও পাতি বুর্জোয়া মতাদর্শ, চিন্তা ও ভাবধারার বিরুদ্ধে জনমতকে সংগঠিত করে। এক কথায় অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষকে সংঘবদ্ধ ও শৃংখলাবদ্ধ করে তোলার বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করে পার্টি।

পঞ্চমতঃ, পার্টি হল ঐক্যের প্রতীক ও যে কোন ধরনের উপদলের (Faction) বিরোধী। প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে সুনিশ্চিত করার জন্য

পার্টির ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করা অন্যতম দায়িত্ব, কারণ পার্টির মধ্যে অনৈক্য প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। তার অর্থ এই নয় যে পার্টির মধ্যে কোন মতপার্থক্য থাকবে না। বরং পার্টি শৃঙ্খলার অর্থই এই যে, সচেতনভাবে পার্টি কর্মসূচীকে গ্রহণ করে পার্টির প্রতি অনুগত্য স্বীকার করা প্রয়োজন, কারণ যান্ত্রিকভাবে বা বলপূর্বক শৃঙ্খলা আরোপ করার চেষ্টা সংগঠনের পক্ষে ক্ষতিকর। অতএব পার্টির চৌহদ্দির মধ্যে সচেতনভাবে মতপার্থক্য প্রকাশ ও নিরসন অবশ্যই কাম্য। কিন্তু পার্টির ছত্রছায়ায় থেকে স্বাধীন মত প্রকাশেব নামে কতকগুলি উপদল সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে যখন পার্টিবিরোধী কর্মসূচী নেওয়া হয়, তখন সেগুলিকে নির্মূল করা অবশ্যই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে এই উপদলগুলিকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

ষষ্ঠতঃ, পার্টি তার অভ্যন্তরের "সুবিধাবাদীদের" হাত থেকে নিজেকে মুক্ত কবে সংগঠনকে সুদৃঢ় করে। পার্টি কর্মসূচীর বিকৃতি ঘটিয়ে তার রূপায়নে বাধা দান করে এই শক্তিগুলি। অপ্রলেতারীয় মতাদর্শে আচ্ছন্ন, বিশেষতঃ বুর্জোয়া ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত বিভিন্ন শক্তি যখন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করে শ্রমিক আন্দোলনকে বুর্জোয়া চরিত্র দান করে, তখন তা পার্টির মধ্যে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী চরম সুবিধাবাদের জন্ম দেয়। পার্টিকে এই শক্তিগুলির বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম করে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে হয়, যেমন কবতে হয়েছিল বলশেভিক পার্টিকে মেনশেভিক ও অন্যান্য সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে।

পার্টি প্রসঙ্গে লেনিনবাদী তত্ত্বকে একাধিক পশ্চিমী তাত্ত্বিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমতঃ, ফিশার (Fischer), মারেক্ (Marek) প্রমুখ প্রাক্তন মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, লেনিন পার্টির তত্ত্বকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে মার্কসবাদের বিকৃতি ঘটিয়েছেন, কারণ লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিষয়ীগত উপাদানটিকে যতটা প্রাধান্য দিয়েছেন, মার্কস-এঙ্গেলস তা করেননি। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, লেনিন মার্কস-এঙ্গেলস প্রবর্তিত সূত্রগুলির বিশ্লেষণ করেছিলেন নতুন পরিপ্রেক্ষিতে ও এ কথা আদৌ সত্য নয় যে, মার্কস-এঙ্গেলস বিষয়ীগত প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দেননি। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, ১৮৮৯ সালে ট্রিয়ার (Trier)-কে লিখিত একটি পত্রে এঙ্গেলস জানান যে, প্রলেতারিয়েতকে সংগ্রামে জয়ী হতে হলে তার

একটি নিজস্ব শ্রেণীসচেতন পার্টি গঠন করা অত্যন্ত প্রয়োজন—যে কথা তিনি ও মার্কস ১৮৪৭ সাল থেকে বলে আসছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, রোজার গারুদি (Roger Garaudy)-র মত তাত্ত্বিকরা বলেন যে, পার্টির মাধ্যমে ব্যক্তির চিন্তার জগতে শ্রেণীসচেতনতা প্রতিষ্ঠা করার নীতি অসমর্থনযোগ্য। তিনি মনে করেন যে, কমিউনিস্ট পার্টির বদলে পার্টিনিরপেক্ষ বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমেই জনগণ তাদের আশাআকাঙ্খার বাস্তব রূপ দান করতে পারে। অর্থাৎ, তাঁর মতে, পার্টির ভূমিকা স্বতঃস্ফূর্ততাকে ধ্বংস করে দেয়। এর উত্তরে বলা যায় যে, এক, লেনিন নিজেই এ কথা বলেছেন যে, স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাকে সচেতনভাবে সংগঠিত রূপ দেবার প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে যায়, নতুবা নিছক স্বতঃস্ফূর্ততা নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রনের অভাবে সৃষ্টিশীলতার পরিবর্তে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দুই, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এ কথাই বলে যে, প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম তখনই প্রকৃত অর্থে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে যখন তা পরিচালিত হয়েছে শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টির নিয়ন্ত্রণে। গারুদি প্রমুখের বক্তব্য হল যে, গণসংগঠনগুলি পার্টির নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা উচিত, নতুবা তাদের নিজস্ব কার্যকারিতা হ্রাস পায়। প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় যুক্তি যে কতটা অসার তা আজকের দিনের পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। যেমন, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের মাধ্যমে যে ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়, তার পিছনে মূল চালিকা-শক্তি রূপে কাজ করে এই দেশগুলির অত্যন্ত শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টিগুলি।

তৃতীয়তঃ, মারশেল লীব্‌ম্যান (Marcel Libman) প্রমুখেরা মনে করেন যে, পার্টির প্রশ্নে লেনিনের তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক নীতিগুলি প্রধানতঃ রুশ-দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য ছিল, যার মাধ্যমে লেনিন মার্কসবাদের "রুশতীকরণ" (Russification) ঘটিয়েছেন,—অর্থাৎ এর কোন সর্বজনীন গুরুত্ব নেই। এই জাতীয় যুক্তির সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা কিন্তু একেবারেই মেলে না। লেনিন নির্দেশিত নীতিগুলিই পৃথিবীর সব দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্বদান-কারী পার্টিগুলি অনুসরণ করে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামকে পরিচালনা করছে। অবশ্যই স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই নীতি অনুসরণের প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন উপাদান সংযোজিত হচ্ছে এবং লেনিনবাদের সঙ্গে তার কোন বিরোধ নেই।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ধারণার মত পার্টির প্রশ্নেও লেনিনবাদের বিরোধীরা অত্যন্ত সোচ্চার। কিন্তু ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এ কথাই বলে যে, প্রতিটি প্রশ্নে লেনিনের অবদান যথার্থ মৌলিকত্বের দাবি রাখে। এই প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে লেনিনবাদী ব্যাখ্যা মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

পার্টি প্রসঙ্গে লেনিনবাদী তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করলে এ কথা মনে হতে পারে যে, লেনিন কেবলমাত্র পার্টির সাংগঠনিক দিক্‌টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। প্রশ্নটি তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, অনেক পশ্চিমী মার্কসবাদ বিশেষজ্ঞ মনে করেন, লেনিন পার্টিতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পার্টির সামাজিক ভিত্তি যে শ্রমিকশ্রেণী, তার স্বার্থের প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করেছেন; পক্ষান্তরে মার্কসের কাছে মূল প্রশ্নটি ছিল শ্রমিকশ্রেণীকে আত্মসচেতন শ্রেণীতে (class for itself) রূপান্তরিত করা ও তার শ্রেণী অস্তিত্বকে চিহ্নিত করা। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী, পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ পরস্পরবিরোধী দু'টি ধারণা এবং তার পরিণতিতে মার্কস ও লেনিনের বক্তব্যও পারস্পরিক বিরোধিতা দোষে দুষ্ট। এই বক্তব্যের প্রবক্তাদের মতে মার্কসের কাছে মূল বিচার্য বিষয়টি ছিল শ্রমিকশ্রেণী, কারণ পার্টি সংগঠনের ছত্রছায়ায় সাংগঠনিক স্বার্থের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থের সাযুজ্য প্রতিষ্ঠা করা কঠিন, অপরদিকে লেনিনের দৃষ্টিতে সংগঠনের প্রশ্নটিই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাঁর মতে পার্টিনিরপেক্ষভাবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে রক্ষা করা যায় না।

একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে শ্রেণী বনাম পার্টি বা মার্কস বনাম লেনিন,—এই জাতীয় প্রতিবেদন সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্ত। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে মার্কসের চিন্তায় শ্রেণী ও লেনিনের আলোচনায় পার্টি আপেক্ষিকভাবে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মার্কস ও লেনিনের মতামত পরস্পরবিরোধী। উনবিংশ শতাব্দীর যে সময়ে মার্কস তাঁর বিশ্লেষণে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই পর্বে ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি ছিল ইতিহাসে তাঁর শ্রেণীস্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। অপরদিকে আসন্ন রুশ বিপ্লবের পটভূমিকায় লেনিনের কাছে প্রধান প্রশ্নটি ছিল যথার্থ একটি পার্টির সংগঠিত নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবকে পরিচালনা করা একাধিক সংগ্রামের মাধ্যমে ইতিহাসে শ্রমিকশ্রেণী তার মর্যাদা ও

স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা করতে ইতিমধ্যে সক্ষম হয়েছিল বলেই লেনিন পার্টি সংগঠনের প্রশ্নটিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে অভূতপূর্ব দমনপীড়ন ও সন্ত্রাসের আবহাওয়ার মধ্যে লেনিনকে শ্রমিক-শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রশ্নটিকে অনুধাবন করতে হয়েছিল, সেই পরি-স্থিতিতে সংগঠিত পার্টিনেতৃত্ব ছাড়া রুশ শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তাই তত্ত্বগত বিচারে মার্কসবাদ শ্রেণী ও পার্টির মধ্যে কোন বিরোধকে স্বীকার করে না।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সামগ্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, সে সম্পর্কে লেনিন অবহিত ছিলেন না। বরং লেনিন এই জটিলতা সম্পর্কে বিশেষ-ভাবেই সচেতন ছিলেন এবং তাঁর বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা আজও অম্লান রয়ে গেছে। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির মূল ভিত্তিটি হল শ্রমিকশ্রেণী. তাই লেনিন বারে বারেই বলেছেন যে পার্টি নেতৃত্বের কর্তব্য হল শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপকতম অংশের সঙ্গে নিবিড়তম যোগাযোগ রক্ষা করা, অন্যথায় পার্টির পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর আশা আকাঙ্ক্ষার নিত্যদিনের শরিক হয়ে সঠিকভাবে বিপ্লবকে পরিচালনা করা বা বিপ্লবোত্তর পর্বে সমাজতন্ত্রের বলিষ্ঠ গণভিত্তি প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। সার্বিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হলে বা এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে পার্টি নেতৃত্ব যথেষ্ট সচেতন না থাকলে শ্রেণী ও পার্টির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী এবং তার পরিণতিতে পার্টির অভ্যন্তরে, বিশেষতঃ নেতৃত্বের স্তরে, মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের অনু-প্রবেশ ঘটতে বাধ্য। এই ধরনের পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর সামগ্রিক সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে পার্টিনেতৃত্বের কায়েমী স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকৃতি প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। ট্রটস্কি একেই বলেছিলেন প্রতিকল্পবাদ (substitutism) এবং লেনিন তাঁর একাধিক রচনায় এই ধরনের সম্ভাবনা সৃষ্টির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন।

পার্টির সাংগঠনিক নেতৃত্ব এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করতে লেনিন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর একান্ত নিজস্ব গণসংগঠন সোভিয়েতগুলির সক্রিয় ভূমিকার ওপরে। লেনিনের বক্তব্য ছিল,

সোভিয়েতের সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমেই শ্রমিকশ্রেণী সার্বিকভাবে পার্টির সঙ্গে অন্বিত হবার পথ করে নেয় এবং এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ভিত্তি। তাই লেনিন চেয়েছিলেন সোভিয়েতগুলির ব্যাপকতম ও সার্থকতম প্রসার এবং তাঁর ছিল এই গভীর প্রত্যয় যে সোভিয়েতগুলির সক্রিয় কার্যকলাপের মাধ্যমে পার্টির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বিমুখী সম্পর্কটি সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। রুশ বিপ্লবের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিবিপ্লবী শক্তিবেষ্টিত রাশিয়াতে রাজনৈতিক স্থায়িত্বের প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং সেই কারণে এই পর্বে লেনিনকে পার্টির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক ঐক্যকে সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় করার প্রশ্নটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়েছিল। একান্ত ঐতিহাসিক কারণে এই পর্বে লেনিনের পক্ষে তাঁর তাত্ত্বিক প্রত্যয় সত্ত্বেও সোভিয়েত গণতন্ত্রের সম্প্রসারণকে ব্যাপকতম রূপ দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। বিপ্লবের স্থায়িত্ব যেখানে অনিশ্চিত, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতায় টিঁকে থাকার প্রশ্নটি যেই পর্বে ছিল সংকটাপন্ন, সেই পরিস্থিতিতে পার্টির সংগঠন ও ঐক্যের প্রশ্নটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হতে বাধ্য ছিল।

যে বিষয়টি এখানে উল্লেখযোগ্য সেটি হল যে, লেনিনোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক বনিয়াদ সুনিশ্চিত হবার পরেও কিন্তু সোভিয়েতগুলির সক্রিয় ভূমিকাকে সুনিশ্চিত করার প্রক্রিয়াটি আশানুরূপ-ভাবে ব্যাপকতা লাভ করেনি। রাজনৈতিক স্থায়িত্বের বিষয়টিকে বড় করে দেখতে গিয়ে অনেক সময়েই পার্টির নিয়ামক ভূমিকাকে গুরুত্ব দেবার নামে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে পার্টির সার্বিক ও ঘনিষ্ঠ সংযোগের প্রশ্নটি উপেক্ষিত হয়েছে এবং যথেষ্ট গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়েছে শ্রেণী ও পার্টির পারস্পরিক অন্বয়ের সম্পর্কটি। আজ একথা অনস্বীকার্য যে সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিনপর্বের বিশেষ একটি সময়ে এই প্রবণতা যে ব্যাপ্তি লাভ করে, তার পরিণতিতে পরবর্তীকালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনব্যবস্থার অনেক ক্ষেত্রে একাধারে কায়েমী স্বার্থ ও আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা যেমন পুষ্টিলাভ করেছে, তেমনি আবার খর্ব হয়েছে গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া। আশার কথা যে বর্তমান সোভিয়েত নেতৃত্ব এই বিয়টির তাৎপর্যকে উপলব্ধি করে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে পার্টি নেতৃত্বের যোগাযোগকে ঘনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় করতে সর্বতোভাবে প্রয়াসী হয়েছেন।

নবম অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন প্রসঙ্গে লেনিনের তত্ত্ব

॥ ১ ॥

সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে লেনিনের তত্ত্বের পটভূমিকা

মার্কস-এঙ্গেলস পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরি-প্রেক্ষিতে ধনতন্ত্রের পতনের ঐতিহাসিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী প্রতিষ্ঠাকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। বিংশ শতকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে, তার বাস্তবসম্মত ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন লেনিন এবং এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মার্কসীয় ব্যাখ্যায় নতুন সংযোজন সাধিত হয়। এই বিশ্লেষণের ওপরে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে বহুল পরিচিত সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত লেনিনের তত্ত্ব। লেনিনের এই তত্ত্ব যেহেতু পুঁজিবাদ সম্পর্কে মার্কসের অর্থনীতিক আলোচনার পরিবর্ধন, সেহেতু সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস বর্ণিত আদি ব্যাখ্যাটির আলোচনা প্রথমে করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, প্রচলিত অর্থে সাম্রাজ্যবাদ বলতে যা বোঝায় তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে মার্কস-এঙ্গেলস এই ধারণাটিকে ব্যবহার করেছিলেন। সাধারণতঃ অনগ্রসর একটি দেশের ওপরে শিল্পোন্নত অপর একটি দেশের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে সাম্রাজ্যবাদ বলে চিহ্নিত করা হয়। মার্কস-এঙ্গেলস সাম্রাজ্যবাদকে এই সঙ্কীর্ণ পরিসরে একটি "বিশুদ্ধ" রাজনৈতিক ধারণারূপে দেখেননি। তাঁদের চোখে সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজি-বাদের অর্থনীতিক সম্প্রসারণের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি, যা প্রকাশ পায় একটি অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের অপর একটি দেশের ওপরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস যে অর্থনীতিক ব্যাখ্যার অবতারণা করেন, লেনিনের তত্ত্বের সেটিই ছিল মূল ভিত্তি। মার্কস-এঙ্গেলস যদিও সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে কোনও একটি সুবিন্যস্ত তত্ত্ব রেখে যাননি, উৎ-

পাদিকা শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী অর্থনীতির দ্রুত সম্প্রসারণের যে ব্যাখ্যা তাঁরা করে গেছেন, সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যার সেটি হল প্রথম ধাপ। শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপ ও আমেরিকাতে ধনতন্ত্রের প্রসার অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় ও তার ফলে পুঁজিপতিদের সামনে অধিকতর মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বিপুলভাবে বেড়ে যায়। পুঁজিবাদের এই সম্প্রসারণকে মার্কস-এঙ্গেলস যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, টম কেম্প্ (Tom Kemp) তাকে তিনটি সূত্রের আকারে উপস্থাপিত করেছেন।[1]

প্রথম সূত্র ঃ পুনরুৎপাদন (reproduction) তত্ত্ব, যেটি বিশ্লেষিত হয়েছে 'ক্যাপিটাল', দ্বিতীয় খণ্ডে। পুঁজিবাদ বেঁচে থাকে পুঁজিবৃদ্ধির সহায়তা করে, অর্থাৎ, পুঁজিপতি শ্রমিককে তার ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে শ্রমের যে উদ্বৃত্ত মূল্যটি আত্মসাৎ করে, তার একাংশ তাকে নিয়োগ করতে হয় উৎপাদনব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখতে, ব্যবসার জন্য সংগৃহীত ঋণ শোধ করতে, সরকারকে কর দিতে ও বাকি অংশটিকে সে নিয়োগ করতে সচেষ্ট হয় নতুন পুঁজি সৃষ্টি করতে, কারণ একমাত্র পুঁজির উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পুঁজিকে ধনতান্ত্রিক সমাজের অসম প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠা দিতে পারে। কিন্তু উদ্বৃত্ত মূল্যের পুঁজিতে রূপান্তরের সাফল্য নির্ভর করে পুঁজির উপযুক্ত বাজারের ওপরে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিরা পুঁজির বিনিয়োগের ক্ষেত্ররূপে বিভিন্ন দেশের বাজার দখলের চেষ্টায় রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এরই ফলে একটি পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গে আর একটি পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে বাজার দখলের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিরসন হয় একটি দেশের অপর একটি দেশের ওপরে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ মুনাফার হার নিম্নগামী হবার ঝোঁক, যেটি আলোচিত হয়েছে 'ক্যাপিটাল', তৃতীয় খণ্ডে। মার্কসের বক্তব্য হল যে, উৎপাদনকে ক্রমাগত উন্নত করার জন্য প্রযুক্তিবিদ্যাগত কৌশলকে যেহেতু উত্তরোত্তর

---

1. Tom Kemp, 'The Marxist Theory of Imperialism', in Roger Owen & Bob Sutcliffe (eds), *Studies in the Theory of Imperialism.*

প্রয়োগ করতে হয়, সেহেতু উৎপাদনব্যবস্থার সংরক্ষণ বাবদ খরচ ক্রমশই বাড়তে থাকে ও তার ফলে মুনাফার হার নিম্নগামী হবার প্রবণতা দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই এই ঝোঁককে প্রতিহত করার জন্য বৃহৎ পুঁজিপতিরা পুঁজির বিনিয়োগের জন্য এমন ধরনের বাজারের সন্ধান করে যাতে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বলপূর্বক এই বাজার দখল করে মুনাফার ক্ষেত্রে এই লোকসানকে তারা পুষিয়ে নিতে পারে।

তৃতীয় সূত্র: পুঁজির একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ। 'ক্যাপিটাল', প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডে ও Anti-Duehring-এ মার্কস ও এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, পুঁজিবাদের সম্প্রসারণের ফলে কিভাবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের বাজারগুলি মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতি এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এই একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ গোটা বিশ্বের পণ্যের বাজারে প্রতিফলিত হয় ও তার ফলে এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজিপতিদের বাজার থেকে হটিয়ে দিয়ে তাদের পণ্যের বাজারকে করায়ত্ত করে গোটা দেশের অর্থনীতিকে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনে আর এভাবেই সৃষ্টি হয় সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি।

মার্কস-এঙ্গেলসের এই আলোচনার সূত্র ধরে লেনিন তাঁর সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। ১৯১৬ সালে লেনিন তাঁর Imperialism—The highest Stage of Capitalism গ্রন্থে এই তত্ত্বের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থটি রচনার অনেক আগে থেকেই লেনিন সাম্রাজ্যবাদের আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। ১৯১২ সালে 'প্রাভদা' পত্রিকায় প্রকাশিত Concentration of Production in Russia এবং The Results and Significance of the US Presidential Elections শীর্ষক দু'টি প্রবন্ধে লেনিন দেখান যে, পুঁজির কেন্দ্রীকরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব ও এর ফলে সৃষ্ট হয় কারটেল (Cartel) ও ট্রাস্টব্যবস্থা (Trust)। ১৯১৪ সালে রচিত The Position and Tasks of the Socialist International প্রবন্ধে লেনিন দেখান যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের বাজার দখলের অসম প্রতিযোগিতা থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি। এর পর Imperialism গ্রন্থটি রচনার পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে লেনিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করেন, সেগুলিকে তিনি একত্রিত করেন তাঁর Notebooks on Imperialism-এ। সেখানে দেখা যায় যে লেনিন এই গবেষণা-

সংক্রান্ত মালমশলা ১৪৮টি বই ও ৪৯টি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ২৩২টি প্রবন্ধ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এই খসড়া নোটগুলি অনুধাবন করলে দেখা যায় পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে তিনি যে তত্ত্বের অবতারণা করেন সেটি ছিল কি বিপুল গবেষণার ফলশ্রুতি।

মার্কস-এঙ্গেলসের মত লেনিনকেও চিন্তার জগতে একাধিক প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে লেনিনকে মূলতঃ তিনটি ভিন্ন ধরনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সমালোচনা করতে হয়েছিল।

(ক) কার্ল কাউট্‌সকির তত্ত্ব : তৎকালীন জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অন্যতম নেতা কার্ল কাউট্‌সকি সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যে তত্ত্বটি উপস্থাপিত করেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে সেটি যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল ও স্বাভাবিক কারণেই লেনিনকে এই তত্ত্বের তীব্র বিরোধিতা করতে হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, সাম্রাজ্যবাদ হল শিল্পোন্নত পুঁজিবাদের অভিব্যক্তি, যা প্রকাশ পায় একটি উন্নত পুঁজিবাদী দেশের অপর একটি কৃষি-প্রধান দেশের ওপরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কাউট্‌সকির এই ব্যাখ্যা থেকে একাধিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। প্রথমতঃ, এই বক্তব্য অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ হল একটি শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশের আগ্রাসী নীতি মাত্র। সাম্রাজ্যবাদ যে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক বিকাশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদ যে মূলতঃ একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক রূপ, সেই বিশ্লেষণ কাউট্‌সকির চিন্তায় অনুপস্থিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদের অর্থ দাঁড়ায় অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশের ওপরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। এই চিন্তা ছিল সম্পূর্ণ ভুল, কারণ প্রায়শঃই একটি শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশ তদনুরূপ একটি দেশের ওপরে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয় এবং এভাবেই বিভিন্ন শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশের অন্তর্দ্বন্দ্ব আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী বিরোধের রূপ নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, লেনিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ছিল এই অন্তর্দ্বন্দ্বেরই ফলশ্রুতি। তৃতীয়তঃ, কাউট্‌সকির বক্তব্য অতি-সাম্রাজ্যবাদ (ultra-imperialism) তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিল। তাঁর মতে পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পুঁজির সম্ভার মিলে একটি অছিব্যবস্থার (Trust) সৃষ্টি হবে ও তার ফলে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের নিরসন হয়ে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের অবসান ঘটে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। লেনিন এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন

যে, এই তত্ত্ব যে শুধু উদ্ভট তাই নয়,—এই তত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদকে সুরক্ষিত করে পুঁজিবাদ সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি করে ও প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীচেতনাকে পঙ্গু করে দেয়।

(খ) রুডল্‌ফ হিলফারডিং (Rudolf Hilferding)-এর তত্ত্ব: অষ্ট্রিয়ান স্কুলের অন্তর্গত হিলফারডিং-এর সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তত্ত্বটি ছিল সংস্কারপন্থী ভাবনা-চিন্তায় আচ্ছন্ন। তাঁর Finance Capital (১৯০৯) গ্রন্থে তিনি বলেন যে, কোন ধরনের সঙ্কট ছাড়াই পুঁজিবাদের উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটবে ও তার ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থাকে যদি সঠিকভাবে সংগঠিত করা যায়, তবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি সঙ্কটাপন্ন হবে না। তাঁর মতে, এই অবস্থায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রেখেই শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ক্ষমতায় আসা সম্ভব-পর হবে। পুঁজিবাদের বিকাশ যে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দেয় ও তার ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব যে এক অভূতপূর্ব সঙ্কটের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে ও তার পরিণতিতে যে সৃষ্ট হয় সাম্রাজ্যবাদ, হিলফারডিং ছিলেন লেনিনের এই তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। হিলফারডিং-এর সংস্কারপন্থী ধারণার ভিত্তিটি ছিল এই যে, উৎপাদনব্যবস্থার সামাজিকীকরণ ঘটিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পুঁজিতান্ত্রিক দিকগুলিকে অনেকখানি খর্ব করা যায় ও তার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে পুঁজিবাদের সরাসরি বিরোধিতা না করে শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতায় আসা সম্ভব।

(গ) রোজা লুকসেমবুর্গ (Rosa Luxemburg)-এর তত্ত্ব: কাউট্‌সকি ও হিলফারডিং যেমন সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে মূলতঃ সংস্কারধর্মী ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন, তেমনি আবার অতি-বামপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্রাজ্যবাদের ধারণাটির বিশ্লেষণ করেছিলেন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রোজা লুকসেমবুর্গ। লেনিন তাঁর বিপ্লবী নিষ্ঠার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হলেও সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। রোজা লুকসেমবুর্গ তাঁর The Accumulation of Capital (১৯১৩) গ্রন্থে দেখান যে, উদ্বৃত্ত মূল্যের বাস্তব রূপায়নের জন্য পুঁজিপতিদের যেহেতু অ-পুঁজিবাদী ক্ষেত্রের প্রয়োজন, সেহেতু পুঁজির বিনিয়োগের স্বার্থে পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব দেখা দেবে; এই দ্বন্দ্বের পরিণতিতে অ-পুঁজিবাদী ক্ষেত্রগুলি মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণে এসে দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাবে ও তার ফলে এই দ্বন্দ্বও গভীরভাবে প্রকট হয়ে উঠবে। এর পরিণতিতে

সৃষ্টি হবে পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের এক চরম সংকট যার ফলে প্রলেতারিয়েতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে।

॥ ২ ॥

সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে লেনিনের তত্ত্ব

লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বশেষ স্তররূপে অভিহিত করে এর তিনটি প্রধান চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি দিক্ নির্দেশ করেছেন। এগুলি হল : (ক) সাম্রাজ্যবাদ হল একচেটিয়া পুঁজিবাদ ; (খ) সাম্রাজ্যবাদ হল ক্ষয়িষ্ণু, পরগাছা পুঁজিবাদ ; (গ) সাম্রাজ্যবাদ হল মুমূর্ষু পুঁজিবাদ।

(ক) **সাম্রাজ্যবাদ হল একচেটিয়া পুঁজিবাদ :** যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের একচেটিয়া স্তরে উত্তরণের অভিব্যক্তি, সেহেতু লেনিন এই স্তরের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, পুঁজির কেন্দ্রীকরণ এমন একটি স্তরে পৌঁছয় যে এর ফলে সৃষ্টি হয় একচেটিয়া কারবার যা গোটা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। লেনিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বৃহৎ সংস্থাগুলি বাজার দখল করে প্রতিযোগীদের হটিয়ে দিয়ে এবং নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিয়ে উৎপাদিত পণ্যের মূল্যকে নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত করে। এভাবে দু'টি কি তিনটি সংস্থা, যেগুলি দেশের শিল্পের সিংহভাগ উৎপাদন করে, একজোট হয়ে যখন পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে, তাকে বলা হয় একচেটিয়াকরণ। একচেটিয়া কারবারের দু'টি প্রধান রূপ হল কারটেল ও ট্রাস্ট। কারটেল বলতে বোঝায় কতকগুলি বৃহৎ পুঁজিবাদী সংস্থার মধ্যে এমন ধরনের বোঝাপড়া যে তারাই সমগ্র বাজারকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিয়ে পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ, বিক্রয়ের শর্ত, মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি স্থির করে। এর ফলে কার্টেলে অংশগ্রহণকারীরা প্রতিযোগিতাকে সীমাবদ্ধ রেখে বড় দরের মুনাফা অর্জন করে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্মানীতে কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে কার্টেলের প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। অপরদিকে ট্রাস্টের ক্ষেত্রে উৎপাদনের ব্যাপারে সংস্থাগুলির নিজস্ব স্বাধীনতা থাকে না ; ট্রাস্টই সামগ্রিকভাবে পণ্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও আর্থিক লেনদেনকে নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একচেটিয়া পুঁজির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এই ট্রাস্টকে কেন্দ্র করে। সেখানে কয়েকটি শিল্প সংস্থার অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সম্প্রসারণ, ছোট ছোট

কোম্পানিগুলির একত্রীকরণ প্রভৃতির ফলে ১৮৯৮-১৯০৩ সালে একাধিক শক্তিশালী ট্রাস্ট গড়ে ওঠে। তারই ফলশ্রুতি মরগ্যান (Morgan)-এর U. S. Steel Corporation, রকফেলার (Rockfeller)-এর Standard Oil প্রভৃতি। ১৯১২ সালে লেনিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া পুঁজি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন যে, আমেরিকার সমগ্র জাতীয় সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ করে এই দু'টি ট্রাস্ট।

এই বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমতঃ, যে কোন দেশে একচেটিয়া পুঁজির একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলেও অ-একচেটিয়া পুঁজির কিছু অংশ অবশিষ্ট থেকে যায়। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা উচ্চ হারে মুনাফা লাভের আশায় উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এমনভাবে করে যাতে সেটি অ-একচেটিয়াদের লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে একচেটিয়া ও অ-একচেটিয়াদের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠে পুঁজিবাদের সংকট সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন একচেটিয়া গোষ্ঠীর মধ্যেও দ্বন্দ্ব সূচিত হয়। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, কোন একটি শিল্প সম্পূর্ণ এককভাবে একটি একচেটিয়া গোষ্ঠীর করায়ত্ত হয় না। ফলে প্রতিযোগী বিভিন্ন একচেটিয়া গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে যা শেষ পর্যন্ত কয়েকটি গোষ্ঠীর জয় ও অপর গোষ্ঠীগুলির পরাজয় সূচিত করে। তৃতীয়তঃ, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের একটি গোষ্ঠীর মধ্যেই বিভিন্ন সদস্যের স্বার্থের সংঘাত একচেটিয়া পুঁজির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উৎপাদনের শেয়ারের লভ্যাংশ, মুনাফা, বিভিন্ন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণস্থানে অধিষ্ঠান প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে সদস্যদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। এগুলি সবই একচেটিয়া পুঁজিবাদের গভীর সংকটের দিক্‌চিহ্ন।

লেনিনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী একচেটিয়া পুঁজির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক-পুঁজির কেন্দ্রীকরণ। একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকব্যবস্থারও প্রসার ঘটতে থাকে ও তার ফলে অচিরেই ব্যাকশিল্পের নিয়ন্ত্রণেও একচেটিয়াদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ব্যাংকপুঁজিকে নিয়ন্ত্রণ করে যে বড বড় শিল্পপতিরা, তারা গোটা দেশের অর্থনীতিকে একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ও তার পরিণতিতে একচেটিয়া শিল্পপতিদের শিল্পপুঁজি ও ব্যাংকারদের ব্যাংক-পুঁজির মিলনের মধ্য দিয়ে গোটা দেশের অর্থব্যবস্থায় একচেটিয়াদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয়তঃ, একচেটিয়া পুঁজির দৌলতে বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশে যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি সঞ্চিত হয়, তাকে নতুন বাজার লাভের আশায় বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হয়। এর ফলে একটি শিল্পোন্নত দেশ অপর একটি দেশের বাজারকে করায়ত্ত করে সেই দেশের ওপরে অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। সাধারণতঃ যেহেতু অনুন্নত দেশগুলিতে মজুরি ও জমির দাম কম, সেহেতু সেই দেশগুলিতেই প্রধানতঃ পুঁজি রপ্তানী হয়ে থাকে। পুঁজির রপ্তানী হল সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার। এর ফলে একটি দেশের শ্রমজীবী মানুষ যে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করে, তাকে আত্মসাৎ করা হয় পুঁজির রপ্তানীর মাধ্যমে বড় অংকের মুনাফা অর্জন করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুনাফার ৪৮ শতাংশ এসেছিল জাপান বাদে দূর প্রাচ্য, মধ্য প্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে। তার অর্থ এই নয় যে, পুঁজির রপ্তানী শুধুমাত্র অনুন্নত দেশগুলিতেই করা হয়ে থাকে। ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান, ইতালির মত দেশেও মার্কিন পুঁজি রপ্তানী করা হয় যার অন্যতম পরিণতি হল এই দেশগুলির মার্কিন পুঁজির ওপরে নির্ভরতা। এর ফলে একচেটিয়া পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে বিরোধও তীব্র আকার ধারণ করে।

চতুর্থতঃ, পুঁজির রপ্তানী ও বাজার দখলের প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে আঁতাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় বোঝাপড়া হয় বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে বাজার বন্টন, মূল্য নীতি, উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে। সমষ্টিগত স্বার্থে এই আঁতাত হলেও শেষ পর্যন্ত তা স্থায়ী হয় না, কারণ মুনাফার স্বার্থে পুঁজিপতিদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব অচিরেই আত্মপ্রকাশ করে।

পঞ্চমতঃ, গোটা বিশ্বের বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় একচেটিয়া পুঁজিপতি-দের কাছে প্রয়োজন দেখা দেয় রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার, কারণ তার ফলেই সেই দেশের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করাটি সুনিশ্চিত করা যায়। সে কারণেই দেখা যায় যে, ১৮৭৬ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলি তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের ক্ষেত্র ২৫ লক্ষ বর্গমাইল বাড়িয়ে ফেলে। লেনিন একেই বলেছেন গোটা

পৃথিবীকে বিভিন্ন অঞ্চলের ভিত্তিতে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেবার সাম্রাজ্য-বাদী নীতি।

(খ) **সাম্রাজ্যবাদ হল ক্ষয়িষ্ণু বা পরগাছা পুঁজিবাদ ঃ** লেনিনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের এক চূড়ান্ত রূপ। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের বহিঃপ্রকাশকে কয়েকটি দিক্ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, লেনিন দেখিয়েছেন যে, একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের ফলে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটলেও সামগ্রিকভাবে তার অগ্রগতি ব্যাহত হয়, যার ফলে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। উৎপাদনের প্রয়োজনে প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি ঘটলেও যেহেতু উৎপাদনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে মুষ্টিমেয় কিছু একচেটিয়া পুঁজিপতি, সেহেতু প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশকে শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করা হয় মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদেব মুনাফাবৃদ্ধির স্বার্থে। এর ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলকে সমাজের প্রয়োজনে, সাধারণ মানুষেব বৃহত্তর স্বার্থে ব্যবহার না করে সচেতনভাবে তাকে প্রয়োগ করা হয় মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির স্বার্থে ও এব পরিণতিতে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ সামগ্রিকভাবে ব্যহত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা অন্য দেশের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে ও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং এর ফলে তারা যে অবিশ্বাস্য পরিমাণ মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায় তাকে কেন্দ্র করে এদের জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে ব্যভিচার, অনাচার ও ভোগবিলাসমুখী। লেনিন এই কারণেই এদেরকে পরগাছা আখ্যা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ দেশে ও বিদেশে একচেটিয়া পুঁজির শাসনকে কায়েম রাখার জন্য রাষ্ট্রের দমনমূলক বিভাগগুলিকে পুষ্ট করে। এভাবেই সাম্রাজ্যবাদী নীতি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চরম দমনমূলক ও পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে যুদ্ধবাজ নীতিতে পরিণত হয়।

তৃতীয়তঃ, একচেটিয়া পুঁজিবাদ শিল্পোন্নত দেশগুলিতে অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে শ্রমিকশ্রেণীর এক অংশকে শ্রমিক স্বার্থের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে প্ররোচিত করে। তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সমস্ত রকমের ধর্মঘট ও শ্রেণীসংগ্রামে অসহযোগিতা করা ও শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করে পুঁজিবাদের প্রতি সমর্থন জানান।

চতুর্থতঃ, একচেটিয়া পুঁজিবাদ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বিপন্ন বোধ করলে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়। এভাবেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়, যেমনটি হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীতে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে তাই প্রায়শঃই দেখা যায় যে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, শ্রমিক আন্দোলন ও অন্যান্য প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর দমনপীডনের নীতি অনুসৃত হয়। সাম্রাজ্যবাদী নীতি তাই শেষ বিচারে শান্তিবিরোধী, আগ্রাসী ও প্রতিক্রিয়াশীল হতে বাধ্য।

(গ) **সাম্রাজ্যবাদ হল মুমূর্ষু পুঁজিবাদ ঃ** একাধিক কারণে লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে মুমূর্ষু পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বের স্তররূপে বর্ণনা করেছিলেন। প্রথমতঃ, সীমিত হলেও একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তির যে অগ্রগতি ঘটে, তা সমাজতন্ত্রের পূর্বশর্তরূপে কাজ করে। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান। একচেটিয়া পুঁজি মুনাফার স্বার্থে প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করলেও বিষয়গতভাবে তা ভবিষ্যৎ সমাজের ভিত্তি রচনা করতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া পুঁজিবাদের সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদের ভিতকে দুর্বল করে সমাজতন্ত্রের পথকে প্রশস্ত করে। সাম্রাজ্যবাদ কবলিত শোষিত জনগণের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বন্দ্ব, বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্থায়িত্বকে ক্রমশঃ সংকটাপন্ন ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনাকে ক্রমশঃ উজ্জ্বল করে তোলে। তৃতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে অসমভাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ১৮৭০ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ৯ গুণ, জার্মানীতে ৬ গুণ, ফ্রান্সে ৩ গুণ ও ব্রিটেনে ২·২৫ গুণ। পুঁজির এই অসম বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বকে আরও তীব্র করে তোলে ও তার ফলে গোটা সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়াতে কোন কোন দেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। লেনিন এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের বিকাশের নিয়মেই যে দুর্বল ক্ষেত্রগুলি সৃষ্টি করে, সেগুলিই হয়ে দাঁড়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পীঠস্থান। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে

লেনিন গোটা ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুসম্পন্ন করার বাস্তবতাকে গুরুত্ব না দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতম অঞ্চলগুলিতে বা একটি মাত্র অঞ্চলেও বিপ্লব সম্পন্ন কবাকে প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। এইভাবেই সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতা একই সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজিবাদকে বিপন্ন করে তোলে ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পন্ন কবাব পূর্বশর্ত সৃষ্টি কবে।

॥ ৩ ॥

সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে লেনিনের তত্ত্বের মূল্যায়ন

সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত লেনিনের তত্ত্বকে পশ্চিমী সমালোচকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণ করেছেন ও সে কারণে লেনিনের বিশ্লেষণ একটি যথার্থ মূল্যায়নের দাবি রাখে। প্রথমতঃ, একথা বলা হয়ে থাকে যে, সাম্রাজ্যবাদ হল মূলতঃ একটি রাজনৈতিক ধারণা, যার সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। সাম্রাজ্যবাদ যে একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি, সাম্রাজ্যবাদ যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি নিরপেক্ষ কোন "বিশুদ্ধ" বাজনৈতিক অভীধা নয়, সে কথা এই মতের প্রবক্তারা স্বীকার করেন না। অতএব, এই সমালোচনা অনুসাবে লেনিনের বিশ্লেষণটি হল একপেশে, অর্থনীতিবাদে ও যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মবগেনথাউ (Morgenthau)-এব মতে সাম্রাজ্যবাদ হল স্থিতাবস্থা পরিবর্তন কবাব একটি নীতি মাত্র। ফরাসী ঐতিহাসিক ব্রুনশ্‌উইগ্‌ (Brunschwig) অভিযোগ করেছেন যে, লেনিন তাঁর বিশ্লেষণে অ-অর্থনৈতিক উপাদানগুলিকে কোন গুরুত্ব দেননি। আরিঘি (Arrighi) বলেছেন যে, লেনিনের আলোচনায় একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ সমার্থক ও উভয়ের মধ্যে কোন ধারণাগত পার্থক্য করা হয়নি। এম. ল্যাজারাস (M. Lazarus), ই. এ. ওয়ালকার (E. A. Walker) প্রমুখের মতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে সাম্রাজ্যবাদের দ্রুত বিস্তারের পিছনে একাধিক অ-অর্থনৈতিক কারণই ছিল প্রধানতঃ দায়ী। তাঁদের মতে এগুলি হল মানবিক, আদর্শগত, কৌশলগত কাবণ। এ. কোহেন (A. Cohen) আফ্রিকাকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দ্বন্দ্বকে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও

জার্মানীর পশ্চিম আফ্রিকাকে ভাগ বাঁটোয়ারা করার অন্যতম কারণ ছিল কূটনৈতিক ও ব্যবসায়িক রেষারেষি।

এই জাতীয় অ-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার তাৎপর্যটি সহজেই অনুমেয়। প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি একগুচ্ছ অ-অর্থনৈতিক কারণের কথা বলার উদ্দেশ্যটি হল একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কটিকে অস্বীকার করা, যাতে সাম্রাজ্যবাদের পিছনে যে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ লুকিয়ে থাকে, তাকে গোপন রাখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, একাধিক কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণকে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ অন্যান্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে অর্থনীতিক উদ্দেশ্যকে এক করে দেখা। অর্থনীতিক কারণই যে সাম্রাজ্যবাদের মূল ভিত্তি, সেটিকে এর ফলে কৌশলে অস্বীকার করা হয়।

লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত তত্ত্বের দ্বিতীয় সমালোচনাটি করা হয় পুঁজির রপ্তানী প্রসঙ্গে। ডি. কে. ফিল্ড্‌হাউস (D. K. Fieldhouse), ডব্ল্যু-রস্টো (W. Rostow), বি. ওয়ার্ড (B. Ward) প্রমুখেরা এই মত পোষণ করেন যে, পুঁজির রপ্তানীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে এক করে দেখাটা ভুল এঁদের মতে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকে পুঁজিবাদের যে প্রাচুর্যশীল বিকাশ হতে শুরু করে, তারই পরিণতিতে উদ্বৃত্ত পুঁজিকে রপ্তানী করার প্রবণতা দেখা দেয়। সেই সঙ্গে এ কথাও বলা হয় যে, অনুন্নত দেশগুলিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত করার অভিপ্রায়ে পুঁজির রপ্তানী করা হয়ে থাকে। বাস্তব অভিজ্ঞতা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির প্রতি যে নীতি অনুসরণ করছে সেদিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, পুঁজি রপ্তানীর প্রধান উদ্দেশ্য হল অনুন্নত দেশগুলির বাজার দখল করে, সস্তায় কাঁচামাল ও দেশীয় শ্রমিককে নিয়োগ করে, বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে আকাশচুম্বী মুনাফা অর্জন করা। তাই মুনাফা অর্জনের লালসাই পুঁজির রপ্তানীকে প্রণোদিত করে

লেনিনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে তৃতীয় আপত্তিটি করা হয় গোটা দুনিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। এ. হান্না (A. Hanna), ও. এইচ. টেলর (O. H. Taylor) প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে এই ভাগবাঁটোয়ারার কারণটি হল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-গুলির মধ্যে রাজনৈতিক রেষারেষি। এই যুক্তি অনুসারে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে অপর একটি

দেশের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় ও এইভাবে আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা পৃথিবীকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এই জাতীয় সমালোচনার মূল উদ্দেশ্যটি হল সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের পিছনে যে অর্থনীতিক কারণগুলি থাকে সেগুলিকে উপেক্ষা করা। এই প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য হল যে, একচেটিয়া পুঁজি ও ব্যাঙ্ক পুঁজির বিনিয়োগের জন্য একাধিক পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয় ও তারই পরিণতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি মুনাফা অর্জনের স্বার্থে গোটা দুনিয়াকে ভাগবাঁটোয়ারা করার আগ্রাসী নীতি অনু-সরণ করে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, অর্থনীতি নিরপেক্ষভাবে নিছক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানদণ্ডে এই ভাগবাঁটোয়ারার ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

পশ্চিমী তাত্ত্বিকরা লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত বক্তব্যকে অসাড় প্রমাণ করার জন্য আরও একটি যুক্তি উপস্থাপিত করেন। এইচ. লুথি (H. Luthy), বি. ক্রোজিয়ার (B. Crozier), ই. হাইনেমান (E. Heinemann) প্রমুখেরা মনে করেন যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপনিবেশগুলিতে কোন অর্থনৈতিক স্বার্থ ছিল না। তাঁরা বলেন যে, দু'টি বিশ্বযুদ্ধের ফলে অনেক দেশের কাছেই উপনিবেশগুলির প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ, একচেটিয়া পুঁজি বিনিয়োগের জন্য যে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের প্রয়োজন হয়েছিল, সেই ঘটনাকে এঁরা অস্বীকার করেন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে প্রাক্তন উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক তাৎপর্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কাছে বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায়নি। সে কারণেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই শক্তি-গুলি বিপুল পরিমাণে একচেটিয়া পুঁজি বিনিয়োগ করে সে দেশগুলির বাজার দখল করে পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সে কারণেই সদ্যস্বাধীন দেশগুলিকে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলার চেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বিশেষ সক্রিয় ও এটিই প্রমাণ করে সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে লেনিনের তথাকথিত "অর্থনৈতিক" ব্যাখ্যার সত্যতা।

॥ ৪ ॥

ঔপনিবেশিক প্রশ্ন প্রসঙ্গে লেনিনবাদী তত্ত্বের পটভূমিকা

লেনিন শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বরূপকে বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত হননি। সাম্রাজ্যবাদের মৃগয়াক্ষেত্র যে উপনিবেশগুলি,

তাদের মুক্তি কোন পথে হবে, অর্থাৎ, উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল মোচন করে অনুন্নত, দুর্বল দেশগুলি কোন পথে স্বাধীনতা অর্জন করবে, তার বিশ্লেষণও পাওয়া যাবে লেনিনের চিন্তায়। লেনিনের এই আলোচনা ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সংক্রান্ত মার্কস-এঙ্গেলস-এর বিশ্লেষণে সৃষ্টিশীল সংযোজনরূপে স্বীকৃত। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা গোড়া থেকেই এই অভিমত পোষণ করেন যে, পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রলেতারিয়েতের মুক্তির প্রশ্নটি নিপীড়িত দেশগুলির জনগণের ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই ১৮৫৩ সালে Revolution in China and in Europe প্রবন্ধে মার্কস লিখলেন যে, ইউরোপের জনগণের পরবর্তী অভ্যুত্থান অনেকাংশেই নির্ভর করবে চীনের সমকালীন ঘটনাবলীর ওপরে। এই সময়ে চীনে চলছিল ১৮৫১-৬৪-এর তাইপিং বিদ্রোহ, যেটি মহাকৃষক বিদ্রোহ নামে খ্যাত। চীনের এই বিদ্রোহ একই সঙ্গে ধাবিত হয়েছিল দেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা এবং ব্রিটিশ ও মার্কিন উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে, যারা চীনের শাসক-গোষ্ঠীকে বলপূর্বক "মুক্ত দ্বার" (Open Door) নীতি ঘোষণা করতে বাধ্য করে নিজেদের ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। মার্কস-এঙ্গেলস এই নীতির তীব্র সমালোচনা করে চীনের কৃষক সংগ্রামকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে-ছিলেন। একই সময়ে ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁরা গভীরভাবে সমর্থন করে-ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহকে মুষ্টিমেয় কিছু সিপাহীর হিংসাত্মক কার্যকলাপ রূপে আখ্যা দিয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রেস এই ঘটনার তাৎপর্যকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল। মার্কস-এঙ্গেলস-এর চোখে এই প্রতিবাদ ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের শোষিত মানুষের প্রথম বিদ্রোহ ও সে কারণেই তাঁরা ইংরেজের দমননীতির তীব্র নিন্দা করে এই ঘটনাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হবার পরে মার্কস-এঙ্গেলস সেখানেও নিপীড়িত, শোষিত উপনিবেশগুলির মুক্তি সংগ্রামের প্রশ্নে বারে বারেই সোচ্চার হয়েছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কস প্রথম আন্তর্জাতিকের একটি "গোপন নোটে" (Confidential Communication) আয়রল্যাণ্ডের জন-গণের মুক্তিসংগ্রামের প্রশ্নে বাকুনিনের দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে বলে-ছিলেন যে, কোন জাতি অপর একটি জাতিকে নিপীড়ন করলে নিজেকেই

নিজে শৃঙ্খলিত করে। লেনিন পরবর্তীকালে এই দৃষ্টান্তটিকে উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, আয়রল্যাণ্ড প্রশ্নে মার্কস-এঙ্গেলস-এর অনুসৃত নীতি প্রমাণ করে যে, একটি শোষণকারী দেশের প্রলেতারিয়েতের অপর একটি দেশের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি কি মনোভাব গ্রহণ করা উচিত। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস যে দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করেছিলেন, সেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম আন্তর্জাতিকে বাকুনিন যেমন জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কেই সন্দিহান ছিলেন, মার্কস-এঙ্গেলস প্রতিটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করেছিলেন তার ঐতিহাসিক মূল্য, তাৎপর্য ও সারবস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে, যাতে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ থেকে পৃথক করা যায়। ই. বার্ণষ্টাইন (E. Bernstein) এর কাছে লেখা একটি পত্রে ১৮৮২ সালে এঙ্গেলস বলেছিলেন যে, নিপীড়িত, শোষিত মানুষের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করে তাদের নানা ধরনের ভ্রান্ত ধারণা, মোহ ও সংস্কারকেও সমর্থন করাটা হবে অত্যন্ত বড় ভুল।

ঔপনিবেশিক প্রশ্নে মার্কস-এঙ্গেলস যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসা যায়। প্রথমতঃ, মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা উপনিবেশগুলির জনগণের মুক্তিসংগ্রামকে দেখেছিলেন শোষক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত করে ও সেই অর্থে ঔপনিবেশিক সংগ্রামকে তাঁরা সমর্থন জানিয়েছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলিকে সমর্থন করেননি। তাঁদের বিচারে যে কোন দেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম বিষয়গতভাবে শ্রেণীসংগ্রামে সহায়ক হলে সেটি অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। আবার এই আন্দোলনগুলিতে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানের উপস্থিতি সম্পর্কেও তাঁরা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।

মার্কস-এঙ্গেলস ঔপনিবেশিক প্রশ্নের আলোচনার রূপরেখাটি প্রস্তুত করেছিলেন। লেনিন এই ব্যাখ্যার সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। সাধারণ-ভাবে ঔপনিবেশিক প্রশ্নে লেনিনের আগ্রহকে একাধিক পশ্চিমী তাত্ত্বিক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। সেটন-ওয়াটসন (Seton-Watson), ব্রানকো লাজিচ্ ও এম. এম. ড্রাকোভিচ্ (Branko Lazitch and M. M. Drachkovitch) প্রমুখেরা মনে করেন যে, ঔপনিবেশিক প্রশ্ন

সম্পর্কে প্রথম দিকে লেনিনের কোন সচেতনতা ছিল না। অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পরে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যাবার ফলে লেনিনের পশ্চিম ইউরোপ সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটে ও তিনি প্রাচ্যের উপনিবেশগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তার অর্থ এই যে, ঔপনিবেশিক প্রশ্নে লেনিনের আগ্রহ ছিল একান্তই তাৎক্ষণিক ও সাময়িক।

এই যুক্তির সারবত্তা যে একেবারেই নেই সেটি লেনিনের প্রাক্ অক্টোবর পর্যায়ের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সংক্রান্ত রচনাগুলিকে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে। ১৯০৭ সালে ষ্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে লেনিন ঔপনিবেশিক কমিশনে প্রস্তাবিত ভ্যান কল্ (Van Kol)-এর প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, সমাজতন্ত্রেও ঔপনিবেশিক নীতির একটি ইতিবাচক ভূমিকা থাকবে। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বামপন্থী অংশের সহায়তায় লেনিন এই প্রস্তাবকে পরাজিত করেন ও বলেন যে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করার মাধ্যমে একদিকে উগ্র বুর্জোয়া জাত্যাভিমান ও অপরদিকে ঔপনিবেশিক জনগণের প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা হবে। প্রাক্-অক্টোবর পর্বে ঔপনিবেশিক সমস্যা নিয়ে লেনিন যে শুধুমাত্র সচেতন ছিলেন তা নয়, এই পর্যায়ে লেনিনের রচনায় ঔপনিবেশিক প্রশ্নের বিশ্লেষণে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

প্রথমতঃ, ঔপনিবেশিক সংগ্রামের রণকৌশল আলোচনাকে কেন্দ্র করে লেনিন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এই দেশগুলিতে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণের প্রশ্নটির ওপরে। লেনিনের বিশ্লেষণের প্রধান ভিত্তিটি ছিল নিপীড়িত ও নিপীড়নকারী দেশের পার্থক্যকরণ। লেনিন তাঁর Right of Nations to Self Determination (১৯১৪), A Caricature of Marxism (১৯১৬) প্রভৃতি রচনায় দেখান যে, যেহেতু নিপীড়নকারী দেশগুলি হল মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদী, শিল্পোন্নত দেশ, সেহেতু সেখানে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রগতিশীল ভূমিকা অতিক্রান্ত হয়েছে ও সেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। অপরদিকে নিপীড়িত দেশগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে সামন্ততন্ত্রেরও অবলুপ্তি হয়নি ও পুঁজিবাদেরও প্রসার ঘটেনি, যার ফলে এই দেশগুলিতে বিপ্লবের স্তরটি হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক। দ্বিতীয়তঃ, এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি কে হবে, লেনিন সেই প্রশ্নটির বিশ্লেষণ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, প্রাচ্যের উপনিবেশগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী আন্দোলনে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নেবে ; কিন্তু একই সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেন যে, এই দেশগুলির জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শ্রেণী উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামকে পরিচালনা করবে বুর্জোয়াদের জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে ও এই পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন এই দেশগুলিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার দু'টি পথের কথা বলেছিলেন। প্রথমটিকে বলা যায় 'জাতীয় সংস্কারবাদের' পথ, যেটিকে এই দেশগুলির বুর্জোয়া শ্রেণী অনুসরণ করতে চায় জাতীয় মুক্তির মাধ্যমে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে। দ্বিতীয় পথটিকে বলা যেতে পারে 'বিপ্লবী গণতন্ত্রের' পথ, যেখানে এই দেশগুলির বিপুল সংখ্যক নিপীড়িত মানুষ অর্থাৎ, মূলতঃ কৃষকশ্রেণী, বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তিরূপে কাজ করে। প্রাক্-অক্টোবর পর্বে চীন সম্পর্কে একাধিক রচনায় লেনিন এই দুই পথের পার্থক্যকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। লেনিন প্রাচ্যের উপনিবেশগুলিতে কৃষক সংগ্রামের প্রশ্নটিকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েও এই সতর্কবাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন যে, এ সব দেশে কৃষকরা শুধুমাত্র তাদের একক প্রচেষ্টায় পুঁজিবাদের বিকল্প পথকে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হবে না, যদি না তারা এই দেশগুলির উদীয়মান শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ না হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেনিন ১৯১৯ সালে দ্বিতীয় All Russia Congress of Communist Organisations of the Peoples of the East-এর সম্মেলনে প্রাচ্যের দেশগুলির প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, এই দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে প্রকৃত অর্থে জয়যুক্ত করার জন্য আশু প্রয়োজন হল শ্রমিক-কৃষক ঐক্য প্রতিষ্ঠার।

॥ ৫ ॥

ঔপনিবেশিক প্রশ্ন প্রসঙ্গে লেনিনের তত্ত্ব ও তার মূল্যায়ন

তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত কমিণ্টার্ণের (Comintern) দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের রণকৌশল সংক্রান্ত খসড়া ঔপনিবেশিক দলিল পেশ করেন। বস্তুতঃপক্ষে এই দলিলই বিস্তৃত আলোচনার পর সামান্য পরিবর্তনসহ গৃহীত হয় এবং এই দলিলে বিশ্লেষিত লেনিনের বক্তব্যকেই সাধারণভাবে

ঔপনিবেশিক প্রশ্ন প্রসঙ্গে লেনিনের তত্ত্ব রূপে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। লেনিনের এই দলিলকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, লেনিনের ব্যাখ্যার যাত্রাবিন্দুটি ছিল নিপীড়িত ও নিপীড়নকারী দেশের পার্থক্যকরণ। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এই কথাও বলেন যে, নিপীড়িত দেশগুলির শোষিত জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে শাসকশ্রেণীর জাতীয়তাবাদী আদর্শে পুষ্ট তথাকথিত জাতীয় স্বার্থের পার্থক্যটি চিহ্নিত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, নিপীড়িত দেশগুলিতে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে কমিউনিস্ট পার্টি-গুলির উচিত সমর্থন করা ; সেই সঙ্গে লেনিন এ কথাও বলেন যে, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে নিঃশর্তভাবে সমর্থন করা উচিত নয় এবং কোন অবস্থাতেই বুর্জোয়া নেতৃত্বে মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে আন্দোলনকে সমার্থক মনে করার কারণ নেই। লেনিনের এই বক্তব্যটি ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপুর্ণ, যার অন্যতম তাৎপর্যটি হল এই যে, উপনিবেশগুলিতে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী দ্বৈত চরিত্র বৈশিষ্ট্য। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে তারা নিজেদের জাতীয় স্বার্থে নেতৃত্ব দিলেও বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থে তারা এই সংগ্রামকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে বেঁধে রাখার চেষ্টা করবে। সুতরাং তাদের পরিচালিত এই সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন জানিয়েও কমিউনিস্টদের এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে। তৃতীয়তঃ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনের শ্রেণী সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে লেনিনের যেহেতু কোন মোহ ছিল না, সেজন্য এই দেশগুলিতে তিনি কৃষক আন্দোলনকে বিপ্লবী রূপ দেবার প্রশ্নটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন ও সেই সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের সোভিয়েত গড়ে তুলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে বিপ্লবমুখী করে তোলার কাজকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

লেনিনের এই 'খসড়া দলিলকে' কেন্দ্র করে একাধিক মন্তব্য করেন তাঁর সহকর্মীরা ও আরো অনেকেই। এঁদের অনেকের পক্ষেই লেনিনের বক্তব্যের মূল সুরটিকে অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি, যার ফলে এঁদের মধ্যে বেশ কয়েক-জন লেনিনের বক্তব্যকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের কাছে নতিস্বীকার রূপে বর্ণনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মানবেন্দ্রনাথ রায়,

যিনি লেনিনের বক্তব্যের বিকল্প একটি 'সংযোজনকারী দলিল' (Supplementary Theses) এই কংগ্রেসে পেশ করেন। সাম্প্রতিককালের গবেষণার আলোকে দেখা যায় যে, লেনিন ঔপনিবেশিক কমিশনের চেয়ারম্যানরূপে সব ক'টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রায়ের দলিলকে মৌলিক সংশোধন করেছিলেন ও সংশোধিত অবস্থায় লেনিন ও রায় উভয়ের দলিলই গৃহীত হয়। লেনিনের এই সংশোধনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অসংশোধিত অবস্থায় রায়ের দলিলকে গ্রহণ করলে তা হয়ে দাঁড়াত লেনিনের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং অতিবামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক কথায়, রায়ের অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে লেনিন গুণগতভাবে সংশোধন করে তাঁর 'সংযোজনকারী দলিল'কে তিনি কংগ্রেসের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন। রায় তাঁর মূল দলিলে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, সেটিকে তিনি ব্যাখ্যা করেন ঔপনিবেশিক কমিশনে লেনিনের সঙ্গে বিতর্কের সময়ে। লেনিন-রায় বিতর্কটিকে বিশ্লেষণ করলেই ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সংক্রান্ত লেনিনের তত্ত্বটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

লেনিন-রায় বিতর্কটি মূলতঃ তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। প্রথমতঃ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রায়ের বক্তব্য ছিল যে, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের ছত্রছায়ায় ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্রের অবসান হয়ে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আরও বলেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ভারতবর্ষে শিল্পের উন্নতিসাধন, উৎপাদনব্যবস্থায় পুঁজিবাদী সম্পর্কের প্রসার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান নীতি হয়ে দাঁড়ায়। উপনিবেশবাদকে সাধারণভাবে একটি নিপীড়িত দেশের উৎপাদনব্যবস্থার প্রগতির পক্ষে সবচেয়ে বড় অন্তরায় মনে করা হয়। কিন্তু রায়ের বক্তব্যকে স্বীকার করার অর্থ হল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই চিরাচরিত ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে পুঁজিবাদের বিকাশের নীতি গ্রহণ করে। লেনিনের বক্তব্য ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ সব সময়েই চায় উপনিবেশগুলিকে পশ্চাদপসর রাখতে, যাতে এই অঞ্চলগুলির বাজার তাদের করায়ত্ত থাকে। পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটাতে সাম্রাজ্যবাদ কোন সময়েই উৎসাহী হবে না, কারণ তার অর্থ হবে দেশীয় পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া, যা হবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পুঁজি বিনিয়োগের পরিপন্থী। লেনিন রায়ের

বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের মত দেশে মূলতঃ প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্কের প্রাধান্যই ছিল বেশী, ও সেই কারণ এখানে কৃষকরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। রায়ের বক্তব্যের পিছনে অন্যতম যুক্তিটি ছিল যে, ভারতবর্ষের মত দেশে শিল্পের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ও শ্রমিকদের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ভারতবর্ষকে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ পারসিৎস (Persits) দেখিয়েছেন যে রায়ের এই ধারণাটি ছিল নিতান্তই অমূলক। বায়েব কাছে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক বলতে কি বোঝায় তার পরিষ্কার কোন ধারণা ছিল ন। রায় জনসংখ্যার দরিদ্রতম অংশকেই, বিশেষতঃ কর্মচ্যুত হস্তশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের, কৃষকদের ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের শোষণে জর্জরিত, বাস্তুচ্যুত মানুষদের একত্রিত করে শ্রমিকশ্রেণী রূপে আখ্যা দিয়েছিলেন। প্রকৃত অর্থে ভারতবর্ষে সার্থক অর্থে তখনও পুঁজিবাদের বিকাশ ও সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীব উত্থান হয়নি।

লেনিনের সঙ্গে রায়ের দ্বিতীয় বিরোধটি হয়েছিল নিপীড়িত দেশগুলিব উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর সম্ভাবনা ও ভূমিকাকে কেন্দ্র কবে। রায়ের বক্তব্য ছিল, এই দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী যেহেতু প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেহেতু ভারতের মত পুঁজিবাদী দেশে বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল ও এই বুর্জোয়া শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। তাই রায়ের মত ছিল যে, এই দেশগুলিতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের কোন সম্পর্ক নেই। লেনিন এই প্রশ্নেও রায়ের তীব্র বিরোবিতা করেছিলেন। লেনিনেব বক্তব্য ছিল যে উপনিবেশগুলিতে, এমন কি ভারতেও, শ্রমিকশ্রেণীর উন্মেষ হয়েছিল অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে। এই দেশগুলিতে দেশীয় পুঁজিবাদ জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় নয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে। ফলে এই দেশগুলিতে মূল দ্বন্দ্বটি ছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমগ্র জনগণের, যার মধ্যে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী যে শুধু অন্তর্ভুক্ত ছিল তা নয়, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে তারাই নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই লেনিন উপনিবেশগুলিতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির প্রতি কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সমর্থন জ্ঞাপন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পশ্চিমী গবেষকবৃন্দ, যেমন নোলাউ (Nollau),

বর্কেনাউ (Borkenau) প্রমুখেরা লেনিনের এই নীতিকে সুবিধাবাদী ও "কৌশলী" আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, তিনি এই নীতিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত-ভাবে সমর্থন করেছিলেন, কারণ তাঁর প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে আদৌ কোন ঐতিহাসিক সচেতনতা ছিল না। লেনিনের খসড়া দলিলটিকে বিশ্লেষণ করলে কিন্তু দেখা যায় যে, তিনি ইতিহাসগত তাৎপর্যের দৃষ্টিকোণ থেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন, যেহেতু বিষয়-গতভাবে এগুলি লেনিনের কাছে সীমিত অর্থে হলেও ছিল প্রগতিশীল আন্দোলন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক হয়। রায়ের কাছে সাম্রাজ্যবাদ ও সমগ্র জনগণের দ্বন্দ্বের তুলনায় অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের দ্বন্দ্ব ও ফলে তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী বুর্জোয়াদের পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনকে প্রলেতারিয়েতের কোন কারণেই সমর্থন করা উচিত নয়। রায়ের এই বক্তব্যকে ব্যবহার করে ফেরনান্দো ক্লদ্যা (Fernando Claudin), জে. ডব্লু. হালস্ (J. W. Hulse) প্রমুখেরা বলে থাকেন যে, লেনিন তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে বুর্জোয়া জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনের প্রতি কার্যতঃ সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে প্রলেতারিয়েতের মূল বিপ্লবী লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। মূল ব্যাপারটি হল যে, লেনিন কখনই রায়ের সঙ্গে একমত ছিলেন না যে, পুঁজিবাদ ভারতবর্ষের মত দেশগুলিতে দ্রুত প্রসারিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করছে। লেনিনের ধারণা খুব সঙ্গত কারণেই ছিল যে, এই দেশগুলিতে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বৃহত্তম অংশটি ছিল দরিদ্র কৃষকরা, যাদের ওপরে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট গভীর; উপরন্তু এই দেশগুলিতে সদ্যোজাত কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তাই লেনিন সঠিক-ভাবেই বলেছিলেন যে, এই দেশগুলিতে বুর্জোয়া আন্দোলনের বিরোধিতা করার অর্থ হবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। আবার তিনি যেহেতু বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, সেহেতু তিনি এ কথাও অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে, কমিউনিস্টদের কোন অবস্থাতেই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেয়া চলবে না বা বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে যাওয়াও চলবে না। অর্থাৎ, লেনিন একই সঙ্গে দুটি বিপরীতমুখী কর্মসূচীকে গ্রহণ করে এই দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি-

সংগ্রামের রণকৌশল রচনা করেছিলেন। এক, জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করে দেশের মূল স্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতকে অবতীর্ণ হতে হবে ; দুই, প্রলেতারিয়েত ও তার পার্টিকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করে এবং শোষিত মানুষের সংগ্রামকে বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রভাব থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—যাতে এই সংগ্রাম বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ না থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে লেনিনের সঙ্গে রায়ের তৃতীয় পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রায়ের কাছে মনে হয়েছিল যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ভারতের মত দেশে আসন্নপ্রায় ও তাঁর ধারণা হয়েছিল যে কমিউনিস্ট পার্টি তার একক নেতৃত্বে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই বিপ্লবকে সুসম্পন্ন করতে পারে ; লেনিন রায়ের এই দৃষ্টিভঙ্গী সমালোচনা করে দেখান যে, উপনিবেশগুলিতে কমিউনিস্ট আন্দোলন ছিল অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে ও জনজীবনে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের তুলনায় তার প্রভাবও ছিল সামান্য। লেনিনের বক্তব্য ছিল যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চৌহদ্দি থেকে মুক্ত করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে বৈপ্লবিক রূপ দান করতে হলে কমিউনিস্টদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমজীবী মানুষের সোভিয়েত গড়ে তুলতে হবে। এইভাবে সোভিয়েতগুলির মাধ্যমে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম সংগঠিত হবে ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিকল্প বিপ্লবী নেতৃত্ব ও সংগঠন গড়ে উঠবে। এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে, লেনিন যেমন সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার সংগ্রামে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধ কিন্তু ইতিবাচক ভূমিকাকে স্বীকার করেছিলেন, তেমনি এই আন্দোলনকে পরিচালিত করার সার্থক, বিপ্লবী পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কেও তিনি গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। লেনিনের বিচারে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার সংগ্রাম তখনই হবে অর্থবহ, যদি তা জনগণের সামাজিক মুক্তি আনতে সক্ষম হয়। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা, আবার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকেই একমাত্র আদর্শ বলে গ্রহণ করা,—লেনিন এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীরই সমালোচক ছিলেন ও সে কারণেই রায়ের অতি-বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি।

উগ্র বামপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বিচার করার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন রায়; বিশের দশকে প্রাচ্যের দেশগুলির একাধিক বিপ্লবী নেতা রায়ের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন। এঁদের প্রায় সকলেরই ধারণা ছিল যে, উপনিবেশগুলিতে রুশ বিপ্লবের মডেলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল আসন্ন ও সেই বিপ্লবে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা হবে সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলিই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে ও সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে। পরবর্তীকালের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস প্রমাণ করে, রায় প্রমুখের অতি-বামপন্থী চিন্তা ছিল কতখানি ভ্রান্ত। চীন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সাফল্য, এই সংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়াদের নিয়ে ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট গঠন, পরে দীর্ঘ শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রলেতারিয়েতের নিজস্ব শ্রেণী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সর্বোপরি এই দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উৎসারণ ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সংক্রান্ত লেনিনের তত্ত্বের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও যথার্থতাকেই প্রমাণ করেছে।

দশম অধ্যায়

মাও ৎসে তুং-এর রাষ্ট্রচিন্তা

অক্টোবর বিপ্লবের পরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় মহাচীনে, ১৯৪৯ সালের চীন বিপ্লবের মাধ্যমে। এই বিপ্লবে নেতৃত্ব প্রদান করেছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিভিন্ন স্তবে এই বিপ্লবের রণকৌশল রচনার প্রশ্নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন মাও ৎসে তুং। তাই মাও ৎসে তুং-এর সমগ্র রাষ্ট্র-চিন্তা চীন বিপ্লবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মার্কস-এঙ্গেলসের প্রতিষ্ঠিত মূল নীতিগুলিকে অনুসরণ করে লেনিন তাঁর 'ঔপনিবেশিক থিসিসে' উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের যে কর্মসূচী ও কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করেছিলেন, চীন বিপ্লবের পটভূমিকায় মাও ৎসে তুং তার একাধিক মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন ও চীন বিপ্লবের নিজস্ব প্রয়োজনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গঠন প্রসঙ্গে কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে মাও ৎসে তুং-এর এই তাত্ত্বিক সংযোজনগুলি সামগ্রিকভাবে আজ "মাওবাদ" (Maoism) নামে পরিচিত। মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তায় মাও ৎসে তুং-এর অবদানকে কেন্দ্র করে একাধিক বিতর্ক অতীতে হয়েছে ও আজও চলেছে। মাও-এর মৃত্যুর পরে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও তাঁর চিন্তার মূল্যায়ন নতুনভাবে করার প্রচেষ্টা চলেছে। ফলে শুধু ব্যক্তি হিসেবে নয়, তাত্ত্বিক হিসেবেও মাও ৎসে তুং একটি বিতর্কিত চরিত্র। খোদ মার্কসবাদী মহলেই মাও ৎসে তুং-এর তাত্ত্বিক ধারণাগুলি তর্ক নিরপেক্ষ নয়, একথা মনে রেখে তাঁর অবদানকে মূলতঃ তিনটি বিষয়রূপে আলোচনা করা যায়। প্রথমতঃ, নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব, দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির তত্ত্ব, তৃতীয়ত, মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের দার্শনিক বিকাশ সক্রান্ত তত্ত্ব।

॥ ১ ॥

নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব

চীন বিপ্লবের গতিপ্রকৃতি ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রণকৌশলের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৩১ সালে মাও ৎসে তুং-এর

উদ্যোগে ও কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় প্রচেষ্টায় চিয়াং-কাই-শেক পরিচালিত জাতীয়তাবাদী কুয়োমিণ্টাং দলের সঙ্গে সি. পি. সি. (চীনের কমিউনিস্ট পার্টি)-র সহায়তায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠার পিছনে সি. পি. সি.-এর দু'টি প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ, কুয়োমিণ্টাং দলের জাতীয়তাবাদী প্রভাব সে সময়ে ছিল যথেষ্ট। তাই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে কুয়োমিণ্টাং দল থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে এককভাবে এই সঙ্কটের মোকাবিলা করার চেষ্টাটি হত বামপন্থী হঠকারিতার সামিল। দ্বিতীয়তঃ, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতাব ভিত্তিতে সি. পি. সি. চিয়াং কাই শেক্-এর দলের উগ্র কমিউনিস্টবিরোধিতা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিল। কিন্তু যুক্তফ্রণ্টই ছিল একমাত্র সম্ভাব্য পথ যার মাধ্যমে সি. পি. সি. এই ফ্রণ্ট নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলিতে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে ও কুয়োমিণ্টাং দলের জনস্বার্থবিরোধী চরিত্রকে জনসমক্ষে উদ্ঘাটন করতে পেরেছিল। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী ধারা সম্পর্কে ঐক্য ও সংগ্রামেব এই যুক্তফ্রণ্টীয় নীতি অনুসরণ করার কথাই লেনিন তাঁর 'ঔপনিবেশিক থিসিসে' বলেছিলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সীমিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতাকে ও জনমানসে তার ব্যাপক প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে এবং জাতীয়তাবাদী ভাবধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করে কমিউনিস্ট পার্টিকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনেব মাধ্যমে নিজের স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে বিকল্প আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে,—লেনিনের এই বক্তব্য সার্থক পরিণতি লাভ করেছিল দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সৃষ্টিব মধ্যে। সি. পি. সি. পরিচালিত নির্বাচনের ভিত্তিতে অচিরেই শেন্‌সি-কান্‌সু-নিংশিয়া সীমান্ত অঞ্চলে (Shensi-Kansu-Ninghsia Border Region) যুক্তফ্রণ্টীয় শাসনব্যবস্থা চালু হয় এবং এই নতুন ব্যবস্থাকে মাও ৎসে তুং 'নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' আখ্যা দেন। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মাও ১৯৪০ সালে তাঁর On New Democracy রচনায় 'নয়া গণতন্ত্রের' (New Democracy) ধারণাটির একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। যুক্তফ্রণ্ট পরিচালিত মুক্ত অঞ্চলগুলিতে সি. পি. সি. যে নীতিগুলিকে অনুসরণ করাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ভূমি সংস্কার এবং সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিকল্প একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী গ্রহণ।

মাও ৎসে তুং যে নয়া গণতন্ত্রের চিন্তা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, কুয়োমিণ্টাং দলের ছত্রছায়ায় চীনে পুঁজিবাদের যে প্রসার ঘটেছিল তার বিকল্প একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিকভাবে চীনে সে সময়ে প্রয়োজন ছিল একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের, কারণ অপস্রয়মান সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশীয় বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠা তখন শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে চীনের বেশ কয়েকটি শিল্পোন্নত অঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত উন্মেষও পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাই চীনের সমাজ-ব্যবস্থায় সর্ববৃহৎ শোষিত শ্রেণীটি যদিও ছিল কৃষক, শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিও একেবারে অকিঞ্চিৎকর ছিল না। সেই সঙ্গে জাপ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতি চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে চীনকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। মাও ৎসে তুং-এর উদ্দেশ্য ছিল যুক্তফ্রণ্টের পরিচালনায় এই বিপ্লবকে সম্পন্ন করা, কিন্তু এই বিপ্লবের লক্ষ্য হবে পুঁজিবাদকে সুসংহত করা নয়, বরং পুঁজিবাদের বিকল্প একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যেটি হবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অন্তর্বর্তীকালীন ধাপ এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই মাও ৎসে তুং 'নয়া গণতন্ত্রের' কর্মসূচী প্রণয়ন করেন

এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য মাও ৎসে তুং 'নয়া গণতন্ত্রের' ভিত্তিতে একটি নতুন ধরনের রাষ্ট্রশক্তি গঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন। এটি ছিল 'নয়া গণতন্ত্রের' দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্রে উত্তরণপর্বের উপযোগী এই রাষ্ট্রশক্তির চরিত্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সাধারণভাবে দু'টি ভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ করেছিলেন। এক, সামগ্রিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালিত ব্যবস্থা (যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়ন), দুই, একাধিক শ্রেণীর যৌথ একনায়কত্ব, যেটিকে তিনি চীনের পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী বলে মনে করেছিলেন। মাও ৎসে তুং-এর বক্তব্য ছিল এই যে, চল্লিশের দশকে চীনা জনগণের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল জাপ সাম্রাজ্যবাদ। যেহেতু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চীনের দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতায় সামিল হয়েছিল ও কমিউনিস্টদের সঙ্গে যৌথভাবে যুক্তফ্রণ্টে অংশগ্রহণ করেছিল, সেহেতু তিনি বলেছিলেন যে, এই যৌথ একনায়কত্ব গঠিত হবে শ্রমিক, কৃষক, পাতি বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়াদের সমন্বয়ে। মাও ৎসে তুং-এর এই বক্তব্যের ভিত্তিটি ছিল এই যে, চীনে প্রধান বিরোধটি ছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চীনা

জনগণের। ফলে একমাত্র মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা (comprador bourgeoisie) ছাড়া অন্য সবকটি শ্রেণীই যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় অংশগ্রহণ করেছিল, সেহেতু তাদেরকে নিয়ে যৌথ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণপর্বে নতুন ধরনের রাষ্ট্রশক্তি গঠন করার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তব সম্ভাবনা ছিল।

এই প্রসঙ্গে যে ঘটনাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় সেটি হল এই যে, মাও ৎসে তুং ১৯৪৯ সালের চীন বিপ্লবের পরে যে নতুন রাষ্ট্রশক্তির গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেখানেও চারটি শ্রেণীর এই যৌথ একনায়কত্বের ধারণাটি অব্যাহত রইল। মাও-এর বক্তব্য ছিল যে, চীনে বিপ্লবের পরেও নয়া গণ-তন্ত্রের স্তরটি অপরিবর্তিত ছিল ও সে কারণেই এই যৌথ একনায়কত্বের ধারণাকে বাতিল করার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে এই রাষ্ট্রশক্তির নতুন নামকরণ হয় জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্ব (People's Democratic Dictatorship)। ১৯৫৪ সালে গৃহীত চীনের নতুন সংবিধানেও এই ধারণাটি প্রতিফলিত হল। যেমন বলা হল যে, চীনের সাধারণ মানুষ সমাজতন্ত্রকে আকাঙ্খা করে, তেমনি আবার ব্যক্তিগত পুঁজির মালিকানাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হল। নয়া গণতন্ত্রের এই পর্বের অবসান চীনে কোন্ বছরে হয়েছিল, তা নিয়ে সি. পি. সি.-এর মধ্যেই মতবিরোধ ছিল এবং এই প্রসঙ্গে কোন স্পষ্ট, সঠিক বক্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে সাধারণভাবে একথা মানতে কোন বাধা নেই যে, ১৯৫৬ সালে সি. পি. সি.-এর অষ্টম কংগ্রেস আহ্বানের সময়টিকে নয়া-গণতান্ত্রিক স্তরের সমাপ্তিপর্ব রূপে গ্রহণ করা যায়।[1]

সমাজতন্ত্রে উত্তরণপর্বটিকে 'নয়া গণতন্ত্র' রূপে চিহ্নিত করে মাও ৎসে তুং 'যৌথ একনায়কত্বের' যে ধারণাটি প্রবর্তিত করেন, তার যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা নিয়ে একাধিক মার্কসবাদী গবেষক সংশয় প্রকাশ করেছেন। মাও তাঁর On People's Democratic Dictatorship (১৯৪৯) ও এই পর্বের একাধিক রচনায় বলেন যে, চীনে বিপ্লবের পরে দেশীয় পুঁজিপতি ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও তার চরিত্রটি ছিল অবৈর, কারণ দেশীয়

1. এই বক্তব্যের ভিত্তি Manoranjan Mohanty, *The Political Philosophy of Mao Tse Tung*, পৃঃ ৪০।

পুঁজিপতিদের শান্তিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে সমাজতন্ত্রকে তাদের কাছে গ্রহণ-যোগ্য করে তোলা সম্ভবপর হয়েছিল। সে কারণেই মাও ৎসে তুং বলেছিলেন যে, বিপ্লবের পরে যে জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রকৃত অর্থে সেটি ছিল প্রলেতারীয় একনায়কত্বেরই একটি ভিন্ন রূপ মাত্র। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মত জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্বেরও মূল উদ্দেশ্যটি হল সমাজতন্ত্রে উত্তরণকে ত্বরান্বিত করা। কিন্তু চীনের বিশেষ পরিস্থিতিতে এই একনায়কত্ব এককভাবে সর্বহারা শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত ছিল না। এই একনায়কত্ব যৌথভাবে চারটি শ্রেণী পরিচলনা করেছিল। সেই অর্থে রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে সে দেশে যে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে যে জনগণতন্ত্র (People's Democracy) গঠিত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে মাও ৎসে তুং-এর উদ্ভাবিত যৌথ একনায়কত্বের ধারণাটির মৌলিক পার্থক্য অবশ্যই ছিল।

সমালোচকরা একাধিক যুক্তির ভিত্তিতে মাও-এর এই ধারণাটির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।[2] প্রথমতঃ, তাঁরা মনে করেন যে, কৌশলগত কারণে ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী অবশ্যই যুক্তফ্রণ্টে অংশগ্রহণ করতে পারে। স্বয়ং লেনিন এই মতের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু মূলতঃ এই শ্রেণী যেহেতু শোষকের ভূমিকা পালন করে, সেহেতু জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে যৌথভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় যদি শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী আসীন হয়, তবে তাদের কর্মপন্থা সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এক কথায়, এই সমালোচকদের মতে, কোন অবস্থাতেই দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের অবৈর দ্বন্দ্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এই সমালোচকরা প্রশ্ন করেন যে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণ-পর্বে যদি শোষক দেশীয় বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে সেই পর্বে 'জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে' কার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়? মাও ৎসে তুং-এর বক্তব্যকে স্বীকার করে নিলে দেখা যায় যে এই পর্বে, অর্থাৎ, ১৯৪৯ সালে চীন বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবার পরে চীনা জনগণের মূল শত্রুরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে বৃহৎ পুঁজিপতিদের। সমালোচকরা

2. M. I. Sladkovsky, 'Present-Day China's Socio-Economic System', in *Present-Day China*, পৃঃ ১২-১৫।

কিন্তু মনে করেন যে বৃহৎ ও দেশীয় পুঁজিপতিদের বিরোধকে কোন সময়েই বাড়িয়ে দেখা উচিত নয়, কারণ দেশীয় পুঁজিপতিরাও পুঁজিবাদী শোষণ-ব্যবস্থারই ফলশ্রুতি ও তারাও শোষণব্যবস্থারই অন্তর্ভুক্ত। এঁদের মতে, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণপর্বে পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের (বড় পুঁজিপতি বনাম দেশীয় পুঁজিপতি) চেয়ে অনেক বড় হয়ে দেখা দেয় সমাজতন্ত্রের পক্ষাবলম্বী শোষিত শ্রেণীগুলির সঙ্গে সমাজতন্ত্র-বিরোধী শ্রেণীগুলির (শ্রমিক-কৃষক বনাম সব ধরনের পুঁজিপতি) দ্বন্দ্বটি, যদিও দেশীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিদেশী পুঁজি দ্বারা পুষ্ট বৃহৎ পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্বের ইতিবাচক দিকটিকে অবশ্যই স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে সি পি সি. এর অভ্যন্তরে ১৯৫৬ সালের পর গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দেয়। কোন পথে চীনের বিশেষ পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রকে সুসংহত করা যেতে পারে,—এই প্রশ্নটির পটভূমিকায় মাও ৎসে তুং এর দ্বিতীয় মৌলিক অবদানটিকে বিচার করা প্রয়োজন।

তবে এই আলোচনার পূর্বে মাও ৎসে তুং বর্ণিত নয়া গণতন্ত্রের আরও দুটি ভিত্তির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, যেটি না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নয়া গণতন্ত্রের দ্বিতীয় ভিত্তিটি হল অর্থনীতি। এই প্রসঙ্গে মাও বলেছেন যে, নয়া গণতান্ত্রিক অর্থনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বৃহৎ ব্যাঙ্ক ও শিল্পগুলির জাতীয়করণ করা। এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলিকে বেসরকারী পুঁজির হাতে ন্যস্ত করার অর্থ হবে জনসাধারণকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণ করারই সামিল সেই সঙ্গে কৃষকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে একথাও ঘোষণা করা হল যে, বড় বড় জমিদারদের জমির জাতীয়করণ হবে ও দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে তা বণ্টন করে দেওয়া হবে। কিন্তু নয়া গণতন্ত্র যেহেতু সমাজতন্ত্র নয়, সে কারণে শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যেমন সবকিছুই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, এ ক্ষেত্রে তা করা সম্ভব ছিল না। তাই সাধারণভাবে বেসরকারী পুঁজির ক্ষেত্রে নয়া গণতান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্দেশ্য ছিল তাকে খর্ব করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখা, সরাসরি তার অবসান ঘটান নয়।

নয়া গণতন্ত্রের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিটি ছিল সাংস্কৃতিক। সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের সংমিশ্রণে চীনে যে জনস্বার্থবিরোধী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে

উঠেছিল, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কথা স্মরণ রেখে তার বিকল্প এক নতুন সাংস্কৃতিক কর্মসূচী ঘোষণা করলেন মাও। মাও বর্ণিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই নতুন সংস্কৃতি হবে জাতীয়, বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত চীনের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যা কিছু সুস্থ ও সৃষ্টিশীল, তাকে গ্রহণ করেই মাও এই নতুন সাংস্কৃতিক কর্মসূচী গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেন যে জাতীয় সংস্কৃতির যা কিছু অবৈজ্ঞানিক, তাকেও কঠোরভাবে বর্জন করতে হবে। এই কর্মসূচীর প্রণয়নে তাই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বৈজ্ঞানিক ভাবাদর্শে এটিকে পুষ্ট করার প্রয়োজনীয়তার ওপরে, যাতে জনস্বার্থে রচিত এই সাংস্কৃতিক কর্মসূচী চীনের মানুষকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করতে সক্ষম হয়। সেই সঙ্গে এ কথা বলা হল যে এই কর্মসূচী হবে গণমুখী, অর্থাৎ যে সংস্কৃতি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন বা যে সংস্কৃতি জনস্বার্থবিরোধী, তাকে পরিহার করে ও জনস্বার্থের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখেই নয়া গণতন্ত্রের সাংস্কৃতিক কর্মসূচী রচনা করতে হবে।

॥ ২ ॥

সমাজতন্ত্রে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির তত্ত্ব

১৯৫৬ সালে আহূত সি. পি. সি.-এর অষ্টম কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির মূল রাজনৈতিক রিপোর্টে লিউ-শাও-চি জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে সুসংহত করে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রয়োজনীয়তাকে ব্যাখ্যা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, চীনে সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নটি ছিল সর্বাধিক জরুরি। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, চীনে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিটি যেহেতু ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেহেতু সি. পি. সি.-এর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদকে সুদৃঢ় করে সমাজতন্ত্রের পথে চীনের জয়যাত্রাকে সুনিশ্চিত করা। কিন্তু যেহেতু ঐতিহাসিক কারণেই চীন তখনও পর্যন্ত ছিল একটি পিছিয়ে পড়া দেশ, সেহেতু লিউ শাও-চি-এর রিপোর্টে উৎপাদন বৃদ্ধি, অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তির বিকাশলাভকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাই অষ্টম কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, চীনে মূল দ্বন্দ্বটি ছিল অগ্রসরমান সমাজতন্ত্র ও পিছিয়ে পড়া উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে। এই দ্বন্দ্ব নিরসন করে সমাজতন্ত্রের

অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করার স্বার্থে লিউ-শাও-চি উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করার প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

মাও ৎসে তুং এই ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। ১৯৫৭ সালে প্রদত্ত On the Correct Handling of Contradictions among the People বক্তৃতায় মাও একটি বিকল্প মত উপস্থাপিত করেন এবং ১৯৫৮ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে মাও প্রদত্ত এই নতুন লাইনটি গৃহীত হয়। এর ফলে ১৯৫৬ সালে গৃহীত লাইনের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে সি. পি. সি. পরিচালিত হতে শুরু করে এবং এর পরে প্রথমে ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত চীনা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দশম প্লেনাম অধিবেশনে ও তারও পরে ১৯৬৬ সালে 'মহান প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' কর্মসূচী গ্রহণের মধ্যে মাও ৎসে তুং-এর দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পায়। ১৯৫৭ সালের বক্তৃতার দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, মাও ৎসে তুং ১৯৫৬ সালে প্রদত্ত লিউ-শাও-চি-এর রিপোর্টের বিরোধিতা করে বলেন যে, চীনে মূল দ্বন্দ্বটি ছিল বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে, অগ্রসরমান সমাজতন্ত্র ও পিছিয়ে পড়া উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে নয়; দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরবিরোধী এই দুই শ্রেণীর সংগ্রামের তীব্রতাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে।

১৯৫৯ সালে অর্থনৈতিক উন্নতি ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে চীনে একাধিক সমস্যা দেখা দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পেং-তে-হুয়াই মাও ৎসে তুং-এর বিরুদ্ধে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করে সমাজতন্ত্রে শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির তত্ত্বের মত "অবাস্তব" ধারণা প্রচারের অভিযোগ করেন ও চীনের পার্টির অভ্যন্তরে দুই লাইনের দ্বন্দ্বটি প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯৫৯ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির নবম প্লেনামে মাও ৎসে তুং সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন এবং ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির দশম প্লেনামে গৃহীত প্রস্তাবে তিনি লিউ-শাও-চি-এর বিরোধী লাইনটির একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেন। এই প্রস্তাবে তিনটি বিষয়ের ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রথমতঃ, সমাজতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করা হয়; দ্বিতীয়তঃ, সি. পি. সি.-এর অভ্যন্তরেও বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম প্রতিফলিত হয়েছে,—এই বক্তব্যটি গ্রহণ করা হয়। তৃতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রের

গোটা পর্বটি জুড়েই বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে, এই অভিমতটি পোষণ করা হয়।

মাও ৎসে তুং-এর এই বক্তব্যের তাৎর্যটিকে অনুধাবন করতে হলে তাঁর On New Democracy (১৯৪০), On Contradiction (১৯৩৭), On the Correct Handling of Contradictions among the People (১৯৫৭) প্রভৃতি রচনাগুলির সুচিন্তিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি যে আলোচনা করেন, তার ভিত্তিতে ১৯৫৮ সালের পরবর্তী পর্যায়ে অনুসৃত মাও ৎসে তুং-এর নতুন লাইনের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই রচনাগুলিতে, বিশেষতঃ ১৯৫৭ সালে প্রদত্ত বক্তৃতায়, চীনে দেশীয় বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্বকে একই সঙ্গে বৈর ও অবৈর রূপে বর্ণনা করা হয়। নয়া গণতন্ত্রের পর্বে দেশীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে শ্রমিক-কৃষকের সহযোগিতার প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দেয়া হলেও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বটি অবৈর চরিত্র লাভ করে। কিন্তু যে কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সেটি হল এই যে, ১৯৫৭ সালে প্রদত্ত বক্তৃতায় মাও ৎসে তুং ঘোষণা করেন যে দেশীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর এই অবৈর দ্বন্দ্ব চীনের জনসাধারণের মধ্যে উপস্থিত শ্রেণীসংগ্রামের একটি অংশ ও সেই কারণে সমগ্র জনগণকে এই সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে এই দ্বন্দ্বের নিরসন করতে হবে। মাও ৎসে তুং-এর এই বক্তব্যের ভিত্তিতে কয়েকটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমতঃ, নয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই যেহেতু দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন, সেহেতু সমাজতন্ত্রবিরোধিতার পথ থেকে তাদের নিবৃত্ত করতে হলে সরাসরি তাদের নিশ্চিহ্ন করার কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তারা জনগণেরই অংশ বলে তাদেরকে পরাস্ত করা প্রয়োজন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং সেই কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শগত স্তরে সাধারণ মানুষকে সংঘবদ্ধ করে এই শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা করা প্রয়োজন। যৌথ একনায়কত্বের ভাগীদার একটি শ্রেণীশক্তিকে বলপ্রয়োগ করে ধ্বংস করার পথ গ্রহণ করলে চীনে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রক্রিয়াটি মারাত্মক-ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হত, যার ফলে হয়ত বা গোটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের মুখে এসে দাঁড়াত। দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় বুর্জোয়াদের সমাজ-তন্ত্রবিরোধিতার বিকল্প পথটি হল সমাজতন্ত্র গঠনে ব্যাপকভাবে জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা, কারণ জনগণের সৃষ্টিশীল ক্ষমতার আত্মপ্রকাশই

একই সঙ্গে সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলিকে প্রতিরোধ করতে এবং সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। সুতরাং সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় বুর্জোয়াদের সমাজতন্ত্রবিরোধিতাও বৃদ্ধি পাবে ও তার ফলে একই সঙ্গে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা যেমন বাড়বে তেমনই আবার সমাজতন্ত্রের প্রসারণের কর্মকাণ্ডে জনগণের সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সম্ভাবনা উত্তরোত্তর সৃষ্টি হবে। এক কথায়, শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের নির্মাণকাণ্ড ত্বরান্বিত হবে। তৃতীয়তঃ, যেহেতু শ্রেণীসংগ্রামের রাজনীতিই হবে সমাজতন্ত্র নির্মাণের মুখ্য চালিকা-শক্তি, সেহেতু উৎপাদিকা শক্তির বিকাশকে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির মূল ভিত্তিরূপে চিহ্নিত করা যায় না। এই কারণেই মাও ৎসে তুং ১৯৫৬ সালে গৃহীত লিউ-শাও-চির বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। এই একই কারণে ১৯৫৮ সালের পরে যারা মাও-এর এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে সি. পি. সি.-এর অভ্যন্তরে মাও বিরোধিতায় সামিল হয়েছিলেন, তাঁদেরকে পার্টির অভ্যন্তরে "বুর্জোয়া অনুপ্রবেশকারী" রূপে বর্ণনা করা হয়েছিল। একই সূত্র ধরে বলা যেতে পারে যে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নয়, শ্রেণীসংগ্রামের রাজনীতিই যেহেতু সমাজতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি, সেহেতু জনসাধারণকে একই সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামে ও রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণই সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই ১৯৫৮ সালে মাও ৎসে তুং এর নির্দেশে "সম্মুখপানে বৃহৎ পদক্ষেপ" (Great Leap Forward)-এর ও গণকমিউন (Peoples' Communes) প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী নেওয়া হয়। একই উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালে 'সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলনের' (Socialist Education Movement) ও ১৯৫৮ সালে 'সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' (Great Proletarian Cultural Revolution) কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এগুলির উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে বুর্জোয়া মতাদর্শ, বুর্জোয়া ভাবধারা ও বুর্জোয়া চিন্তার বিরুদ্ধে সংগঠিত করা, সি. পি. সি.-এর অভ্যন্তরে মাওবিরোধী লাইনকে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সহায়তায় প্রতিহত করা ও সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা।

এই কর্মসূচী গ্রহণের ফলে, বিশেষতঃ, 'সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' লাইন অনুসরণ করে চীনে সমাজতন্ত্রের প্রগতি কতটা সুনিশ্চিত

হয়েছে, সেটি মাও ৎসে তুং-এর মৃত্যুর পরে সি. পি. সি.-এর অভ্যন্তরেই সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিতর্কে প্রবেশ করার আগে সাধারণভাবে ১৯৫৮ সালের পরে যে তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপরে নির্ভর করে মাও ৎসে তুং তাঁর নতুন লাইনকে পরিচালনা করেছিলেন, তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে মার্কসবাদী মহলে যে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে, সেটি আলোচনার দাবি রাখে।

প্রথমতঃ, একাধিক চীন বিশেষজ্ঞ মনে করেন[3] যে, দেশীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্বকে কোন অবস্থাতেই জনসাধারণের মধ্যে অবস্থিত শ্রেণীসংগ্রাম রূপে ব্যাখ্যা করা যায় না ; কারণ, দেশীয় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করলেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে উত্তরণপর্বে আদৌ কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে না ও সেই কারণে তাঁদের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণভাবে বৈর হতে বাধ্য। অতএব, তাঁদের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের দ্বন্দ্বকে জনসাধারণের অভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রাম রূপে আখ্যা দেওয়া যায় না। এই সমালোচকবৃন্দ মনে করেন যে, দেশীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত হলে সমাজতন্ত্রের প্রগতি ত্বরান্বিত হয় না। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করতে হলে শ্রেণীশক্তি হিসেবে দেশীয় বুর্জোয়াদের পরাভূত করা প্রথমেই প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, অনেক সমালোচক মনে করেন যে, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজের অভ্যন্তরে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে,—মাও ৎসে তুং-এর এই তত্ত্বটি সর্ব অর্থে অবৈজ্ঞানিক। সমাজতন্ত্রে শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা নেই বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের ও প্রতিবিপ্লবী তৎপরতার সম্ভাবনা থাকবে, এ কথা এঁরা কেউই অস্বীকার করেন না। এঁরা এও স্বীকার করেন যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরে পুঁজিবাদবিরোধী মতাদর্শ সংগ্রামকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করার অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এই সমালোচকদের বক্তব্য হল যে, মাও ৎসে তুং সমাজতন্ত্রে উত্তরণপর্বে

3. M. Altaisky, V. Georgiyev, *The Philosophical Views of Mao Tse Tung. A Critical Analysis,* পৃঃ ১১৪-১৫।

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ভূমিকার সঙ্গে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তার ভূমিকাকে এক করে দেখেন। সমাজতন্ত্রে উত্তরণপর্বে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের শ্রেণীসংগ্রামই হবে মুখ্য বিষয়, কারণ এই পর্বে বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ যথেষ্টই সক্রিয় থাকে। কিন্তু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, নতুন রাষ্ট্রশক্তির অন্যতম ভূমিকা হবে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় করে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি সুনিশ্চিত করে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ সাধন করা। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবার তাৎপর্য এখানেই যে, তখন বুর্জোয়া শ্রেণী সরাসরি সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করতে পারে না, কারণ শ্রেণীশক্তি হিসেবে তাদের পর্যুদস্ত করেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই পর্বে রাষ্ট্রশক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য হয় সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করে জনসাধারণের কাছে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা এবং পরাভূত বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার ভূমিকা হয় আপেক্ষিকভাবে গৌণ। এই সমালোচকরা বলেন যে, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির পর্বটি অবশ্যই শ্রেণী-সংগ্রাম নিরপেক্ষ নয়। কিন্তু সেই শ্রেণীসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণপর্বে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের শ্রেণীসংগ্রামের চরিত্রের সঙ্গে এক করে দেখা যায় না। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের ওপরে প্রতিষ্ঠিত নতুন ধাঁচের অর্থনীতি, গণতন্ত্র ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে শ্রেণীসংগ্রাম যে সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে, তার সঙ্গে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্বকে সমার্থক মনে করা তাই সম্পূর্ণ ভুল বলে এঁরা মনে করেন। মাও ৎসে তুং-এর রচনাতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণপর্ব ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরে নতুন যে পর্বটি শুরু হয় তার পার্থক্য সম্পর্কে স্পষ্ট কোন তত্ত্বগত আলোচনা পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে প্রথম পর্বটিকে "জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্ব" ও দ্বিতীয় পর্বটিকে "প্রলেতারীয় একনায়কত্ব" রূপে বর্ণনা করলেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যে গঠনমূলক ভূমিকা থাকে, সে সম্পর্কে মাও ৎসে তুং আদৌ অবহিত ছিলেন না বলে এই সমালোচকরা অভিযোগ করেন। তাঁরা বলেন যে, এই কারণেই সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতাবৃদ্ধির তত্ত্বটি মাও ৎসে তুং উদ্ভাবন করেছিলেন।[4]

---

4. এই প্রসঙ্গে বুলগেরিয়ার বিশেষজ্ঞ T. Minkov-এর 'The Class Structure of the PRC', in *Present-Day China*, পৃঃ ১৮১-২২১ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয়তঃ, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের প্রশ্নটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ও সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় না করেই মাও ৎসে তুং "সম্মুখপানে বৃহৎ পদক্ষেপ", "সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব" জাতীয় যে কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজতন্ত্রেব অতি দ্রুত অগ্রগতি সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন, সেই প্রচেষ্টাকে সমালোচকরা "স্বচালনবাদী বিচ্যুতি" (voluntarist deviation) রূপে বর্ণনা করেছেন।[5] এই সমালোচকদের বক্তব্য হল যে, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিকে দ্রুত করার জন্য উৎপাদিকা শক্তির একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছনকে সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক কথায়, সমাজতন্ত্রের সামগ্রিক উপরি-কাঠামোটির নির্মাণের সাফল্য নির্ভর করে তার অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সাফল্যের সঙ্গে সংগঠিত করার ওপরে। অর্থনৈতিক ভিত্তিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বকে মূলধন করে জনসাধারণের মধ্যে সাময়িকভাবে গভীর উদ্দীপনা ও উৎসাহের সৃষ্টি করা গেলেও এই পথে সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা অচিরেই নানা সমস্যার সৃষ্টি করে বলে সমালোচকরা মনে করেন। তাঁরা এ কথাও বলেন যে, চীনের সব শ্রেণীর মানুষ "সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" কর্মসূচী বা "সম্মুখপানে বৃহৎ পদক্ষেপ" জাতীয় ধারণাকে গ্রহণ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল কি না, সেই প্রশ্নটিকে বিচার না করেই মাও ৎসে তুং দ্রুততম উপায়ে সমাজতন্ত্রের চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে চীনের অর্থনীতিতে যে সংকট দেখা দেয় ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়, তার মূল কারণটি মাও ৎসে তুং-এর এই "বিষয়ীবাদী" দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে নিহিত ছিল বলে একাধিক সমালোচক মনে করেন।

মাও-এর মৃত্যুর পরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর প্রদত্ত লাইনের সমালোচনা করে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে, সেটির আলোচনা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ১৯৫৮ সালে অনুষ্ঠিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে একদিকে যেমন মাও-এর গঠনমূলক ভূমিকার প্রশংসা করা হয়, অপরদিকে ১৯৫৮ সালের পরবর্তী পর্বে, বিশেষতঃ 'মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' সময়ে

5. M. Altaisky, V. Georgieyev, *The Philosophical Views of Mao Tse Tung. A Critical Analysis*, Chapter 3 এবং *A Critique of Mao Tse Tung's Theoretical Conceptions*, Chapters 5-6 দ্রষ্টব্য।

তাঁর প্রদত্ত লাইনকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বামপন্থী বিচ্যুতিরূপে বর্ণনা করা হয়।[6]

প্রস্তাবে বলা হয় যে মুষ্টিমেয় দক্ষিণপন্থী কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিধিকে সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দিয়ে পার্টির অভ্যন্তরে বহু বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিককে যেভাবে শ্রেণীশত্রুরূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তার ফল হয়েছিল চরম দুর্ভাগ্যজনক। এর ফলে পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্র গুরুতরভাবে খর্ব হয়। লিউ শাও চি-এর নেতৃত্বাধীন তথাকথিত "বুর্জোয়াশ্রেণীর সদর-দপ্তরের" আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং তাঁর ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তা ছিল নিতান্তই ভুল। দক্ষিণপন্থী বিপদকে বড় করে দেখতে গিয়ে মাও যে রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করেছিলেন, তার পরিণতিতে জন্ম নেয় বাম ঝোঁকের ভুলগুলো—যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন "মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" ধারণা। চীনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে দ্রুত ফল পাওয়ার আগ্রহে সারা দেশে প্রবল কমিউনিস্ট হাওয়া বইয়ে দিয়ে মাও যে "মহা উল্লম্ফনের" ডাক দিয়েছিলেন, সেটি ছিল সম্পূর্ণ অবাস্তব এক ধারণা। সমাজতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বন্দ্বকেই প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে বেছে নিয়ে মাও যে পন্থা অনুসরণ করেছিলেন, "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" ভুল লাইন তারই ফলশ্রুতি। এর ফলে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে রাজনৈতিক সমালোচনার শিকার হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" সময়ে সংশোধনবাদ বা পুঁজিবাদ বলে নিন্দিত বহু নীতিই প্রকৃতপক্ষে ছিল মার্কসবাদী ও সমাজতান্ত্রিক নীতি। ভুল ও নির্ভুলকে এক করে ফেলার পরিণতিতে শত্রু ও মিত্রের মধ্যেও গোলমাল করে ফেলা হয়েছিল। এর ফলে "সাংস্কৃতিক বিপ্লব" নামেই শুধু জনসাধারণের ওপরে নির্ভর করে পরিচালিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই "বিপ্লব" পার্টিকে জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন করে পার্টিকেই ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল, পার্টির শত্রুদেরকে নয়। এ কথা প্রস্তাবে অবশ্যই স্বীকার করা হয়েছে যে মাও-এর এই ভুল নীতির জন্য প্রতিবিপ্লবী লিন পিয়াও এবং চিয়াং চিং চক্রও নেপথ্যে

পার্টির অভ্যন্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল এবং এও সত্য যে পার্টির এই ভুলের জন্য চীনের পার্টির অভিজ্ঞতার অভাব, যান্ত্রিকভাবে মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বের প্রয়োগ, সমাজতন্ত্র নির্মাণের পর্বে সঠিক মতাদর্শগত প্রস্তুতির অভাব প্রভৃতি কারণ অবশ্যই ছিল।

তৎসত্ত্বেও এ কথাও ঠিক যে "সাংস্কৃতিক বিপ্লব"-রূপী সামগ্রিক ও দীর্ঘস্থায়ী গুরুতর "বামঝোঁকের ভুলের জন্য প্রধানত: কমরেড মাও জেডোঙই ছিলেন দায়ী। কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে কমরেড মাও জেডোঙের ভুল ছিল একজন মহান সর্বহারা বিপ্লবীর ভুল। আমাদের পার্টির ভেতরে ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অপূর্ণতাগুলোকে দূর করার জন্য কমরেড মাও জেডোঙ সব সময়ই মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ বছরগুলিতে তিনি অনেক সমস্যার নির্ভুল বিশ্লেষণ করতে পারেননি। "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" সময়ে তিনি ঠিক ও বেঠিক এবং শত্রু ও জনগণের পার্থক্য গোলমাল করে ফেলেছিলেন। যখন তিনি গুরুতর ভুল করছিলেন তখনো তিনি বার বার সমগ্র পার্টির প্রতি মনোযোগের সঙ্গে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের রচনাবলী অধ্যয়নের আহ্বান জানাতেন এবং মনে করতেন তাঁর নিজের তত্ত্ব ও অনুশীলন সত্যিই মার্কসবাদী এবং এগুলো সর্বহারা একনায়কত্ব ও সুসংবদ্ধ করার জন্য অত্যন্ত জরুরী এখানেই তাঁর ট্র্যাজেডী।"[৭]

সমাজতন্ত্রে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির যে তত্ত্বটি মাও সে তুং উদ্ভাবন করেন, তার একটি সুনির্দিষ্ট দার্শনিক প্রেক্ষাপটও ছিল। দর্শন নিরপেক্ষভাবে তাঁর এই ধারণাকে বিচার করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

॥ ৩ ॥

মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের দার্শনিক বিকাশ সংক্রান্ত তত্ত্ব

মাও সে তুং-এর রাষ্ট্রচিন্তা ওতপ্রোতভাবে তাঁর মার্কসীয় দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক দর্শনের সঙ্গে জড়িত। তাঁর দার্শনিক রচনাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ত্রিশের দশকে রচিত Dialectical Materialism, On Practice (১৯৩৭), On Contradiction (১৯৩৭), On the Ten Major Relationships (১৯৫৬), On the Correct Handling of Contradictions among

---

৭ ঐ পৃ: ৪৯-৫০।

the People (১৯৫৭), Where do correct Ideas come from (১৯৬৩)? কার্ল উইট্‌ফোগেল (Karl Wittfogel), আর্থার এ. কোহেন (Arthur A. Cohen) প্রমুখ পশ্চিমী বিশেষজ্ঞ এবং সোভিয়েত গবেষক ভি. গেওরগিয়েভ (V. Georgiyev)-এর মতে মাও ৎসে তুং-এর দার্শনিক রচনাবলীতে আদৌ কোন মৌলিকত্ব নেই। মার্কসীয় বস্তুতত্ত্ব সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য ও ত্রিশের দশকে একাধিক সোভিয়েত দার্শনিকের আলোচনার পুনরুক্তি তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে চীন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তর্কের অবকাশ অবশ্যই আছে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, মার্কসীয় দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্রে মাও ৎসে তুং উদ্ভাবিত দু'টি তত্ত্ব বিস্তৃত আলোচনার দাবি করে।

(ক) প্রথম তত্ত্বঃ বস্তু (Being) ও ভাব (Thinking) অভিন্ন (Identical)। ১৯৫৬ সালের পর চীনের মার্কসবাদী দার্শনিক ইয়াং-হ্‌সিয়েন-চেন (Yang-Hsien-Chen)-এর একাধিক প্রবন্ধের বিরোধিতা করে মাও ৎসে তুং তাঁর এই তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন ও এই বক্তব্যের সমর্থনে পরবর্তীকালে একগুচ্ছ রচনা প্রকাশিত হয়। চেন-এর বক্তব্য ছিল যে বস্তু ও ভাবের মধ্যে মিলন সাধিত হয়, কিন্তু ভাব ও বস্তু অভিন্ন, এই ধারণাটি ভুল। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে চেন্ বলেছিলেন যে, বিষয়গত শর্তসাপেক্ষে চিন্তা বা ভাব অনুযায়ী বস্তুর পরিবর্তন করে উভয়ের মধ্যে ঐক্য বা মিলন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং এই প্রক্রিয়ায় বিষয়গত পরিস্থিতি ও ব্যক্তির বিষয়ীগত অনুশীলন উভয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই বক্তব্যের অর্থটি ছিল এই যে, ব্যক্তির বিষয়ীগত ভূমিকার কার্যকারিতা আপেক্ষিক ও বস্তুনির্ভর বলে বিষয়গত পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ভাব অনুযায়ী বস্তুর পরিবর্তন করে উভয়ের মিলন ঘটানর চেষ্টা হঠকারিতা মাত্র। মাও ৎসে তুং এই প্রশ্নটির আলোচনায় বস্তুর তুলনায় ভাবের বিষয়ীগত ভূমিকার প্রশ্নটিকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, মানুষের সৃষ্টিশীলতা অসীম ও অফুরাণ; সঠিকভাবে শ্রমশক্তির ব্যবহার করে মানুষ যদি অনুশীলন প্রক্রিয়ায় (Practice) লিপ্ত হয়, তবে অবশ্যই ভাব অনুযায়ী বস্তুর পরিবর্তন ঘটান সম্ভব; অর্থাৎ, শেষ বিচারে বস্তু ভাব অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে বাধ্য ও সেই কারণে ভাব ও বস্তুর মধ্যে অচিরেই অভিন্নতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। মাও ৎসে তুং-এর এই বিশ্লেষণ একাধিক কারণে তাৎপর্যমণ্ডিত। প্রথমতঃ, ভাব ও বস্তুর

মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রধানতঃ নির্ভর করে বিষয়গত পরিস্থিতির ওপরে নয়, ব্যক্তির বিষয়ীগত অনুশীলন প্রক্রিয়ার সঠিকতার ওপরে। দ্বিতীয়তঃ, বিষয়-গত পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে বস্তুকে অনুশীলনের মাধ্যমে ভাব অনুযায়ী পরিবর্তন করা সম্ভব।

একাধিক মার্কসবাদী গবেষক অবশ্য মাও ৎসে তুং-এর এই তত্ত্বকে ভ্রান্ত বলে মনে করেন। প্রথমতঃ, তাঁরা বলেন যে বস্তুর বিষয়গত চরিত্রকে উপেক্ষা করে ভাব অনুযায়ী বস্তুর পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে চূড়ান্ত বলে মনে করার অর্থ হল কার্যতঃ ভাববাদী ও স্বচালনবাদী (voluntarist) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা। এঁরা মনে করেন যে, ১৯৫৮ সালের পর মাও ৎসে তুং চীনের বাস্তব অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে এককভাবে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রক্রিয়াকে চূড়ান্তরূপে সাফল্যমণ্ডিত করার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার মূলে ছিল এই বিষয়ীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। দ্বিতীয়তঃ, এই সমালোচকদের মতে, ভাব অনুযায়ী বস্তুর পরিবর্তন করা সম্ভব এই চিন্তার ভিত্তিতে ব্যক্তি অনুশীলন প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হলে শেষ পর্যন্ত সেটি বাস্তববিমুখ হতে বাধ্য। 'সম্মুখপানে বৃহৎ পদক্ষেপ' ও 'সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে যে একাধিক গুরুতর বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছিল, তার অন্যতম কারণ রূপে এই তাত্ত্বিক ধারণাটিকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

মাও-এর দার্শনিক চিন্তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বর্তমান চীনা নেতৃত্ব কিন্তু তাঁর অনুশীলনধর্মী জ্ঞানতত্ত্বকে বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে চিহ্নিত করেছে। এই বক্তব্য অনুযায়ী, "সামাজিক অনুশীলনকে ভিত্তি করে তিনি সামগ্রিকভাবে ও ধারাবাহিকপর্বে জ্ঞানের উৎসগুলো সম্পর্কে, জ্ঞানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ও জ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং সত্য যাচাই-এর মানদণ্ড সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্বকে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, নিয়ম হিসাবে, বস্তু থেকে চেতনায়, আবার চেতনা থেকে বস্তুতে যাবার প্রক্রিয়া, অর্থাৎ অনুশীলন থেকে জ্ঞানে, আবার জ্ঞান থেকে অনুশীলনে যাওয়ার প্রক্রিয়ার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তিতে সঠিক জ্ঞানে পৌঁছনো যায় এবং সঠিক জ্ঞানের বিকাশ করা হয়।...তিনি দর্শনকে সর্ব-হারাশ্রেণী ও জনগণের হাতে পৃথিবীকে জানার আর বদলে দেবার একটি ধারালো হাতিয়ারের আকার দিয়েছিলেন।...কমরেড মাও জেডোঙের প্রণয়ন

করা উপরোক্ত মতাদর্শগত লাইনে আমাদের পার্টিকে সব সময়েই অবিচল থাকতে হবে।"[৪]

(খ) **দ্বিতীয় তত্ত্ব:** এককের দ্বিখণ্ডীকরণ তত্ত্ব (One divides into two)। এ ক্ষেত্রেও দার্শনিক ইয়াং-হ্সিয়েন-চেন্-এর বক্তব্যের বিরোধিতা করে মাও ৎসে তুং এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করেন। চেন্-এর বক্তব্য ছিল যে, চীনে সমাজতন্ত্রকে সুসংহত করার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন ছিল দু'টি বিপরীত মুখী ঝোঁকের, অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া উৎপাদিকা শক্তির ও অগ্রসরমান সমাজ-তন্ত্রের, সমন্বয় সাধন। সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, সি. পি. সি.-এর অভ্যন্তরে দুই লাইনের দ্বন্দ্বের নিরসন হওয়া সম্ভব ছিল উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে, কারণ দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকলেও উভয় ধারার প্রবক্তারাই ছিলেন চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে। চেন্-এর এই বক্তব্য সাধারণভাবে সমন্বয়তত্ত্ব (combine two into one) নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে মাও ৎসে তুং-এর বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। লেনিনের একাধিক প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান যে, দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল কথা বলতে বোঝায় এককের অবিরাম গতিতে দ্বিখণ্ডিত হবার প্রক্রিয়াকে। প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনার মধ্যেই পরস্পর-বিরোধী বা বিপরীতমুখী শক্তি কাজ করে; সাময়িকভাবে তাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটলেও পরমুহূর্তেই তাদের মধ্যে দ্বান্দ্বিক বিরোধ উপস্থিত হয় যার ফলে বস্তু পায় গতি ও এভাবেই বস্তুর পরিবর্তন হয়। এক কথায় সমন্বয়-ভিত্তিক স্থিতিশীলতা আপেক্ষিক, দ্বন্দ্ব বা বিরোধিতা হল চূড়ান্ত।

একাধিক মার্কসবাদী গবেষক মাও ৎসে তুং-এর এই বক্তব্যকে যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ, তাঁরা বলেন যে, নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের প্রশ্নটিকে এককভাবে গুরুত্ব দিয়ে মাও দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াটিকে আলোচনাকরেছেন মাত্র। কিন্তু দ্বন্দ্বতত্ত্ব শুধুমাত্র গতিশীলতাকে ব্যাখ্যা করে না; গতির মাধ্যমে বস্তুর স্থিতাবস্থার ক্রমাগত পরিবর্তন হয়ে নতুন যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে বিশ্লেষণ করাই দ্বন্দ্বতত্ত্বের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সমালোচকদের মতে, মাও ৎসে তুং তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতেই সমাজ-তান্ত্রিক সমাজে অবিরাম শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁরা মনে করেন যে, এককের অবিরাম খণ্ডীকরণের প্রক্রিয়াকে

৪. ঐ। পৃঃ ৮৩-৮৪।

গুরুত্ব দিয়ে মাও দ্বন্দ্বতত্ত্বের নেতিবাচক দিক্‌টিকেই শুধুমাত্র গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দ্বন্দ্বতত্ত্বের অন্যতম প্রধান দিক্‌টি হল ইতিবাচক, অর্থাৎ স্থিতাবস্থার সৃষ্টিশীল পরিবর্তন সাধন করা। এঁরা বলেন যে, মাও ৎসে তুং-এর তত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিটি হল নতুন সৃষ্টির প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করে স্থিতাবস্থার নেতিকরণকে সমর্থন করা, যার অর্থ এই যে, তাঁর দর্শন শেষ বিচারে জীবন-বিমুখ, সৃষ্টিবিমুখ হয়ে দাঁড়ায়।

এই সমালোচনাগুলি নিঃসন্দেহে বিতর্কের বিষয়, কারণ মাও ৎসে তুং-এর দর্শন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মতই আজও বিতর্কিত। তাঁর মৃত্যুর পরে সি. পি. সি.-এর মধ্যে মাওবাদের নতুন মূল্যায়নের প্রচেষ্টা চলছে। মাও ৎসে তুং-এর আমলে ছিলেন যাঁরা বহুনিন্দিত, তাঁদের অনেককেই আজ পুনর্মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লিউ-শাও-চি-এর আত্মিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অপরদিকে মাও ৎসে তুং-এর চিন্তা ও দর্শন অভ্রান্ত—এই ধারণাকে এখন সি. পি. সি. নেতৃত্ব অস্বীকার করে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান নায়করা আজ সর্বাধিক নিন্দিত ও লাঞ্ছিত। এই অবস্থায় মাও ৎসে তুং-এর রাষ্ট্রচিন্তার সামগ্রিক মূল্যায়ন করে এই বিষয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসেনি

পরিশিষ্ট

মার্কসের মৃত্যুর পরে একশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু মার্কসবাদের মৃত্যু হয়নি। প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়নে, পরে চীনে ও তারও পরে পৃথিবীর একাধিক দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার একাধিক দেশ আজ বিপ্লবী গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে রত। সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করছে। স্বাভাবিকভাবেই তাই মার্কসবাদী চিন্তার প্রসার ও ব্যাপ্তি আজ প্রায় সব দেশেই লক্ষণীয়। সমাজতন্ত্রের কাঠামোকে সুসংহত করতে, পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে, বিভিন্ন দেশে নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী বিপ্লবের রণকৌশল রচনা করতে মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল প্রয়োগ হচ্ছে বিভিন্নভাবে। মার্কসবাদ যে নিছক কতকগুলি মৃত ফর্মূলা নয়, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই যে মার্কসবাদের সৃষ্টি ও বিকাশ হয়েছে, এই ঘটনাগুলি তারই স্বাক্ষর বহন করছে। তাই মার্কসবাদী চিন্তার ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের জটিলতাও এর মধ্যে প্রবেশ করেছে। সমাজবিদ্যা, দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব এমন কি প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আজ তাই মার্কসবাদের প্রয়োগ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ফলে মার্কসবাদের জগতে নানা ধরনের নতুন পরিভাষা, নতুন শব্দের ব্যাপক ব্যবহার করা হচ্ছে, যেগুলি অবশ্যই সঠিক মূল্যায়নের দাবি রাখে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কসবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মার্কসচর্চার ক্ষেত্রে দু'টি প্রধান ধারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রথম ধারাটির প্রবক্তারা মার্কসবাদকে মানবতাবাদী, কখনও বা সরাসরি উদারনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী। এঁদের মতে, মার্কসবাদের মূল কথাটি হল সমাজ ও রাষ্ট্রের বন্ধন থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করা ও সে কারণেই এঁরা পার্টি, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রভৃতি ধারণাকে মার্কসবাদের মূল চরিত্রের সঙ্গে সুসমঞ্জস বলে মনে করেন না। শ্রেণী নিরপেক্ষ, ব্যক্তির একক অস্তিত্বনির্ভর এই মানবতাবাদী মার্কসবাদের সঙ্গে তাই অনেক ক্ষেত্রে

প্রপঞ্চবাদ (phenomenology), অস্তিত্ববাদ (existentialism) ও ভাববাদের মিশ্রণ ঘটান হচ্ছে। মার্কসবাদের এই ধরনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ প্রকৃতই গ্রহণযোগ্য কি না, মার্কসবাদের ব্যাপ্তি ও প্রসারের পক্ষে এর তাৎপর্যটিই বা কতখানি এবং সর্বোপরি এই জাতীয় বিশ্লেষণ সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পক্ষে কতখানি সহায়ক,—এই সব ক'টি প্রশ্নই বিতর্কের দাবি করে। বিশের দশকের জার্মানীতে কার্ল কর্শ (Karl Korsch) ও পরবর্তীকালে হাঙ্গেরীতে গেওর্গ লুকাচ (Gyorg Lukacs) এই দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পোল্যাণ্ডে এল. কোলাকোভ্‌স্কি ও অ্যাডাম শ্যাফ্, ইতালিতে লুচিও কল্লেত্তি, ফ্রান্সে রোজার গারুদি, অস্ট্রিয়াতে আর্ণষ্ট্ ফিশার ও ফ্রানৎজ্ মারেক (Franz Marek) প্রমুখেরা মূলতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গীর ধারক-বাহক রূপে স্বীকৃত।

এই ধারাটির বিরোধী চিন্তাকে মোটামুটিভাবে নিষ্ঠাশ্রয়ী মার্কসবাদ (Orthodox marxism) রূপে বর্ণনা করা যায়। প্রধানতঃ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মার্কসবাদ চর্চা এই পথে অনুসৃত হচ্ছে। এই মতের প্রবক্তারা বলেন যে, চিরায়ত মার্কসবাদের মূল নীতিগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল প্রয়োগ ও বিকাশ ঘটান সম্ভব। এঁদের ধারণা হল যে, শ্রেণী-নিরপেক্ষভাবে, বিমূর্ত মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কসবাদকে বিশ্লেষণ করলে বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী এবং প্রতিবিপ্লবের পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠবে। তাঁদের এই অভিযোগের ভিত্তিটি হল এই যে, প্রথম ধারাটির প্রবক্তারা মার্কসবাদের যে ব্যাখ্যা দিতে আগ্রহী, একাধিক মার্কসবাদবিরোধী তাত্ত্বিকও তাকে সাদরে গ্রহণ করে এই মতের প্রচারে উৎসাহ দান করেছেন। দ্বিতীয় ধারাটির প্রবক্তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের তেওদর ওইজারমান, বুলগেরিয়ার তোদর পাভলভ (Todor Pavlov), গণতান্ত্রিক জার্মানীর গেওর্গ ক্লাউস্ (Georg Klaus) প্রমুখ দার্শনিকরা। সেই সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের একাধিক ধনতান্ত্রিক দেশের মার্কসবাদী দার্শনিকরাও মোটামুটিভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মার্কসবাদের অনুশীলন ও প্রায়োগিক বিকাশ ঘটাতে আগ্রহী। লেনিন পরবর্তী যুগে দর্শন, তত্ত্ব ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চিরায়ত মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল প্রয়োগের সূচনা করেন ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আন্তোনিও গ্রামশ্‌চি

(Antonio Gramsci)। ফ্রান্সে ষাটের দশকে ও তার পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর অবদানকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকার করে মার্কসীয় দর্শনের আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেন লুই আলতুসে (Louis Althusser)। ব্রিটেনের মরিস্ কর্ণফোর্থ (Maurice Cornforth), জন লুইস্ (John Lewis) প্রমুখের অবদানও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, মার্কসবাদী মহলে এই দু'টি ধারার দ্বন্দ্ব মার্কসবাদ চর্চার বিষয়টিকে জটিল রূপ দিয়েছে। মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল বিকাশের যাঁরা বিরোধী, কিংবা মার্কসবাদের গুরুত্বকে যাঁরা অস্বীকার করেন, তাঁরা তাই এ কথাই বলেন যে, মার্কসবাদ আজ খণ্ডিত, বিপর্যস্ত ও এক কথায় মৃত। মার্কসবাদের আলোচনায় জটিলতা বৃদ্ধি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বৈপ্লবিক তত্ত্বের সৃষ্টিশীলতারই আত্মপ্রকাশ। জীবন ও ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বলেই মার্কসবাদের চর্চা ও প্রায়োগিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার উপস্থিতি লক্ষণীয়। তার অর্থ কখনই এই নয় যে প্রতিটি ধারার প্রবক্তাদের মতামত সমানভাবে সঠিক, গ্রহণযোগ্য ও মার্কসবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু মার্কসবাদ একটি চলমান ও জীবনমুখী তত্ত্ব,—এই কথাটিকে স্বীকার করে নিয়েই উল্লেখিত ধারা ও বিতর্কগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাদের সঠিকতাকে বিচার করা প্রয়োজন